بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোস্তফা মনজুর

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রেজি নং- ০৮৪/২০০৪-০৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মোস্তফা মনজুর কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য রচিত **"বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। অভিসন্দর্ভের পুরোটা বা আংশিক কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোন ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আমি গবেষকের সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

449217

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১৭/৩/০১০

(মুহাম্মদ আব্দুল মালেক)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও প্রকাশ বা ডিগ্রী লাভের জন্য জমা দেইনি।

19.09.10

(মোস্তফা মনজুর)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং- ০৮৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৪-২০০৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যাঁর অসীম কৃপায় আমার এ গবেষণাকর্মটি (**বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**) সম্পন্ন করতে পেরেছি। সাথে সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি, যাঁর আনীত জীবন বিধানই দিশেহারা মানুষকে দিতে পারে মুক্তির সন্ধান।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক জনাব মুহম্মদ আব্দুল মালেক (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) স্যারের প্রতি। যাঁর অকৃপণ পরামর্শ, সঠিক দিক-নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে আমার গবেষণাকর্মটি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও সঠিকভাবে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি, যাঁরা আমার এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি, গবেষণার সর্বস্তরেই যাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

গবেষণা তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বই ও বিভিন্ন সাময়িকী সংগ্রহে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের লোকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কোথাও একবার দু'বার গিয়েছি এবং মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি, আবার কোথাও বহুবার গিয়েও শেষ পর্যন্ত শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল কর্মকতা-কর্মচারী আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

জরিপ কার্যের বিশালতা ও জটিলতা আমাকে আরো বহু লোকের নিকট ঋণী করেছে। প্রশ্নমালা তৈরী ও পূর্বপরীক্ষণ কাজে আমি আমার তত্ত্বাধায়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকেরই নিকট কৃতজ্ঞ। জরিপ কার্য পরিচালনায় সাহায্যকারী বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতিজনরাও আমাকে

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের আন্তরিকতা দিয়ে। জরিপ পরিচালনা উপলক্ষে দেশের নানা স্থানে গমনের ফলে সেখানকার অধিবাসী পরিচিত ও বন্ধুজনদের যে অমায়িক ব্যবহার ও সহযোগিতা লাভ করেছি তা আমাকে তাদের নিকট ঋণী করে রেখেছে। জরিপ প্রশ্নমালার উত্তর ও মতামত প্রদানে সেসব মুসলিম-অমুসলিম অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকে নানা ব্যস্ততার কারণে মতামত প্রদান করতে পারেননি বলে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অনেকেই আবার শতকর্মব্যস্ততার মাঝেও হাসিমুখে মতামত প্রদান করেছেন, এদের সবার নিকটই আমি কৃতজ্ঞ । বস্তুত জরিপ কার্যের ব্যাপকতায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, পরামর্শ, মূল্যায়ন ও মতামত না পেলে এ কাজ কখনোই সম্ভব হতনা। এঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে, আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মা, ভ্রাতৃদ্বয়, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে যে প্রেরণা ও দু'আ পেয়েছি তার জন্য তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার কর্তব্য পালনে অমার্জনীয় ত্রুটি থেকে যাবে।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এই প্রার্থনা জানাই- হে আল্লাহ! তুমি আমার এই গবেষণাকর্মটি কবুল কর। বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান কর। আমীন।।

১৯.০৭.১০

(মোস্তফা মনজুর)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

- ভুমিকাঃ- i
  - গবেষণার উদ্দেশ্য iii
  - গবেষণার পরিধি v
  - গবেষণা পদ্ধতি vii
  - গবেষণা অধ্যায়ের রূপরেখা ix
  - গবেষণার সীমাবদ্ধতা x

১. প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণা শিরোনামের পরিভাষা পরিচিতি ১-৫৪
   - ক. বাংলাদেশ ১
   - খ. ইসলাম ও মুসলিম ১৩
   - গ. অমুসলিম ২৮

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের ধর্ম ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ৫৫-১০১
   - ক. ইসলাম পূর্ব বাংলাদেশের ধর্মসমূহ ৫৬
   - খ. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ক্রমবিকাশ ৭০
   - গ. বাংলাদেশের ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ৯৫

৩. তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক ১০২- ১৭০
   - ক. মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১০৩
   - খ. বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের বর্তমান চিত্র ১২৭
   - গ. আন্ত:ধর্মীয় সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানে জরিপ পদ্ধতির বিশ্লেষণ ১৪০

৪. চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের মূল্যায়ন ১৭১-১৯৬
   - ক. ইসলামের আলোকে মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ভিত্তি ১৭২
   - খ. ইসলামী নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশের আন্ত:ধর্মীয় সম্পর্কের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ১৮০

৫. পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কোন্নয়নের সম্ভাবনা ও সুপারিশমালা ১৯৭-২০৫

- উপসংহারঃ ২০৬
  - ❖ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী i-vi
  - ❖ পরিশিষ্টঃ জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা vii-xi

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
সারণি:১ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা	৯৫
সারণি:২ বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শতকরা হার	৯৬
সারণি:৩ বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান	৯৭
সারণি:৪ বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী হিন্দু জনসংখ্যার অবস্থান	৯৮
সারণি:৫ বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান	৯৯
সারণি:৬ ১৯৮০'র দশকের মধ্যভাগে উপজাতীয় জনসংখ্যার ধর্মতাত্ত্বিক শতকরা হার	১০১
সারণি:০৭ উত্তরপ্রদানকারীদের ধর্ম ও লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ	১৪১
সারণি:০৮ উত্তরদাতাদের ধর্ম ও বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস	১৪২
সারণি:০৯ মতামত প্রদানকারীদের বয়স ভিত্তিক তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ	১৪৩
সারণি:১০ উত্তর প্রদানকারীদের নিজ ধর্মজ্ঞানের মাত্রা	১৪৪
সারণি:১১ অন্য ধর্ম প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের জ্ঞানের পরিমাণ	১৪৫
সারণি:১২ নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য যে ধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের জ্ঞান রয়েছে তার বিবরণ	১৪৬
সারণি:১৩ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিবরণ	১৪৭
সারণি:১৪ নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত উত্তরদাতাদের মতামতের বিন্যাস	১৪৮
সারণি:১৫ প্রতিবেশি হিসেবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মতামতের বর্ণনা	১৪৯
সারণি:১৬ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে উপহার আদান-প্রদান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের বিবরণ	১৫০
সারণি:১৭ বন্ধু নির্বাচনে ধর্মের শর্তারোপ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস	১৫১
সারণি:১৮ স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে ধর্মের ভূমিকা সংক্রান্ত অভিমতের বিন্যাস	১৫২
সারণি:১৯ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা বাণিজ্যের মাত্রা সংক্রান্ত উত্তরের বিন্যাস	১৫৩
সারণি:২০ ভোটদানের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা সংক্রান্ত উত্তরের বিবরণ	১৫৪
সারণি:২১ ধর্ম পালনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ	১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
সারণি:২২ নিজ এলাকায় সম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের অভিমত বিন্যাস	১৫৬
সারণি:২৩ নিজ এলাকায় জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের বাস্তবতা সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের উত্তরের বিন্যাস	১৫৭
সারণি:২৪ বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে নিজ এলাকার দায়িত্বশীল লোকদের ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবস্থা সংক্রান্ত উত্তরের বিন্যাস	১৫৮
সারণি:২৫ দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যে ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	১৫৯
সারণি:২৬ বাংলাদেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের অবস্থা প্রসঙ্গে প্রাপ্ত মতামতের বিন্যাস	১৬০
সারণি:২৭ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিন্যাস	১৬১
সারণি:২৮ বাংলাদেশে চাকরি ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস	১৬২
সারণি:২৯ বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস	১৬৩
সারণি:৩০ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস	১৬৪
সারণি:৩১ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাব প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস	১৬৫
সারণি:৩২ বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস	১৬৬
সারণি:৩৩ বাংলাদেশে ধর্মীয় সহবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায় কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন-এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস	১৬৭
সারণি:৩৪ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে মতামত প্রদানকারীদের প্রদত্ত সুপারিশের বিবরণ	১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ধর্মের ইতিহাস সুপ্রাচীন। মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন হতে শুরু করে আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর চরম উৎকর্ষ ও আধুনিকতার যুগেও ধর্ম তার আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। কালের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানবেতিহাসে পরিলক্ষিত হয় বহু ধর্ম ও মতবাদ; তন্মধ্যে অনেকগুলোই ইতিহাসে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত প্রায়। তবে প্রধান ধর্মগুলো নিজ নিজ অনুসারীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে; আঞ্চলিক ও উপজাতীয় ধর্মগুলোর সাথে মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে নবতর সামাজিক প্রকৃতি। সামাজিক জীব মানুষও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এই বহু ধর্ম সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থায়। দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশও ধর্মগুলোর মিলন মেলার বাইরে নয়। জনসংখ্যার দিকে থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর উপস্থিতি কম নয়। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সুশৃঙ্খল অবস্থান ও নিবিড় সম্পর্ক এদেশের অন্যতম স্বাতন্ত্র্যও বটে।

মূলত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইসলাম প্রচারের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে, যার ছোঁয়া হতে বাংলাদেশও বঞ্চিত হয়নি বলেই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। তবে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বঙ্গ বিজয় ও খিলজি শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রকৃত প্রচার শুরু হয়। এরই মাধ্যমে এদেশে মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কেরও সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম আগমনের পূর্বে এদেশের বেশিরভাগ অধিবাসীই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যদিও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এছাড়া খ্রিস্ট, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্মগুলির পাশাপাশি বহু উপজাতীয় ধর্মও ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম নির্দশন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ কর্তৃক খিলজী শাসন প্রতিষ্ঠা হলে এদেশে মুসলিম মুবাল্লিগ, ব্যবসায়ী ও সুফী সাধকদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। এসময় তাঁর নানা কারণে এদেশে বসবাসও শুরু করেন। অক্লান্ত শ্রম আর দাওয়াতী কাজের পাশাপশি তাদের চরিত্র-মাধুর্য এদেশীয় অমুসলিমগণেকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তোলে। ফলশ্রুতিতে এদেশে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ কলে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এদেশের মুসলিমগণ ইসলামের পরধর্মসহিষ্ণুতার উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে প্রয়াসী হন। পরবর্তীতে মুসলিম-অমুসলিমদের পারস্পরিক সমঝোতা ও সহায়তায় গড়ে উঠে এদেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের মিলিত শ্রম বর্তমান বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। আর ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্ক আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও

Dhaka University Institutional Repository

দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে অনেকখানি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে এ দু'সম্প্রদায়ের লোকদেরই ভূমিকা অপরিসীম।

কল্যাণধর্ম ইসলামের শিক্ষাও এরূপই। ইসলামের প্রচারকার্য প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই আবশ্যক; কিন্তু তা বলে ধর্মগ্রহণের জন্য কাউকে জোর করা চলবে না। বরং সকলকেই তার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের সুযোগ দিতে হবে। সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সার্বিক জীবনাচরণে অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মদীনা রাষ্ট্র ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্যও ইসলামের এই অনুপম নীতিমালা মেনে চলা অপরিহার্য। যদিও এদেশে মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক খুবই নিবিড় তথাপিও বাস্তব জীবনে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শের যথাযথ প্রয়োগ এ সম্পর্ককে আরো গভীর ও সুন্দর করে তুলতে পারে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক জীবন যাপনে ইসলামের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বিদ্যমান সম্পর্কের উন্নয়নে নতুন আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান বাংলাদেশের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত চেতনা বেশ প্রশংসার দাবিদার। সকল ধর্মাবলম্বীর একই সামাজিকতায় বসবাস করাও এদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচায়ক। এতদসত্ত্বেও মাঝে মধ্যে ধর্মীয় নির্যাতন ও ধর্মীয় সংঘাতের নানা ঘটনা এদেশে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় নির্যাতনের নামে এসব ঘটনা অনেকাংশেই ব্যক্তিগত আক্রোশ ও প্রতিশোধের ফল কিংবা ধর্মীয় অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির হিংস্র বহিঃ প্রকাশ। উপর্যুক্ত অবস্থা কোন ধর্মই সমর্থন করে না। অথচ এসব জটিলতার দায়ভার ধর্মকেই বহন করতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিমদের সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। সাথে সাথে ইসলাম ধর্মের আলোকে এর বিস্তারিত ও তুলনামূলক পর্যালোচনাও অতীব প্রয়োজন। যথাযথভাবে গবেষণার মাধ্যমে এ সম্পর্কের প্রকৃত রূপ এবং ইসলামের কল্যাণধর্মী নীতিমালার সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা করতে পারলে ধর্ম প্রসঙ্গে জনগণের ভুল ধারণা ভেঙ্গে নতুন সচেতনতার উদ্ভব ঘটবে, শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য যা অপরিহার্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অতীব প্রয়োজনীয় এ বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানমতে, উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয় নি। বাংলাদেশের মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি কিংবা মানব সম্পর্কের ইসলামী নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে কোন গবেষক গবেষণা কর্মে ব্রতি হননি। এ কারণে আমরা বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের স্বরূপ এবং ইসলামী আদর্শের সাথে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য নির্বাচিত করেছি। যাতে এর মাধ্যমে এদেশে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সম্পর্কের প্রকৃতি ও এ সম্পর্কের সাথে ইসলামী আদর্শের সামাঞ্জস্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ধর্মীয় অজ্ঞতা হতে মুক্ত হয়ে জনগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন প্রয়োগে সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে, বিশ্ববাসীর নিকট বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থান ব্যাখ্যার দায়ভারও এদেশের মানুষেরই। মৌলবাদের উত্থান, জঙ্গিবাদের প্রসার, সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশের পরিচিতি হিসাবে উঠে আসুক তা আমরা কেউই চাই না। বরং উদার ও মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিচয় গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই কাম্য। এ লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া আশু কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, যদি থেকে থাকে, তবে এ সমস্যা বীজ হতে মহীরুহ হওয়ার পূর্বেই সমাধান করা দরকার। কেননা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ সর্বাংশে উত্তম। আর গবেষণাকৃত ফলাফল যদি ইতিবাচক হয় তবুও আন্তধর্মীয় সম্পর্কোন্নয়নে এর ভূমিকা অসামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

আরো একটি বিষয়ও আলোচ্য গবেষণায় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। আর তা হলো ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। বাংলাদেশের এই বিশাল মুসলিম সমাজ চেতনাগত ভাবেই ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু। জীবনের নানা স্তরে তারা ধর্মপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করেছে। তারপরও এটা লক্ষ্যণীয় যে- বর্তমান বাংলাদেশের আন্ত:ধর্মীয় যে সম্পর্ক প্রচলিত তা কতটুকু ইসলাম সম্মত। অর্থাৎ অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও সার্বিক সম্পর্ক ইসলামী শরী'আতের নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা। যদি ইসলামী নীতিমালার বাইরে হয় তাহলে মুসলিমদেরকে সেসব নীতিমালা ও বিধিবিধান জানানোও একটি অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনও আমাদের গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পরিধি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য কিন্তু বেশ সুপ্রাচীন। ব্রিটিশ শাসন, এমনকি তারও বহু পূর্ব হতেই এ অঞ্চল ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। স্বভাবতই বাংলাদেশের মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের স্বরূপ আলোচনা করতে হলে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস হতেই তা শুরু করতে হয়। তবে যেহেতু বাংলাদেশে মুসলিমদের আগমন ও ইসলামের প্রসারের মাধ্যমেই মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে, সেহেতু মুসলিম আগমনপূর্ব বাংলার ইতিহাস আমাদের অভিসন্দর্ভের আওতাভূক্ত করা হবে না।

এ গবেষণা কর্মে বর্তমান সময়ের মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের পর্যলোচনা করা হবে। অবশ্য গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে বাংলায় মুসলিম আগমনের সময হতে ব্রিটিশ শাসন পূর্ববর্তী কালও অভিসন্দর্ভে আলোচিত হবে। বিষয়ের আলোচনায় মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের সার্বিক দিক নিয়েই পর্যালোচনা করা হবে বেশ সুসংবদ্ধরূপে। প্রয়োজনে বিষয় সংশ্লিষ্ট দিকগুলোও যুক্তিসংগতভাবে অভিসন্দর্ভে উপস্থাপনা করা হবে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইসলামী নীতিমালা ও প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তও আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিধিভুক্ত বলে গণ্য করা হবে। পরিশেষে ইসলামী নীতিমালার সাথে বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত সম্পর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষনা কর্মটি পূর্ণাঙ্গভাবে গঠন করা হবে।

সম্পর্ক শব্দটি মানব জীবনের নানা দিক জুড়েই ব্যাপৃত। ব্যাপকার্থে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, পারিবারিক ইত্যাদি সম্পর্ক দু'ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে আওতাভুক্ত হয়ে থাকে। আলোচ্য গবেষণার পৃথক পৃথকভাবে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিমদের এরূপ সব ধরনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য ও সম্পর্ক নির্ধারক কতিপয় বৈশিষ্ট্যই এ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নেয়া হয়েছে যাতে করে বাংলাদেশের আন্তধর্মীয় সম্পর্কের সাধারণ অবস্থান বের করা সম্ভব হয়।

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের অমুসলিম সম্প্রদায়ের সবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সচেতনভাবেই। বাংলাদেশে বিদ্যমান নানা ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক খোঁজার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ইয়াহূদী কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশে খুবই কম সংখ্যায় বিদ্যমান থাকায় এবং সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব এতটা প্রকাশিত না থাকায় তাদেরকে এ গবেষণার আওতাভূক্ত করা হয়নি। যদিও এ বর্ণনা খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের বেলায়ও প্রযোজ্য তথাপিও এ দু'সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। এর কারণ প্রথমত- অমুসলিমদের মধ্যে আসমানী কিতাবধারী অমুসলিমগণ (আহলে কিতাব) ইসলামে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আর তারা হলো ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান। সুতরাং এতদুভয়ের ন্যূনতম একটি সম্প্রদায়কে গবেষণাভুক্ত করণ আহলে কিতাবের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত সম্পর্কের নীতিমালা পরিস্ফুটিত করবে। এ জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদেরকে এ গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত- বিশ্বে জনসংখ্যার বিচারে বৌদ্ধ ধর্মও বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে বৌদ্ধদের অবদান অনস্বীকার্য। এজন্য ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরকে এ গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতীয় গোষ্ঠীকে এ আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়নি। কেননা উপজাতিগণ অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মের অনুসারী। সুতরাং তারা এমনিতেই গবেষণাভুক্ত হবে। এছাড়াও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদের বসবাস হওয়ায় বাংলাদেশে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সম্পর্কের গভীরতা কিংবা পারস্পারিক যোগযোগ বেশ কম। এ বিষয়টিও গবেষণায় তাদের অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে দায়ী। এতদ্ব্যতীত গবেষণায় বিদেশ হতে ভ্রমণ, চাকরি ইত্যাদি সূত্রে আগত অমুসলিমগণ, যারা বাংলাদেশের অধিবাসী নন, তাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে। অমুসলিমদের মধ্যে যারা বাংলাদেশি শুধুমাত্র তারাই এ গবেষণার মূল উপজীব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা হলো জ্ঞানের অনুসন্ধান। অন্য কথায় কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা হয়। আর পদ্ধতি বলতে আমরা এক ধরনের দার্শনিক মূল্যায়নকে বুঝি যা কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের কৌশলকে বুঝায়। গবেষণা পদ্ধতি হল নানা প্রকার সহায়ক সরঞ্জাম, কৌশল ও প্রক্রিয়ার এক সমন্বিত রূপ যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসংবদ্ধরূপে কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও সুসংবদ্ধ গবেষণা পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। যথা-

ক. ঐতিহাসিক পদ্ধতি।
খ. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি।
গ. জরিপ পদ্ধতি।
ঘ. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।
ঙ. পরিসংখ্যান পদ্ধতি।

এ গবেষণায় বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক নির্ধারণে ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় ঐতিহাসিক প্রমাণাদি, দলিল-পত্রাদি, ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্ভুল ও যথার্থ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এ গবেষণা কর্মে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বিষয় সম্পর্কিত দেশ বিদেশের প্রখ্যাত লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী। এছাড়া পত্র-পত্রিকা ও জার্নালগুলোতে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত নিবন্ধ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বিহীন পর্যবেক্ষণ নয় বরং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির স্বার্থক প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম-অমুসলিমদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ও সম্পর্কের উপর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ গবেষণা কর্মের অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচ্য হয়েছে।

এ গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সম্পর্কের স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এদিক থেকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিরও আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্পর্ক নির্ধারণে গবেষণা কর্মটিতে জরিপ পদ্ধতিও পরিগ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানে যা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন নমুনা হতে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর গবেষণা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলো সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপের মাধ্যমে সারণি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে বিজ্ঞান সম্মত পরিসংখ্যান পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ পদ্ধতির আওতায় এ গবেষণাকর্মে গোটা বাংলাদেশই গবেষণার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। সারাদেশ থেকেই যেন তথ্য সংগ্রহ করা যায় এদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ গবেষণার সমগ্রক নির্ধারণেও মাত্র একটি শর্ত প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এ শর্তানুযায়ী ১৮ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিগণই কেবল সমগ্রক হিসাবে গণ্য হবেন। জরিপ কার্যে তাই ১৮ বছরের নীচের কাউকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

গবেষণা সমগ্রক নির্ধারণ করত বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নমুনা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার বাংলাদেশের সবকটি বিভাগ হতে নমুনা নির্বাচন ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনায়নের ক্ষেত্রে কোনরূপ পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য এখানে কাজ করেনি। তবে নমুনায়নের ক্ষেত্রে যেন সব অঞ্চল হতে সব ধরনের ও সব ধর্মের লোক অন্তর্ভুক্ত থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। নমুনা কেবল ৩৮০ সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এ ৩৮০টি নমুনার মধ্যে পুরুষ নমুনা ২৫২টি এবং মহিলা নমুনা ১২৮টি নেয়া হয়েছে। গবেষণা পরবর্তীতে এ নমুনা সমূহকে নানা বয়সানুসারে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বিভাগওয়ারী নমুনার পরিচয়ও প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো এ নমুনায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্য হতে যথাক্রমে ১৮০, ১২০, ৫০ ও ৩০টি নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে গৃহীত ৩৮০জন মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ. খ্রিস্টানগণ গবেষণার এক একজন উত্তরদাতা। ফলাফলের নির্ভুলতা বৃদ্ধির জন্য নমুনা একক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সাধারণ দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে Primary এবং Secondary উভয় উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি মানসম্মত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ব-পরীক্ষণ ও অগ্রবর্তী জরিপের পর অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ চূড়ান্তরূপ দেয়া হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের উত্তরদাতা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর তথ্যাবলী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ ও সারণিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরল পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে এ গুলিকে প্রক্রিয়াজাত করে গবেষণার চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অধ্যায়ের রূপরেখা

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সর্বমোট ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো আবার একাধিক পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত। এসব অধ্যায়গুলোর মাধ্যমে গবেষণার বিষয়টি পর্যায়ক্রমে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা শিরোনামে উল্লিখিত নানা প্রত্যয় ও পরিভাষার পরিচয় দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-এর পরিচয়, মুসলিম-অমুসলিমদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ধর্মের স্বরূপ ইত্যাদি এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এতে বাংলাদেশের ধর্মীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের ঐতিহাসিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন ধর্ম, এদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। অত:পর বাংলাদেশে ইসলামের আগমন বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ও মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের কারণ নির্ণয়ে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে বর্তমান বাংলাদেশের ধর্মীয় নানা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাবলী উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃএ অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমত এ সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে, যা মূলত ইসলামের আগমন হতে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়কালের বর্ণনা। অত:পর পর্যবেক্ষণ ও গ্রন্থাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের নানা দিক ফুটিয়ে তোলা করা হয়েছে। সবশেষে জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সারণি আকারে উপস্থাপণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ গবেষণার এ পর্বে বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অত:পর বাংলাদেশে প্রচলিত সম্পর্ককে ইসলামী অনুশাসন ও নীতিমালার আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ গবেষণার শেষ অধ্যায়টিতে মূলত গবেষণার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও সম্ভবনা সংক্রান্ত আলোচনাস্থান পেয়েছে। এতে মুসলিম-অমুসলিমদের সম্পর্কোন্নয়নে করণীয় ও সুপারিশমালা প্রদত্ত হয়েছে।

সবশেষে গবেষণাটি উপসংহারের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। তৎপরবর্তীতে পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে। যাতে গবেষণার জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা উপস্থাপিত হয়েছে। অত:পর গবেষণাকর্মের সহায়ক হিসাবে নানা গ্রন্থের তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

আলোচ্য গবেষণাটি সর্বাংশে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে একথা বলার কোন অবকাশ নেই। বরং গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। প্রথমত- গবেষণার বিষয়বস্তুর বিশালতা গবেষণার গভীরতা অনেকাংশেই ক্ষুণ্ন করেছে। কেননা যেখানে বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের নানা দিক নিয়েই গ্রন্থাবলী রচনা করা সম্ভব সেখানে মাত্র একটি স্থানে সার্বিক সম্পর্ক আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন ও জটিলতর বিষয়। তথাপিও আন্তরিকভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে যেন গবেষণাটি পরবর্তী গবেষকদেরকে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের পৃথক পৃথক দিক নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। জরিপ কার্য পরিচালনার সীমাবদ্ধতাও এ গবেষণার অন্যতম দিক। একটি আদর্শ গবেষণার নমুনা হওয়া উচিত সমগ্রকের যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারী। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ, লোকবল ও সময় না থাকায় আদর্শ নমুনার আকার নির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়নি। অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশিসংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি।

এছাড়াও গবেষণা পরিচালনায় তথ্যভিত্তিক নির্ভুল ও যথার্থ গ্রন্থাবলীর অভাবেও তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত বর্তমান বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের উপর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চোখে পড়েনি। রাজনীতির ময়দানে কিংবা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের উপর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত থাকলেও বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণ অধ্যুষিত গ্রাম বাংলার আন্তধর্মীয় সম্পর্কের বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থাবলীর অনুপস্থিতি সত্যিই দুঃখজনক। যাই হোক, এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অত্যন্ত সতর্কতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। মানসম্মত রচনা হিসাবে সম্পাদন করতে গিয়ে শ্রম-প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের কোনরূপ ঘাটতি ছিলনা একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা শিরোনামের পরিভাষা পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃধর্মীয় জনসাধারণের সম্পর্ক বিশ্লেষণে বাংলাদেশের পরিচয় প্রদান আবশ্যক। তাছাড়া আমাদের গবেষণা শিরোনামের অন্যতম প্রধান ও প্রথম প্রত্যয় হচ্ছে 'বাংলাদেশ'। সুতরাং আলোচ্য অধ্যায়ের গবেষণা শিরোনামের পরিভাষাগুলোর পরিচয় প্রদানে প্রথমেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা পেশ করা হলো।

বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রীয় নাম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" বা 'Peoples Republic of Bangladesh'।[১] এটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ। আয়তনের দিক হতে এটি পৃথিবীতে ৯০তম; জনসংখ্যার দিক হতে বিশ্বে অষ্টম এবং মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ।

অবস্থান: ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এর ভৌগোলিক সীমারেখা ২০°–৩৪´ থেকে ২৬°–৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°–০১´ থেকে ৯২°–৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা: বাংলাদেশের সীমানা মূলত ১৯৪৭ সালে বৃটিশ কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশের দেশবিভাগকালীন সীমানা। সেসময় পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশের জন্য নির্ধারিত সীমারেখাই বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা হিসাবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ সংবিধান মতে,"১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্থান গঠিত ছিল"।[২] এ হিসাবে এদেশের বর্তমান আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬৯৭৭ বর্গমাইল। বাংলাদেশের প্রায় তিন দিক জুড়ে রয়েছে ভারত। আক্ষরিকভাবে এর সীমানা হলো উত্তরে জলপাইগুড়ি, আসাম, মেঘালয়, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দক্ষিণপূর্বে মায়ানমার ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা স্থলভাগ ও জলভাগ মিলিয়ে মোট ৩১৬১ মাইল। এর মধ্যে ভারতের সাথে সুদীর্ঘ সীমান্তের অনেকাংশ নদী ও পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত হলেও, সীমান্তরেখার বেশিরভাগ অংশ প্রাকৃতিক ভাবে চিহ্নিত নয়।[৩]

---

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের *সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত-২০০০, প্রথমভাগ, প্রজাতন্ত্র অংশ, অনুচ্ছেদ-১, প.২

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, পৃ.২

[৩] মোজাম্মেল হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২২–৩১

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা: জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম বৃহত্তম দেশ। এর মোট জনসংখ্যা ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৬৩ জন।[৪] এর অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৯.৩৮ শতাংশ মুসলিম, আর বাকী ১০.৬২ ভাগ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৪৩ জন।[৫]

ভূ-প্রকৃতি: ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশ তিন ভাগে বিভক্ত।[৬] যথা:

(ক) পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল: এটি ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়, সিলেটের পার্বত্যভূমি, কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়, চট্টগ্রামের হুমাই এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ পাহাড়িয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

(খ) উপকূলীয় অঞ্চল: দেশের দক্ষিণ সীমান্তের বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ তথা বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম জেলা এ ভূ-ভাগের অন্তর্গত। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপও এ ভূভাগের অন্তর্গত।

(গ) নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির সবচেয়ে বড় অংশ এ নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা। মূলত এটি পালন সমভূমি। নদীমাতৃক এদেশের নদীগুলো দ্বারা আনীত পলি দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে যার উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার বা ১০০ ফুট।

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে আরো নানা ধরণের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যেমন-প্লাবন সমভূমি, ব-দ্বীপ অঞ্চল, সক্রিয়-বদ্বীপ, মৃত প্রায় ব-দ্বীপ, স্রোতজ সমভূমি ইত্যাদি। বাংলাদেশে এসব অঞ্চলে অবস্থিত বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর। যা মোট ভূমির শতকরা ১৬.১২ ভাগ।

জলবায়ু: বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানে গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকালে ঠান্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এদেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫৪ (সেন্টিমিটার)। এদেশে মোট ৬টি ঋতু আছে। যথা-গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে সাথে এদেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে। তবে বর্তমানকালের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব কমবেশি বাংলাদেশের জলবায়ুতেও প্রভাব ফেলেছে। ফলে এদেশে বর্তমানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুর প্রভাবই বেশি অনুভূত হয়।

---

৪. Bangladesh Population Census-2001, National Series, Vol-1, Analytical Report, October-2007, Bangladesh Burean of Statistics, p. XI

৫. Ibid, p.XI–XIV

৬. মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি: বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এখনো সুসংহত হয়নি। এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা এখনো কৃষি নির্ভর। অবশ্য শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পেরও প্রচলন রয়েছে এদেশে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৫২০ মার্কিন ডলার।[৭] এদেশের প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। তবে আশার কথা হচ্ছে-পূর্বের তুলনায় এদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তা প্রত্যাশার তুলনায় সামান্যই মাত্র।

শিক্ষা: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। নারী শিক্ষাকেও এদেশে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। মেয়েদের শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ও অবৈতনিক পদ্ধতি বিদ্যমান। এদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষার হার ৩৭.৭%, আর বয়স্ক শিক্ষার হার ৪৭.৯%। বাংলাদেশ সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কে বলা আছে- "রাষ্ট্র-

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রনোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"[৮]

বর্তমান বাংলাদেশে নানা মাধ্যমের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এছাড়া নবতর যুগের ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতিও এদেশে, বিশেষত নগরাঞ্চলে, প্রচলিত রয়েছে।

প্রশাসনিক কাঠামো: বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিগত দু'দশক ধরে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার এদেশ পরিচালনায় নিয়োজিত। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো হলো- "সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণআস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে"।[৯]

---

৭. Bangladesh Economic Review 2007, Economic Advisers wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, March-2008, p.XIX

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র চালনার মূলনীতি, অনু. ১৭, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫-৬

৯. Bangladesh Population Census-2001, Ibid, p.XI–XIV

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ৭টি বিভাগে বিভক্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর। বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় প্রশাসনকে বেশ কতিপয় স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ৬৪টি জেলা ও ৫০৮টি উপজেলা/থানা রয়েছে।[১০] ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৪৬৬টি, পৌরসভা ২২৩টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৮৭৬৩২টি।[১১]

স্বাধীনতা লাভ: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বীজ নিহিত ছিল মূলত ব্রিটিশ কর্তৃক ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশকে বিভক্তি করণের মধ্যে। ধর্ম বিবেচনায় হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক দুটি রাষ্ট্রের ধারণা হতেই এসময় ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম। ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'Two Nation Theory' বা 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' আলোকে পরবর্তীতে আন্দোলনের ফসল হিসাবে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান পৃথক সত্ত্বা লাভ করে। বলা যায়, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও তৎকালীন নেতৃবৃন্দের তীব্র রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিনা রক্তপাতে বিনা যুদ্ধে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তার মানচিত্র নিয়ে বিশ্ব পরিবারে স্থান করে নেয়।[১২]

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ফলে মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়। একটি পশ্চিম পাকিস্তান যা বর্তমানে পাকিস্তান হিসাবে পরিচিত। আর অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ। শুধু ধর্মের ভিত্তিতে হাজার মাইল দূরত্বের দুটি অংশকে একত্র করা ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ দু'অংশের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই বিদ্যমান ছিলনা। সমাজ কাঠামো, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থা সবকিছুতেই প্রদেশ দুটো ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তার উপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক, সামরিক সকল দিক হতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করলে এদেশে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। এর সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এসময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসবে গণ্য করতে সরাসরি অস্বীকার করেন।[১৩] ফলে স্বভাবতই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষার দাবীতে রাস্তায় নেমে আসেন। এসময় পাকিস্তানী শাসকদের গুলিতে শাহাদতবরণ করেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ বাংলার অকুতোভয় দামাল সন্তানেরা। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

---

১০. ***Statistical Year Book of Bangladesh-2006*** (26 th edition) Bangladesh Burean of statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Government of the peoples Republic of Bangladesh, Dhaka, p.27

১১. সুব্রত বড়ুয়া, ***আমাদের বাংলাদেশ***, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯০, পৃ. ২৮

১২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মূলনীতিসমূহ, অনু. ৮, পৃ.৪

১৩. আবদুল মমিন চৌধুরী, ***বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস***, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ১৯৫২ সালের এই ভাষা আন্দোলনের চেতনাতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা মন্ত্র উপ্ত ছিল। এ আন্দোলন বাঙ্গালীদেরকে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট করে; অনুপ্রাণিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের শত অত্যাচার-নির্যাতন উপেক্ষা করে চলতে থাকে বাংলার অধিকার আদায়ের আন্দোলন। কালক্রমে ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালীদের জয়লাভ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মাইলফলক হিসাবে কাজ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে গোটা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা নির্বাচনের এই রায় মেনে নিতে পারছিল না। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে নিরীহ ও গণতন্ত্রপ্রিয় বাঙালীদের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকবাহিনী এদেশে যে বর্বরতম হত্যাকান্ড চালায় তা আজো বাংলার ইতিহাসে কালরাত্রি হিসাবে চিহ্নিত। পরদিন ২৬শে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- "আমরা, বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি"।[১৪]

স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে শুরু হয় বাংলার মুক্তিসংগ্রাম। এদেশের আপামর জনসাধারণ সাধারণ অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে ভারত সরকারের সহযোগিতায় এ মুক্তিসংগ্রাম তীব্র গতি লাভ করে। পরিশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় নয় মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এদেশ পরিত্যাগ করে চলে যায়। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত আর লক্ষাধিক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের এ মুক্তিসংগ্রাম ছিল এদেশের আপামর জনসাধারণের মুক্তি ও চেতনার উৎস। এটি আমাদের গর্ব ও অহংকারের সোনালী স্বাক্ষর। বস্তুত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে আমরা হয়তো এখনো আমাদের সব বাধা কাটিয়ে উন্নতির শীর্ষে উঠতে পারিনি, তবে ১৯৭১ সালে অর্জিত স্বাধীনতাই আমাদের সে স্বপ্ন দেখায়; সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায়।

---

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, প্রথম ভাগ, প্রস্তাবনা অংশ, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস

বর্তমান বাংলাদেশ বলতে আমরা যে ভূখন্ডকে বুঝি প্রাচীন বাংলা বলতে শুধুমাত্র এই ভূখন্ডটিই বুঝানো হতো না। বরং প্রাচীন বাংলার সীমানা ছিল আরো অনেক বড় ও বিস্তৃত। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি জানার জন্য তাই এর প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান জানা প্রয়োজন। কেননা ইতিহাস, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষের বর্ননা লিপিবদ্ধ থাকে, ভূগোলের ভিত্তি ব্যতীত গড়ে ওঠতে পারে না ।[১৫] বাংলার প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকলেও এর সীমানা কখনোই এক ছিল না। অতি সাম্প্রতিক রাষ্ট্রগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোন বিশেষ পদ্ধতির অভাব, নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন, রাজন্যবর্গের দ্বারা সাম্রাজ্যের দখলকৃত অঞ্চলের ভিন্নতা ইত্যাদি মূলত প্রাচীন বাংলার অস্থিতিশীল রাষ্ট্রসীমানার জন্য দায়ী। এজন্য দেখা যায় যে প্রাচীন বাংলার সীমানা স্থির থাকেনি কোন যুগে। বিভিন্ন রাজবংশের আগমনে এর সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে বারংবার। অবশ্য রাজনৈতিক ভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ করা না হলেও প্রাকৃতিকভাবে অর্থ্যাৎ পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, নদী-সাগর ইত্যাদি দ্বারা বাংলা চিরকালই সীমাবদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে। তন্মধ্যে বাংলার সীমানা পরিবর্তনে নদ-নদীর ভূমিকাটাই ছিল মূলত প্রধান। নদী বিধৌত এ ব-দ্বীপ অঞ্চলে ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন, মজে যাওয়া, নতুন নদীর জন্ম হওয়া, নদীবাহিত পলি দ্বারা নতুন ভূমির উৎপত্তি ইত্যাদি কারণে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান নদীগুলোর স্রোতধারাই বাংলাকে মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করে : উত্তর, পশ্চিম মধ্য ও পূর্বভাগ ।[১৬] বাংলার প্রাচীন মানচিত্রে যা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রেনেলের মানচিত্র উল্লেখযোগ্য ।[১৭]

নানা কারণে বাংলার রাষ্ট্রসীমা পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংকুচিত হলেও ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট যে অঞ্চলটি বাংলা বলে প্রাচীন যুগে পরিচিত ছিল তা ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পবর্তরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ।[১৮] আরেকটু বিস্তারিত ভাবে বলা চলে উত্তরে হিমালয়, উত্তরপূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার উপত্যকা, পূর্বে গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গিরিরাজি উত্তর পশ্চিমে দ্বারাভাঙ্গা পর্যন্ত গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী সমতল ভূমি, পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগনা, ছোট

---

[১৫] H.PR. Finbery (ed), ***Approaches to History,*** London, 1962, p.155
[১৬] J. Rennl, ***Memorieo of a Map of Hindoostan***, London, 1783
[১৭] ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা :ম াওল া ব্রাদার্স , ২০০৯, পৃ.২০
[১৮] ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

নাগপুর, মানভূম, ধলভূম, ময়ূরভূঞ্জ ও কেওঞ্জরের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এই চৌহদ্দির মাঝে যে বিরাট ভূভাগ এটাই হলো বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীর বাসস্থান, তাদের কর্মক্ষেত্র[১৯]।

বাংলার এই বিশাল ভূভাগ আবার বেশ কিছু জনপদে বিভক্ত ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়-

> "এই প্রাকৃতিক সীমাবিবৃত ভূমিখন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুন্ড্র,-বরেন্দ্রী-রাঢ়া-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ, ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও নদ-নদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মপ্রকৃতির উৎস এবং ধর্মকর্ম, নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ন সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য ইহাই বাঙালীর ভৌগলিক ভাগ্য"। [২০]

প্রাচীন বাংলা বলতে এটুকুই। সময়ের কালক্রমে রাষ্ট্র সীমায় সংকোচন, সংযোজন, বিয়োজন যা কিছু সবই এর অভ্যন্তরে। এর মধ্যেই গড়ে ওঠেছে হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি। যার ভিত্তি ছিল বাংলার জনপদগুলো। বাঙালীদের সভ্যতা সংস্কৃতি, সমাজকাঠামো, মন-মানসিকতা ইত্যাদির ক্রমবিকাশে এ জনপদগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার এই জনপদগুলির জন্ম প্রসঙ্গে এক বিস্ময়কর ও মজার পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। মহাভারত ও মৎস্যপুরানের পুরাকাহিনী মতে অপুত্রক বলিরাজা পুত্রসন্তান লাভের আশায় দৃঘতমাস নামেক এক অন্ধ মুনি তাপসের শরণাপন্ন হন। রাজার আকুতিতে মুনির দয়া হয় এবং পরবর্তীতে অন্ধ এই মুনির ওরসে রানীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তারা ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র, ও সুহ্ম। আর এদেরই নামে এদের বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরযুগের পাঁচটি বিখ্যাত জনপদ গড়ে ওঠে। [২১]

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ প্রাচীন বাংলার যেসব জনপদের নাম উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, সুহ্ম, রাঢ়, গৌড় বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি। আর্যপূর্ব যুগ হতে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত এ জনপদগুলো নিজ নামেই কার্যকর ছিল। কিন্তু সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড়ের রাজা শশাংকের শাসনামলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জনপদগুলো প্রভাবশালী জনপদের মধ্যে মিশে যেতে শুরু করে। পরবর্তী পাল ও সেন আমলেও জনপদগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়নি। শেষ পর্যন্ত মুসলিম পূর্ব বাংলায় গৌড়, পুন্ড্র ও বঙ্গ এই তিনটি জনপদই প্রধানত টিকে ছিল। বাকী অন্যান্য জনপদ এ তিনটির সীমানায় বিলীন হয়ে যায়। এদের মধ্যেও পুন্ড্রবর্ধন গৌড়ের মধ্যে অনেকটা হারিয়ে যায়। যাহোক এ সময় বাংলা বলতে গৌড় বা বঙ্গ বুঝানো হতো। এভাবে খন্ড খন্ড জনপদগুলো

---

[১৯] অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৩

[২০] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, কলিকাতা, ১৯৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৬

[২১] অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

একত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছিল অখন্ড বাংলা। মুসলিমদের আগমনের পর পাঠান আমলে বিশেষ করে ইলিয়াস শাহী শাসনে সমগ্র অঞ্চল বঙ্গ বা বাংলা নামে সর্বপ্রথম একীভূত হয়। মোগল আমলেও এ ধারা বজায় থাকে। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে যার নাম দেয়া হয় সুবাহ-ই-বাঙালাহ। শেষপর্যায়ে ইংরেজগণ যার নামকরন করেন বেঙ্গল (Bengal)।

নামকরণ ঃ

বাংলাদেশ শব্দটির উৎপত্তি তথা নামকরণের ইতিহাস পর্যালোচনায় বাংলা গবেষকগণ ব্যাপক বিশ্লেষণাত্মক মতামত পেশ করেছেন। যদিও তাঁরা এর মূল উৎসের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন, তথাপিও একটি বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত যে বাংলাদেশ বা বাংলা শব্দটি মুসলিম কর্তৃক প্রদত্ত । ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন "বাংলার পূর্বরূপ বাঙ্গালা নাম মুসলিমদের দেওয়া নামটি বাংলার একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম বঙ্গাল শব্দের অপভ্রংশ। ইহা বঙ্গ শব্দের মুসলমান রূপ নহে। মুসলিমরা প্রথম হইতে সমগ্র বঙ্গদেশকে মুলক বাঙ্গালা বলিত।"[২২] বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি কোথায় কিংবা মুসলিমগণ এ নাম কিভাবে প্রচলন করলেন এর কারণ অনুসন্ধানে প্রধানত তিনটি মতই দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমত, বাঙ্গালা শব্দটি 'বঙ্গ' শব্দ হতে উৎপন্ন । আর এটা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে বঙ্গ ছিল অন্যতম । এই বঙ্গ শব্দ হতে বঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি বলে অধিকাংশ গবেষকগণ মনে করেন।

বঙ্গ শব্দটি সুপ্রাচীন । আর্য ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের ঋগবেদে এ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও 'ঐতরেয় আরন্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তীতে বোধায়ন ধর্মসূত্র, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থেও এ শব্দের উল্লেখ লক্ষ্যণীয় । এসব গ্রন্থে বঙ্গের নির্দিষ্ট সীমানা উল্লেখ করা না থাকলেও এটি স্পষ্টভাবে বর্নিত যে বঙ্গ তৎকালীন সময়ের একটি পৃথক রাজ্য ছিল।[২৩] পরবর্তীতে মুসলিম ঐতিহাসিক, পর্যটক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনাতেও বঙ্গ নামক জনপদ ও রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা বঙ্গ অঞ্চলের রাষ্ট্রসীমা চিহ্নিত করেন। এই বঙ্গ রাজ্য তথা জনপদ হতেই বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি । ঐতিহাসবিদ আবুল ফজল এর মতে "বাঙ্গালার" আদি নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড 'আল' নির্মাণ করতেন, এ থেকেই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি।[২৪] অজয় রায়ের মতে-বঙ্গ যা থেকে এসেছে বাঙ্গালা দেশের নাম শব্দটি মূলে ছিল চীন তিব্বতি গোষ্ঠীর শব্দ । আর এই বঙ্গ

---

[২২] ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৮০, দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকা দ্র

[২৩] আব্দুল করিম, *বঙ্গ, বঙ্গালঃ বাংলাদেশ*, মানব বিদ্যা বক্তৃতা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ. ৪-৫

[২৪] H.S. Jarrett, ***Ain-I-Akbari*** by Abul Fazal, (Reviewed by J.N.Sarkar, Calcutta, 1984, Vol-11, p.120

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের 'অং' অংশের সাথে গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদী নামের সম্বন্ধ ধরে তারা অনুমান করেছেন যে শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল 'জলাভূমি' ।[২৫] প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশ প্রাচীনকাল হতেই নদী বিধোত বদ্বীপ অঞ্চল। সুতরাং বন্যা ও জোয়ারের পানি রোধের জন্য ছোট বড় আল (বাঁধ) নির্মাণ এদেশের বৈশিষ্ট্যই ছিল বলা চলে। এ প্রেক্ষিতে 'বঙ্গ+আল' শব্দযোগে বঙ্গাল ও পরবর্তীতে বঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বঙ্গ শব্দের হতে বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তির আরো একটি ব্যাখ্যা দেখা যায়। যথা সেমেটিক শব্দ আল শব্দের অর্থ আওলাদ বংশধর। এ হিসাবে বাঙ্গাল বা বঙ্গ (বং+আল) এর অর্থ বং এর আওলাদ বা বংশধর। রিয়াদুস সালাতীন গ্রন্থ প্রণেতার মতে হযরত নূহ (আ:)-এর সময়ে মহাপ্লাবনের ফলে মাত্র গুটিকয়েক প্রাণী ছাড়া সব প্রাণীকূল ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে এদের দ্বারাই পুনরায় মনুষ্য বসতি গড়ে ওঠে। হযরত নূহ (আ:) মহাপ্লাবনের পর তার পুত্রদেরকে দুনিয়ার নানা দিকে বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর পুত্র হাম এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন হিন্দ। আর হিন্দের এক পুত্রের নাম ছিল বং। তিনি বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর উত্তর পুরুষরাই এদেশের অধিবাসী হিসাবে বেড়ে ওঠেন । এ প্রেক্ষিতে বং-এর সন্তান উত্তরাধিকারীদের সূত্রে আল (বংশধর) শব্দ যোগে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[২৬]

দ্বিতীয়ত, বঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দটির উৎপত্তি বঙ্গাল শব্দ হতে । ড. হেমচন্দ্র চৌধুরী, ড. ডি সি সরকার প্রমুখ গবেষক এমত পোষণ করেন । তাঁদের মতে প্রধান বাংলার জনপদ বঙ্গাল হতে বঙ্গালা নামের উৎপত্তি । তাঁরা নানা যুক্তি ও প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গাল জনপদের অবস্থান ও বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেন এবং এ দৃঢ়ভাবে বলেন যে এই বঙ্গাল শব্দগত ও ভৌগোলিকভাবে বঙ্গালা-এর অধিকতর নিকটবর্তী।[২৭] সুতরাং এ শব্দ হতেই বাঙ্গালা বা বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি ।

তৃতীয়ত, বঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামটি 'বঙ্গালা' নামক শহরের নাম হতে উদ্ভুত । ষোল শতকের ইউরোপীয় লেখক বারবোসা, ভারথেমা প্রমুখের বর্ণনায় এ শহরের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া গাসতালদি, ব্লাভ, সসেন প্রমুখের মানচিত্রেও এ শহরের অবস্থান চট্রগ্রাম এলাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৮] ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালা নামের উৎপত্তির কারণ হিসাবে 'বেঙ্গালা' নামক-এ শহরের নামকেই গ্রহণ করেছেন ।

---

[২৫] অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[২৬] গোলাম হোসায়ন সলীম, *রিয়াদুস সালাতীন* (অনু. আব্দুস সালাম), ঢাকা, তারিখ বিহীন, পৃ. ২০

[২৭] D. C. Sarkar, ***Studies in the Geography of Ancient and Medival India***, Delhi, 1971, p. 36-38

[২৮] আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচারে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি সূত্র হিসাবে প্রথমোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য । কেননা প্রাচীনযুগে বঙ্গাল দেশের নাম উল্লেখ আছে সত্য, তবে তা থেকে সারাদেশের নামকরণ হওয়ার মতো গুরুত্ব তার ছিল-এমন কথা বলার অবকাশ নেই । বাংলার প্রাচীন জনপদ সমূহের মধ্যে বঙ্গাল-এর মূল নাম 'বঙ্গ' অধিক খ্যাতিমান ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।[২৯] আর ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষ্য ঐতিহাসিক বিচারে গ্রহণীয় নয় । কেননা 'বঙ্গলা' শহরের অস্তিত্ব ও পরিচিতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও, আজ পর্যন্ত এর কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়নি । বরং রেনেল, ওভিংটন প্রমুখ গবেষকগণ-এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাননি । অবশ্য একদল গবেষক মনে করেন যে, বঙ্গ 'বঙ্গাল' কিংবা 'বেঙ্গালা' অভিন্ন । নানা সময়ে নানা লেখনীতে এগুলো ভিন্নতা পেয়েছে মাত্র ।

বস্তুত বঙ্গ, বঙ্গাল বা বেঙ্গালা হতেই মুসলিমগণ সর্বপ্রথম বঙ্গালা বা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করেন । এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বঙ্গালা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণলিপিতে ।[৩০] পরবর্তীতে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী ও শামস সিরাজ আদীদ বাঙ্গালা শব্দের উল্লেখ করেন । শামস সিরাজ তৎকালীন বাংলার শাসক ইলিয়াস শাহকে 'শাহ ই-বাঙ্গলা', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান ই-বাঙ্গালা' নামে আখ্যায়িত করেন ।[৩১] উল্লেখ্য যে সেসময় ইলিয়াস শাহ শুধু বঙ্গ জনপদের শাসক ছিলেন না বরং সমস্ত জনপদের একীভূতরূপ বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন । সুতরাং ঐতিহাসিক শামস-সিরাজ তাঁর গ্রন্থে বাঙ্গালা বলতে গোটা বাংলা অঞ্চলকেই বুঝিয়েছিলেন ।

বঙ্গ হতে বঙ্গালা বা বাঙ্গালা লিখার ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিগণ মূলত ফার্সী ভাষা লিপি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । যেমন মুসলিম আগমনের সমকালীন বাংলার জনপদ যথা বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট, কামরূপ ইত্যাদিকে তাঁরা ফার্সী লিপি প্রভাবে যথাক্রমে বরিন্দ, রাল, মনকলত এবং কামরূপ বা কামরু নামে অভিহিত করতেন । এরই ফলে বঙ্গ হতে ক্রমান্বয়ে বঙ্গালাহ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় । অতঃপর ক্রমান্বয়ে বঙ্গালা, বঙ্গালাহ বা বাঙ্গালা এদেশীয় হিন্দু-বৌদ্ধদের মাঝেও প্রচলিত হয় । পরবর্তীতে পর্তুগিজরা এ শব্দ হতেই এ অঞ্চলের নাম দেন বঙ্গালা (Bengala) এবং তদপরবর্তী ইংরেজগণ এর সামান্য পরিবর্তন করে লিখেন বেঙ্গল (Bengal) । সুকুমার সেনের মতে "বঙ্গ হতে বাঙ্গালা বা বঙ্গালহ উৎপত্তি হয়েছে । বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকার বলে সৃষ্ট এবং ফারসি বঙ্গালহ হতে পর্তুগিজ বেঙ্গালা ও ইংরেজি বেঙ্গল শব্দের উৎপত্তি" ।[৩২]

---

[২৯] ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৩০] H.A.R Gibb, ***Ibn Battuta : Travels in Asia and Africa***, London, 1963, P. 267.

[৩১] আবদুল করিম, ***বাংলার ইতিহাস***, সুলতানী আমল, ঢাকা-১৯৭৭. পৃ. ১৯৮, ২২৮

[৩২] সকুমার সেন, ***বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ব ইতিহাস***, কলিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭-২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যায়ে ইংরেজদের প্রচলিত বেঙ্গল শব্দ হতে ক্রমান্বয়ে বাংলা এবং বাংলাদেশ শব্দের রূপান্তর ঘটে। গবেষক আবদুল করিম ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামের উৎপত্তি ও রূপান্তরের বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ ও যথার্থ ভাবে তুলে ধরেছেন। তা হলো-

"বঙ্গ- প্রাচীন কালের বঙ্গ

বঙ্গালা- মুসলমান ঐতিহাসিকদের দেওয়া নাম এবং মোগল সুবা বঙ্গালা

বাঙ্গালা- বাংলায় লিখিত বঙ্গলার রূপ

বঙ্গাল- প্রাচীন তাম্রলিপিতে পাওয়া বঙ্গাল এবং বঙ্গ-এর অধিবাসী বঙ্গাল

বাংলা- ১৯৪৭ সালের বিভাগপুর্ব বাংলাদেশ

বাংলাদেশ- বর্তমান বাংলাদেশ।"[৩৩]

[৩৩] আবদুল করিম, বঙ্গ, বাঙ্গালা ঃ বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম

পরিচিতি

ইসলাম শব্দটি আরবী 'সিলমুন' ধাতু হতে উদ্ভুত । এর আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা, আপোষ করা বা বিরোধ পরিহার করা ।[৩৪] আদেশ দাতার আদেশ-নিষেধকে কোন দ্বিধা সংশয় ব্যতিরেকে মেনে চলাকেও ইসলাম বলে ।[৩৫] পরিভাষায়,"আল্লাহর আনুগত্য করা বা অনুগত হওয়া এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা ।"[৩৬] ড. ইব্রাহীম মাদকর ইসলামের সংজ্ঞায় দু'ধরনের পরিচয় প্রদান করেছেন ।[৩৭] অর্থ্যাৎ ইসলাম শব্দটিকে বিশেষ্য ও ক্রিয়ামূল হিসাবে ব্যবহার করে পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ক্রিয়ামূল হিসাবে "মুহাম্মদ (সা) যা নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করা হলো ইসলাম" । অন্যকথায় বিশেষ্য হিসাবে কোন কিছুর নাম বুঝালে- ইসলাম হলো ঐ ধর্ম যা মুহাম্মদ (সা) নিয়ে এসেছেন" । পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ লুইস এর মতে "ইসলামের ঐতিহ্যগত অর্থ ধারাবাহিকভাবে নবী ও রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক ও পৃথিবীর জন্য দিক নির্দেশনা হিসাবে জীবন ব্যবস্থা আর মরণোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা প্রদান; আর সাধারণ অর্থে কুর'আনের উপদেশ অনুশীলনের মাধ্যমে মহানবী (স) এর আনীত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝায়" ।[৩৮] অন্যকথায় "আল্লাহ তা'আলার ঐশী দিক নির্দেশনার প্রতি ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যে পরিপূর্ণ শান্তি অর্জিত হয় তাই ইসলাম" ।[৩৯]

বস্তুত ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সর্বশেষ আসমানী ধর্ম । যা হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে । আল কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ পাক এ ধর্মের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছেন-আল্লাহর নিকট ইসলামই (একমাত্র) দীন ।[৪০]

---

[৩৪] *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৫; *বাংলাপিডিয়া*, প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম কর্তক সম্পাদিত, ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৪২৭

[৩৫] লুইস মা'লুফ, *আল মুনজিদ*, আরবী অভিধান, বৈরুতঃ দারুল মাআরিফ, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪৭

[৩৬] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫

[৩৭] ড. ইব্রাহীম মাদকর, *আল মুজামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ: কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ২০০৩, পৃ. ৪৪৬

[৩৮] Barnard Lewis, ***The Faith and the Faithful: The World of Islam,*** Barnard Lewis and others (ed), London : Themes and Hudson, 1992, p. 25

[৩৯] Ruqaiyyah Waris Maqsood, ***Islam: A Dictionary***, Cheltenham: Stanley Thonnes (publishers) Ltd.

[৪০] আল কুরআন, ২: ১১২

Dhaka University Institutional Repository

উৎপত্তি ঃ

ইসলাম ধর্মের পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে এর উৎপত্তির ইতিহাস জানা আবশ্যক। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত মনোনীত দ্বীন একমাত্র ইসলাম সেহেতু স্বভাবতই এর উৎপত্তিস্থল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হওয়াই বাঞ্চনীয়। ইসলাম ধর্মের নানা বাণী ও মূলনীতির আলোকে এ ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত তিনটি মতবাদ লক্ষ্যণীয়।

প্রথমত, ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি আদি পিতা হযরত আদম (আ) থেকে । আল কুরআনের নানা বর্ণনায় এ ধারণার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

> "স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন: আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলে, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা স্বাক্ষী রহিলাম । ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম" ।[৪১]

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সুত্রে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (রহ) যে রেওয়ায়াত উদৃত করেছেন তা এই যে, এই প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয় যখন আদম (আ) কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হল ওয়াদিয়ে নুমান-যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধ ও খ্যাতি লাভ করেছে।[৪২]

এছাড়া আদম (আ:) কে আল্লাহর খলীফা হিসাবে মর্যাদা দান,[৪৩] বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দান,[৪৪] জান্নাতে বসবাসের হুকুম প্রদান, নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষের প্রতি নিষেধাজ্ঞা[৪৫] ও পরবর্তীতে দুনিয়াতে প্রেরণ[৪৬] এ সমস্ত বিষয়েই ইসলামের উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বোপরি দুনিয়াতে প্রেরণের সময় আল্লাহ কর্তৃক যে নির্দেশনার কথা বলা হয়েছিল তা-ই ছিল মূলত ইসলাম। আল্লাহর বাণী :[৪৭] "আমি বলিলাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দু:খিতও হইবে না"।

---

[৪১] *আল কুরআনুল কারীম* ৭: ১৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩. পৃ. ২৫৯

[৪২] মুফতি মুহাম্মদ শফী (র:) *তাফসীর মা'আরেফুল কুর'আন*, অনু: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদিনা: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি, পৃ. ৪৯৯

[৪৩] আল কুরআন, ২:৩০

[৪৪] আল কুরআন, ২:৩১

[৪৫] আল কুরআন, ২: ৩৫, ৭:১৯

[৪৬] আল কুরআন, ৭: ২৪

[৪৭] আল কুরআন, ২:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর রবুবিয়াতের স্বীকৃতি, আদেশ নিষেধের প্রচলন, খলিফা হিসাবে আল্লাহর পরিচয় প্রকাশের দায়িত্বলাভ, সর্বোপরি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হেদায়াতের অনুসরণ ইত্যাদি এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে হযরত আদম (আ) থেকেই ইসলামের উৎপত্তি ঘটে, যা পরিপূর্ণতা পায় মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ঘটে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময় থেকে । তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ধর্ম হিসাবে ইসলাম শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। বরং ইবরাাহীম (আ) সর্বপ্রথম এ শব্দের ব্যবহার করেন। আল কুরআনের নানা স্থানে এর প্রমাণ বিদ্যমান। যথা-আল্লাহ তা'আলার বাণী-

- হযরত ইবরাহীম (আ) এর দু'আ- "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও" ।[৪৮]
- "তাহার (ইবরাহীম (আ) এর) প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, আত্মসমর্পণ কর সে বলিয়াছিল, জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসর্মন করিলাম" ।[৪৯]
- "ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিলনা, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসর্মপণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্তও ছিল না"।[৫০]

বস্তুত উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমাতে সুস্পষ্ট ভাবে ইসলাম শব্দের উল্লেখ এবং তাঁর সাথে ইবরাহীম (আ) এর একনিষ্ঠ যোগসূত্র একথারই প্রমাণ যে ইসলামের আবির্ভাব ইবরাহীম (আ) এর সময় হতেই। তাছাড়া আল কুরআনের আরো বহু আয়াতে ইবরাহীম (আ) এর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্টি ও তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উল্লেখিত হল। আল্লাহর বাণী-

- "তোমরা বল! আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁহার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে" ।[৫১]
- বল, "আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর । সে মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নহে" ।[৫২]

---

[৪৮] আল কুরআন, ২:১২৮
[৪৯] আল কুরআন, ২:১৩১
[৫০] আল কুরআন, ৩:৬৭
[৫১] আল কুরআন, ২:১৩৬
[৫২] আল কুরআন, ৩:৯৫

Dhaka University Institutional Repository

- তাহারা অপেক্ষা দীনকে উত্তম যে সৎকর্ম পরায়ণ হইয়া আল্লাহর নিকট আত্মসর্মপণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদশ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।[৫৩]
- সুরা নাহলে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টতই ঘোষণা করেন যে-

  "ইবরাহীম ছিল এক উম্মত, আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ; সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে । আমি তাহাকে দুনিয়াতেই দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও । সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম । এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম । 'তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" ।[৫৪]

বস্তুতপক্ষে কুরআন ও হাদীসে হযরত ইবরাহীম প্রসঙ্গে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে এটা অস্বীকার করার জো নেই -তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ও রাসূল । বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রচারিত ধর্মের সাথে তাঁর প্রচারিত ধর্মের কোন ব্যাপক পার্থক্য ছিল না । এ কারণেই অনেক চিন্তাবিদ ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হযরত ইবরাহীম (আ) হতে মনে করেন । তাঁদের প্রধানতম দলীল হলো আল্লাহর বাণী- "ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত । তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন মুসলিম" ।[৫৫] আলোচ্য আয়াতে মহানবী (স) এর উম্মতের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এধর্মের সাথে হযরত ইবরাহীমের প্রচারিত ধর্মেরই একাত্মতা ঘোষণা করে । আর এজন্যই হযরত ইবরাহীমকে মুসলিম জাতির জনক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় ।

তৃতীয়ত, ইসলামের উৎপত্তি শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর সময়ে । পাশ্চাত্য বিশ্বে বিশেষত ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা, যারা আসমানী ধর্মের অনুসারী , ইসলাম বলতে হযরত মুহাম্মদ (স:) প্রচারিত ধর্মকেই বুঝে থাকে । আল কুরআন ও হাদীসেও এ ব্যাপারে নানা নির্দেশনা বিদ্যমান । বিশেষ করে বিদায় হজ্জের ভাষণের সময়ে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা এ কথারই সমর্থন করে বলিষ্ঠভাবে । আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন: "আজ তোমাদের দীন পুর্নাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম" ।[৫৬]

মহানবী (স) এর প্রচারিত ধর্মই মূলত ইসলাম নামে সমধিক পরিচিতি । অবশ্য আদম (আ) কিংবা ইবরাহীম (আ) সহ অন্যান্য নবীর প্রচারিত ধর্মের মূলনীতি ও আদর্শ ইসলামেরই আদর্শ । তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি মূলনীতির তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায় যে, তাঁদের প্রচারিত ধর্মও

---

[৫৩] আল কুরআন, ৪:১১৯
[৫৪] আল কুরআন, ১৬ : ১২০-১২৩
[৫৫] আল কুরআন, ২২:৭৮
[৫৬] আল কুরআন, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামই ছিল । বস্তুত সৃষ্টির আদি হতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দিক নির্দেশনাই নবী রাসুলগণ প্রচার করেছেন । আর সে লক্ষ্যে নানা যুগে, স্থান-ও অবস্থা ভেদে নানারূপ নির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর পরিচয় প্রদান করেছেন । এজন্যই দেখা যায় আদম (আ) এর প্রচারিত ধর্মের সাথে পরবর্তী নবীদের প্রচারিত ধর্মের সত্তাগত কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না । বরং আল্লাহ পাক মানব জাতিকে হেদায়াতের লক্ষ্যে সৃষ্টির সূচনা হতে যে ধর্মের প্রচলন করেন তারই পূর্ণতা দেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স:) এর মাধ্যমে । প্রাথমিক যুগে সে ধর্মকে ইসলাম নামকরণ করা হয়নি, তবুও তা বর্তমানের ইসলাম হতে পৃথক ছিলনা কোন রূপেই । সর্বশেষে বলা যায় যে, ইসলামের সত্তাগত উৎপত্তি ঘটে হযরত আদম (আ) এর সময়ে, ইসলামের শব্দগত ব্যবহার হযরত ইবরাহীম (আ) এর মাধ্যমে, আর পারিভাষিক ভাবে পুর্ণাঙ্গ উৎপত্তি হয় সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে ।

ইসলাম ধর্মের ধর্মবিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহ

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা । ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ যে সব ধর্মবিশ্বাস ও মূলনীতি অনুসরণ করে থাকেন তার সবই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অবতারিত । আলোচ্য ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিমগণের প্রধান ধর্মবিশ্বাস ও মূলনীতিসমূহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ।

১. একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম সবচেয়ে বিশুদ্ধ । ইসলামী ধর্মবিন্যাসের মূল হলো আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ । অর্থ্যাৎ এ ধর্ম মতে আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় । তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই । তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও সর্বগুণে গুণান্বিত । বিশ্বজগতের সব কিছুই তাঁর হুকুমে পরিচালিত হয় । তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই । তিনি সর্বত্র বিরাজমান । আসমাউল হুসনা বা সুন্দর পবিত্র নাম ও গুণাবলীসমূহ একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত ।[৫৭]

২. ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় বিশ্বাস হলো ফেরেশতাকুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন । ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । আল্লাহ তা'আলা নূরের মাধ্যমে তাঁদেরকে সৃষ্টি করে নিজ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন । তাঁরা সর্বদাই আল্লাহর ইবাদত ও হুকুম পালনে নিয়োজিত ।[৫৮] তাঁদের কোনরূপ আহার নিদ্রা ও জৈবিক চাহিদা নেই । তাদের সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য ।

[৫৭] আল কুরআন, ২:১৬৩, ১১২:১-৪: ৭:৭৩, ২৩:৯১, ২:২৫৮:৬৭:১৩-১৪, ২১:২২, ৫:৭২
[৫৮] আল কুরআন ৭৪:৩১, ২২:৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৩. আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক।[৫৯] এ ধর্মমতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ:) এর মাধ্যমে দুনিয়াতে মানব জাতির সূচনা করেন এবং তাঁরই দ্বারা আল্লাহর মনোনীত দীন প্রচার করান । এপ্রেক্ষিতে মানব জাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা ছোট-বড় মোট ১০৪ খানা কিতাব নাযিল করেন। তন্মধ্যে ৪ (চার) খানা বড় ও বিখ্যাত।[৬০] এগুলো হলো তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ও কুরআন। তন্মধ্যেই প্রথমোক্ত ৩ (তিন) খানা কিতাবকে একত্রে বাইবেল হিসাবে অমুসলিমগণ দাবী করে থাকেন। মুসলিমদের বিশ্বাস হলো আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এসব কিতাব নাযিল করেছেন এবং এগুলোর বাণী ও বিধান সর্বত: সত্য। অবশ্য কুরআন ব্যতীত বাকীগুলো যেহেতু মানুষের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি সেহেতু এগুলোর বিধান বর্তমানে কার্যকর হবে না । তবে ওহী হিসাবে এগুলোকে বিশ্বাস করা অপিরহার্য ।

৪. নবী রাসুলগণ আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও মনোনীত এ বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করা।[৬১] মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের নিকটই নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন । তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা । সৃষ্টির শুরু হতে আজ পর্যন্ত আগত মোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসূল এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। মুসলিমগণ তাঁদের সকলকেই বিশ্বাস করে এরং সমান মর্যাদার পাত্র মনে করেন। তবে নবী রাসূলগণকে খোদা হিসাবে ইবাদত করা, তাঁদেরকে আল্লাহর পুত্র বা অংশ মনে করা কিংবা অন্যের পাপমোচনের ক্ষমতাবান মনে করা ইত্যাদি বিশ্বাস ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী । বরং এগুলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য ।[৬২]

৫. ইহকালীন জীবনের পর পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস করা অর্থ্যাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় মানুষ এ পৃথিবীতে আগমন করবে না । বরং তার নতুন জীবন শুরু হবে পরকালে । কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি পরকালের এক একটি স্তর । মানুষ পৃথিবীতে তার কর্মকান্ডের জন্য পরকালে পুরস্কার বা তিরস্কার লাভ করবে। এজন্য মুত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। তখন সবাইকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে । জীবনযাপনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মকান্ডেরও হিসাব দিতে হবে। হাশরের ময়দানের সেই বিচার প্রক্রিয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে মানুষ ভাল কাজের জন্য জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করবে আর পাপীরা লাভ করবে চরম শাস্তির জাহান্নাম।

---

[৫৯] আল কুরআন, ২:০৪, ২:২৮৫, ৮৭:১৮-১৯, ২৬:১৯৬

[৬০] আল্লামা আলূসী, *তাফসীরে রুহুল মা'আনী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি, ১৫ খন্ড, পৃ-১৪৩

[৬১] আল কুরআন, ২:২৮৫, ৪:৬৪, ৪:৮০

[৬২] আল কুরআন, ৫:৭২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৬. তাকদীর তথা সৃষ্টির যাবতীয় ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের পুরস্কার ও তিরস্কারমূলক পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়ার[৬৩] উপর বিশ্বাস করা মুসলিমদের অত্যাবশ্যক ধর্মবিশ্বাস।[৬৪] বস্তুত তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্তি জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।[৬৫] তাকদীরকে অস্বীকার করা মূলত আল্লাহর চিরন্তন জ্ঞানকে অস্বীকার করার নামান্তর । বস্তুত এ বিষয়গুলোর প্রতিত যথাযথভাবে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলিমদের জন্য অত্যাবশ্যক । হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন "কোন বান্দাই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না এই চারটি কথায় বিশ্বাস করে-- ০১. এ স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। ০২. মৃত্যুতে বিশ্বাস করা। ০৩. মুত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও তাকদীরে বিশ্বাস" ।[৬৬]

৭. ইসলাম মানুষের পার্থিব কর্মকান্ডকে পাপ পূণ্য দু'টি ভাগে বিভক্ত করে । অর্থ্যাৎ মানুষ যদি তার কাজ আল্লাহর নির্দেশনা মেনে সম্পাদন করে তবে তা পূণ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। চাই তা ব্যক্তিগত প্রয়োজন হোক কিংবা প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণই হোক না কেন । অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলী সম্পাদন করা কিংবা আল্লাহর নির্দেশিত পথ ব্যতীত অন্য পন্থায় কোন ভাল কাজ সম্পাদন করাও পাপ কাজ হিসাবে গণ্য। ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসে পাপ কাজ বেশ ক'টি ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক পাপ হলো শিরক করা বা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো, চাই তা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী বা উপসনাতে হোক ।[৬৭] এছাড়া কুফুরী [৬৮] বা ইসলামী মৌল আকীদাগুলোয় অবিশ্বাস, নিফাক বা কপটতা[৬৯] ইত্যাদিও বড় পাপ হিসাবে গণ্য । এতদ্ব্যতীত কবীরা, সগীরা ইত্যাদি পাপ ও ইসলামী ধর্মবিশ্বাসে বিদ্যমান।[৭০] এধর্মমতে সমস্ত পাপের জন্যই নিধারিত শাস্তি রয়েছে এবং পরকালে এসব পাপের জন্য মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে হবে । অবশ্য মানুষ যদি পাপ করার পর আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে পরবর্তীতে ঐ পাপ না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তবে আল্লাহ পাক এরূপ পাপকে শাস্তি ব্যতীতই ক্ষমা করে দেন।[৭১]

---

[৬৩] আল্লামা নাসাফী, শহরে আকাইদ নাসাফিয়্যাহ, দেওবন্দ: মাকতাবায়ে হানাফিয়্যাহ, ১৩৯২ হি. পৃ-৮২
[৬৪] আল কুরআন, ৩৭:৯৬; ৩৯:৬২
[৬৫] আল কুরআন, ৫৭:২২-২৩
[৬৬] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ, মীশকাত শরীফ, মিশর: দারুল মাআরিফ, ১৯৭৪, পৃ.২৬৪
[৬৭] আল কুরআন, ৩১:১৩, ৪:১১৬, ২২:৩১, ৫:৭২
[৬৮] আল কুরআন, ২২:১৯-২২, ৪৭:৮৯, ২:২৫৭
[৬৯] আল কুরআন, ৬৩:১, ২:৮-১৩,১৬, ৪:১৪৫
[৭০] আল কুরআন, ৪:৩১
[৭১] আল কুরআন, ২৪:৩১, ৪:১৮

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইসলামী বিশ্বাস মতে হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী । তিনি খাতামুন নাবিয়ীন।[৭২] আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে নবুওতের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন, দ্বীনের পূর্ণতা প্রদান করেছেন। তাঁর আনীত কিতাব ও ধর্মই বহাল থাকবে খোদায়ী ধর্ম হিসাবে। আর এর অনুসরণ করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক । কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কোনরুপ ইচ্ছা বা নির্দেশের বাস্তবতা কখনোই এ ধর্মের অনুশাসনের বিকল্প হতে পারে না।[৭৩]

৯. ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান দিক হলো এর ইবাদত পদ্ধতি । বস্তুত নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা-প্রার্থনার পাশাপাশি ইবাদাতের নতুন ধারনার জন্ম দিয়েছে ইসলাম । ইসলাম মতে- আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশনা মোতাবেক কৃত সকল কার্যই ইবাদত হিসাবে গণ্য। ফলে ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন সকল কাজই ইবাদত হিসাবে পালন করা সম্ভব । কেননা ইসলাম শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতেরই নির্দেশনা দেয়নি বরঞ্চ সামগ্রিক আনুষ্ঠানিক ইবদাতের নির্দেশনাও দিয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিমদের উপাসনালয় হলো মসজিদ। তবে ইবাদত বা প্রার্থনার জন্য মসজিদ থাকা শর্ত নয়। বরং সারা পৃথিবীর যেকোন পবিত্র স্থানই মুসলিমদের জন্য ইবাদাতের স্থান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।[৭৪] আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে ইসলামে প্রধানতম হলো দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।[৭৫] এছাড়া যাকাত প্রদান,[৭৬] হজ্জ পালন,[৭৭] রোজা রাখা[৭৮] ইত্যাদিও আবশ্যকীয় ইবাদাত। এতদ্ব্যতীত দান খয়রাত, ঐচ্ছিক নামাজ আদায়, কুরআন তেলাওয়াত[৭৯] আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ[৮০] ইত্যাদিও আনুষ্ঠানিক ইবাদাত হিসাবে গণ্য। মুসলিমদের জন্য সামগ্রিক উৎসবের দিন হলো বাৎসরিক দু'টি- যথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। মুসলিমগণ ব্যাপক ভাব-গাম্ভীর্য ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এ খুশি ও আনন্দ উৎসব পালন করে থাকে । এছাড়া আশূরা, মেরাজ, শবেবরাত, শবেকদর, ঈদে মীলাদুন্নবী (স) মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে পরিচিত।

---

[৭২] আল কুরআন, ৩৩:৪০, ৫:৩, ৭:১৫৮, ৩:৮১
[৭৩] আল কুরআন, ৪:৫১
[৭৪] আল কুরআন, ২৪:৩১, ৪:১৮
[৭৫] আল কুরআন, ২:৪৩, ২৪:৪১, ৪:১০৩, ১৭:৭৮, ২৩: ১২, ২:৪৫
[৭৬] আল কুরআন, ৯:১০৩, ২:১১০, ৯:১১, ৪১:৬-৭
[৭৭] আল কুরআন, ৩:৯৭, ২২:২৭, ২:১৯৯, ২:১৯৭
[৭৮] আল কুরআন, ২:১৮৫, ২:১৮৩, ২:১৮, ২:১৮৫
[৭৯] আল কুরআন, ১৬:৪৪, ৩:১৬৪, ৪:৮২
[৮০] আল কুরআন, ৩৩:৪১-৪২, ২:১৫২, ১৩:২৮

Dhaka University Institutional Repository

১০. নীতি নৈতিকতা ও মানবিকতার শিক্ষাও ইসলাম ধর্মের মূলনীতির অন্যতম । শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে সর্বোচ্চ মানবিকতার প্রকাশ ঘটানো মুসলিমদের প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । এজন্য সামষ্টিকভাবে নৈতিকতা চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও এর অনুশীলন বাধ্যতামূলক। তাই ইসলামে ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন, মন্দ স্বভাব ত্যাগ ও সৎচরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার শিক্ষা দেয়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা, সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, পরোপকার ইত্যাদি সকল নৈতিক গুণের অনুশীলন করা সকল মুসলিমেরই অবশ্য কর্তব্য । এ প্রসঙ্গে আল কুরআন ও হাদীসে মুসলিমদেরকে নানভাবে অনুপ্রাণিত করে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৮১] পাশাপাশি মানুষের স্বভাবজাত লোভ লালসা, হিংসা, ঘৃণা, অহংকার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব থেকে দূরে থাকারও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ।[৮২] মানব জীবনে নৈতিকতা রক্ষা ও শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে ইসলামের এই মূলনীতি যে সর্বোতভাবে সক্ষম তার প্রমাণ পাওয়া যায় নানা যুগের প্রকৃত মুসলিমদের জীবনীর পর্যালোচনায় । বস্তুত ইসলামের এই আদর্শ মানবিকতার চরম অবক্ষয়লগ্নে মানুষকে সুশীতল পরশ বুলিয়ে দিতে পারে ।

১১. আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা ইসলামের অনুসারীদের অন্যতম কর্তব্য। সমাজ সংসার ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে ধ্যান তপস্যাকরা, সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ করা ইসলাম উৎসাহিত করে না। কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মানিয়োগ করে নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন ইসলাম গুরুত্বপুর্ণ মনে করে। ইসলাম মতে আত্মিক সাধনার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর তা'আলার অস্তিত্ব, সৃষ্টি রহস্য , মানব সত্তার স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে যর্থার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে। আল কুরআনে অধ্যাত্ম সাধনা বা তাসাউফ চর্চার ব্যাপারেও উৎসাহ অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে স্পষ্ট ভাষায় ।[৮৩]

১২. আল কুরআন ইসলামী জীবন চালনার ভিত্তি স্বরূপ। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এটিই । আরবী ভাষার নাযিলকৃত এ কিতাব মানজাতির প্রতি রাসূল (স) আনীত এক বিস্ময়কর মুজিযা।[৮৪] ভাষার লালিত্যে, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায়, বিন্যাসের নৈপুন্যে আল-কুরআন বস্তুতই এক অসাধারণ গ্রন্থ। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই যার আলোচনা এ গ্রন্থে করা হয়নি ।[৮৫] মানবজীবনের সকল বিষয়ের সুষ্ঠু ও খোদায়ী সমাধানমুলক এ গ্রন্থটির ১১৪ টি সূরা মোট ৩০টি খন্ডে বিভক্ত । বিস্ময়কর হলেও সত্য যে অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রায় ১৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও এ গ্রন্থটির একটি বিন্দু পর্যন্ত বিকৃত হয়নি।[৮৬]

---

[৮১] আর কুরআন ৯:১১৯, ২:১৫৩, ২:১৯৫. ২:১৫২, ১৬:৯০, ৪:৫৮, ৬৪:১৪, ৭:১৯৯, ২৫:৬৩, ২:২৬১, ২:২৬৭, ৪:৫, ১৭:৩৪, ২:১৭৭, ২৪:১২
[৮২] আল কুরআন, ৪৩:৩৬, ৩১:১৮, ২২:৩০, ৪:৩২, ৩:১৮০, ২৫:৬৭, ৭:৩১, ৫৩, ৫৩:৩২, ৩:১১৮
[৮৩] আল কুরআন, ৩১:২২, ২৯:৬৯, ৮:১৯, ৩৯:২২, ১০:৬২-৬৪, ৩:৩১
[৮৪] আল কুরআন, ৪৭:২, ১৬:৪৪, ১২:২
[৮৫] আল কুরআন, ৩৮;০৬
[৮৬] আল কুরআন, ১৫;০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম নানা দিক দিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । এগুলো এ ধর্মের অলংকার স্বরূপ। এরূপ কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

একত্ববাদ

ইসলাম বর্তমান বিশ্বের একমাত্র নির্ভেজাল একত্ববাদী ধর্ম । পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্ম মূলগত ভাবে একেশ্বরবাদী হলেও কালপরিক্রমায় ও নানা দল উপদলের বিভাজনে শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ একত্ববাদী ধর্ম হিসাবে টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম এরূপ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম । সময়ের পরিক্রমায় ইসলামে নানা মতবাদ ও শাখা প্রশাখার উদ্ভবেও এর একত্ববাদী বৈশিষ্ট্য কখনোই বাধাগ্রস্থ হয়নি।

বরং একত্ববাদ বা আল্লাহর এককত্বই মূলত ইসলামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । ইসলাম গ্রহণকালে সর্বপ্রথম যে স্বীকারোক্তি দেয়া হয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর রাসুল তা মূলত একত্ববাদেরই বাস্তব প্রমাণ। ইসলামে একত্ববাদকে এত গুরুত্বের সাথে দেখা হয় যে আল্লাহর সাথে তো দূরের কথা তাঁর সত্তা বা গুণাবলী কিংবা তাঁর প্রার্থনায় কাউকে অংশীদার করাও বড় পাপ রূপে গণ্য।[৮৭] এরূপ করলে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের গন্ডীর মধ্যে থাকে না । ইসলাম ধর্মমতে এরূপ পাপকারী ব্যক্তি মুসলিম নয়, বরং মুশরিক এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী।

মানব মর্যাদা

ইসলাম ধর্মমতে মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হলো খেলাফাত তথা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব । এলক্ষ্যে দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকেও মানুষের অধীন করেছেন। সকল মানুষই খলীফা হিসাবে আল্লাহর নিকট সমান মর্যাদর অধিকারী।[৮৮] তবে জন্মগত এ মর্যাদা মানুষ ততক্ষণই বহন করে যতক্ষণ সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত দ্বীন ইসলামকে মেনে চলে।[৮৯]

---

[৮৭] আল কুরআন, ৩:১৩

[৮৮] আল কুরআন, ২:৩০

[৮৯] আর কুরআন, ৫;৩; ৩০;৩০,৫১:৫৬

Dhaka University Institutional Repository

দীন ঃ

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি শুধুমাত্র ধর্ম হিসাবেই কার্যকর নয় বরং এটি হলো দ্বীন। আরবী দ্বীন শব্দটি অভিধানে বহুমাত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস হলেও এর মর্মার্থ মিল্লাত ও শরীআত।[৯০] ধর্ম অর্থের পাশাপাশি এটা জীবন বিধান, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, লেনদেন, পদ্ধতি, নীতিমালা জীবনদর্শন ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শুধুমাত্র ধর্ম অর্থ দ্বারা ইসলামকে গন্ডীবদ্ধ করে রাখা সমীচীন নয় । বরং কুরআনে বিধৃত দ্বীন ইসলাম আরো ব্যাপক অর্থবোধক একটি জীবন ব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিক ইবাদত, দর্শনতত্ত্ব ও সার্বিক জীবনযাপনের নীতিমালা ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করে। ইমাম আবু হানীফার মতে দ্বীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম এবং শরী'আতের যাবতীয় বিধি বিধান এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৯১] আল্লাহ তা'আলাও এই অর্থেই পবিত্র কুরআনে ইসলামকে মানব জাতির নিকট পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পুর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম"।[৯২]

ঐশী মনোনয়ন

পৃথিবীর তাবৎ ধর্মসুহের মধ্যে ইসলামই একমাত্র ঐশী ধর্ম হিসাবে নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। মানবীয় ধারণা-মতবাদ কিংবা চিন্তা-চেতনা এর মৌলিকত্বকে বিনষ্ট করতে পারেনি । খোদায়ী অন্য ধর্মগুলো উল্টো মানব রচিত ধর্মসমূহের সাথে তাল মিলিয়ে এগুলো ও নানা পরিবর্তন পরিমার্জন সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে নিজেদের আসমানী সত্তার উপর মানবীয় চিন্তার প্রাধান্যকেই প্রকাশিত করেছে যুগে যুগে । অথচ ইসলাম সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে মানবজীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ঐশী বাণীই মুসলিমদের একমাত্র পথ প্রদর্শক । মূলত ইসলামের এই ঐশী সত্তা আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত এই বাণীরই পূর্ণ প্রতিফলন- নিশ্চয়ইআল্লাহর নিকট মনোনীত দীন ইসলাম।[৯৩]

পূর্ণাঙ্গতা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এর পূর্ণাঙ্গতার স্বরূপ শুধুমাত্র ইহকালীন জীবনেই ব্যাপৃত নয়। বরং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কি হবে তারও বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করে ইসলাম। এ ক্ষেত্রে পরকালীন জীবনের নানা স্তর যথা সাকরাতুল মাউত, মৃত্যু, কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপক বর্ণনা মানুষকে পরকালীন জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে। শুধু তাই নয় বরং

---

[৯০] ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, ৫ম খন্ড, পৃ.২৯৯

[৯১] ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

[৯২] আল কুরআন, ৫:০৩, ৯:৩৩, ১১০:২, ৩০:৩০

[৯৩] আল কুরআন, ৩:১৯

Dhaka University Institutional Repository

বেহেশত-দোজখে মানুষ কি অবস্থায় থাকবে, কি নেয়ামত বা শাস্তি লাভ করবে ইত্যাদির বিবরণও এধর্মের পূর্ণাঙ্গতার পরিচায়ক।

অন্যদিকে ইহকালীন জীবনেও ইসলাম তার পূর্ণাঙ্গতার প্রকৃতি ফুটিয়ে তুলেছে ভালভাবে। এ পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ দীন হিসাবে ইসলামের আবির্ভাব, যা একসাথে অনেকগুলো বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে। যথা (১) আকীদা-ঈমান (২) ইবাদত ও আমল (৩) ব্যক্তিগত জীবন মু'আমালাত ও মু'আশারাত তথা লেনদেন ও আচার ব্যবহার (৪) সামষ্টিক সম্পর্ক তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তজাতিক বিষয়াবলী ইত্যাদি। বস্তত ইহকালীন জীবন পরিচালনায় এসব বিষয়ের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এজন্যই এটি আল্লাহ তাআলা ঘোষিত একমাত্র, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।

সর্বজনীনতা

সর্বজনীনতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটা কোন নিদিষ্ট স্থান কাল বা জাতির নিকট অবতীর্ণ হয়নি। বরং এর প্রয়োগ ও ব্যাপ্তি বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। সকল মানুষই এর উদাত্ত আহবান ও বিধি বিধানের আওতাভূক্ত। ইসলাম শুধু সাধু পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মনীষীদের কথাই বলে না বরং সঠিক পথ নির্দেশ করে পাপ পূণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সেই সাধারণ মানুষকেও।[৯৪] বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে ইসলাম কোনরূপ বর্ণভেদ কিংবা বর্ণপ্রথায় বিশ্বাসী নয়। বিশ্বজুড়ে ইসলামের প্রসারও বিকাশ ইসলামের এ কথারই জ্বলন্ত প্রমাণ। গিবের ভাষায়ঃ "বাস্তবিকই ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশি এটা একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। ...ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বিকাশের এত বৃহত্তম সম্ভাবনা নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[৯৫]"

স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম।[৯৬] মানুষের স্বভাবগত চাহিদা ও কর্মকান্ডকে ইসলাম অস্বীকার করে না। বরং কল্যাণবোধ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের স্বভাবকে সুন্দর পথে পরিচালিত করাই ইসলামের কাজ । এজন্য ইসলামকে বলা হয় দ্বীনে ফিতরাত। ইসলামকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির (ফিতরাত) অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আলাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[৯৭]

---

[৯৪] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ পৃ.৭

[৯৫] Gibb, Whither Islam হতে উদ্বৃত, রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, ঢাকা: সাহিত্য কুঠির বগুড়া, ১৯৮৬, পৃ. ১০

[৯৬] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৯৭] আল কুরআন, ৩০:৩০

Dhaka University Institutional Repository

বস্তত পার্থিব জীবন ও মানব প্রকৃতি ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ধর্ম আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্ম বহিভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। এটি জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ হতে। এমনকি ইসলামের আইন কানুনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগৎ ও জীবনের ষোলআনা স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। বাস্তব ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যে কোন যুগের উপযোগী, জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মধ্যমপন্থী ধর্মঃ

মানবকল্যাণের নিমিত্তে ইসলাম মধ্যপন্থাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। শরী'আত নির্ধারণের কোন ক্ষেত্রে একেবারে উদারতা কিংবা চরমপন্থার সুযোগ ইসলামে নেই। বিষেশত পারস্পরিক জীবনাচরণ ও সামষ্টিক বিষয়াবলীতে ইসলামের মধ্যপন্থী অনুশাসন গুলো শান্তি ও সম্প্রীতির অন্যতম রক্ষাকবচ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী- "তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।"[৯৮] মহানবী (স) বলেছেন "এই দ্বীন শান্তির ধর্ম, এটা স্বকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা মুক্ত। যদি কেহ ধর্মীয় বিষয়ে অতিমাত্রায় কঠোর হতে চায় তাহলে তার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। সুতরাং সহজ সরল পথে থাক; নিকটবর্তী হও, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং সকাল-বিকাল ও নিশীথে সাহায্য প্রার্থনা কর।"[৯৯]

এতদ্ব্যতীত ইসলামের মধ্যপন্থার আরো একটি অনন্য নিদর্শন হলো এ ধর্ম ব্যক্তিবাদ ও সমষ্টিবাদের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে সুন্দর ভাবে। ইসলাম সমস্ত মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অনুরূপভাবে সামষ্টিক জীবনের প্রতিও ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। মানবগোষ্ঠীর প্রতি ইসলামের দায়বদ্ধতা শরীয়াতের আইন কানুন পর্যালোচনায় স্পষ্টতই বুঝা যায়। সুতরাং ইসলামের মধ্যপন্থা এরই স্বকীয়তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সাম্যবাদী ধর্ম

মানব সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। আর এজন্য ইসলাম সর্বপ্রথমই মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সমতা শুধু আক্ষরিক কিংবা তাত্ত্বিক নয়। বরং জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ইসলাম এর প্রয়োগ করে দেখিয়েছে। সর্বপ্রথম ইসলাম যে সমতা ঘোষণা করেছে তা হলো জন্মগত সাম্য। অর্থাৎ ইসলাম মতে সমস্ত মানুষ আদি পিতা আদম হতে সৃষ্ট। সুতরাং সৃষ্টিগত ও জন্মগত ভাবে সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। পরবর্তীতে জীবন চলার পথে ইসলাম আরো বেশ কিছু

---

[৯৮] আল কুরআন, ১৭:২৯

[৯৯] বুখারী ও মুসলিম সূত্রে আবদেল রহিম উমরান, (অনু. শাসসুল আলম), *ইসলামী ঐতেহ্য পরিবার পরিকল্পনা,* গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আই ই এম ইউনিট ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এর যৌথ প্রকাশনা, ১৯৯৫, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে সাম্যের বাণী ঘোষনা করেছে, যেমন মানবধিকারে সাম্য, আইনগত সমতা, ধর্মপালনে সাম্য ইত্যাদি। বস্তুত ইসলাম বর্ণ, ভাষা, গোত্র, মর্যাদা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষম্যসমূহ অপসারিত করে মানবতায় জয়গান গেয়ে ওঠে। ইসলাম মতে সকল মানুষ আল্লাহর পরিবারতুল্য।[১০০] সুতরাং বর্ণ, গোত্র, রক্তসম্পর্ক কিংবা ভৌগোলিক পরিচয় মানবগোষ্ঠিকে বিভক্ত করতে পারে না। ইসলামের শ্বাশত আহবান হলো সকল মানুষকে এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করে শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা।

সহজ সরল ধর্ম

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সহজতা সরলতা। এটি কোন জটিল শাস্ত্রতত্ত্ব নয়। বরং এর শিক্ষা ও কানুনগুলো খুবই সহজবোধ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। কোনরূপ অস্পষ্টতা, কুসংস্কার ও অব্যাখ্যেয় বিষয়ের স্থান এ ধর্মে নেই। কঠোর হওয়ার পরিবর্তে সহজসাধ্য হওয়াই ইসলামের বিধি বিধানের প্রকৃতিগত রূপ। আল্লাহ বলেন- "তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই"।[১০১] ইসলাম চায় মানুষ যেন সহজেই আলাহর হুকুম মেনে ইহ-পরকালীন শান্তি, সফলতা ও মুক্তি লাভ করে। এজন্যই এর শরীআত মানুষকে তার প্রজ্ঞাশক্তি জাগ্রত করতে শেখায়, বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে। ফলে মানুষ সবকিছু বাস্তবের আলোকে দেখতে শিখে।[১০২] ফলে বাস্তবতার শিক্ষা ধর্মপালনের অবশ্যকীয় কাজ মানুষের নিকট সহনীয় ও সহজ করে তোলে। এছাড়াও ইসলামী বিধিবিধানের সহজ হওয়ার অন্যতম দলীল হলো এর সর্বজনীনরূপ। ধনী ব্যক্তিগণ যেমন পূর্ণাঙ্গ ভাবে এ দ্বীনকে পালন করতে সক্ষম তেমনি গরিবগণও দীনের যথাযথ অনুসরণে অক্ষম নয়। অনুরূপভাবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বয়স,ভাষা, গোত্রের ভিন্নতা সত্ত্বেও এ ধর্মের সহজ সরল বিধানাবলী সকলের জন্যই পালনীয়। কঠোরতার অনুপস্থিতি ও কোমল বৈশিষ্ট্যের অনন্যতা একমাত্র ইসলামেরই অলংকার।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা লিখে শেষ করার মত নয়। কেননা প্রতিপালকের প্রদত্ত ও মনোনীত ধর্ম মানবকল্যাণের সমস্ত গুণাবলী নিয়েই আবির্ভূত হবে এটাই স্বাভাবিক। যৌক্তিক ধর্ম, বাস্তবতার ধর্ম, কল্যাণকর ধর্ম, বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম, শান্তি-সম্প্রীতির ধর্ম, গুণগত মানের ধর্ম, পরিকল্পনার ধর্ম,[১০৩] সর্বকালের ধর্ম, মানবতাবাদী ধর্ম ইত্যাদি হাজারো নামে ইসলামের নামকরণ বস্তত যুগ যুগান্তরে ইসলাম গবেষণার ফলশ্রুতিতেই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের গবেষণায়ও ইসলামের বহু অনন্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে এবং উঠবে এটাও অকল্পনীয় নয়। তবে ইসলামের স্বরূপ উদঘাটনে মানব মন্ডলীর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে স্রষ্টা প্রদত্ত এ ধর্ম সার্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণের ধর্ম এবং এর অনুসরণেই মুক্তি ও সফলতা নিহিত রয়েছে।

---

[১০০] *মিশকাত শরীফ*, কিতাবুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

[১০১] আল কুরআন, ২২:৭৮

[১০২] আলকুরআন, ৩৯:৯, ৭:১৭৯, ২:২৬৯

[১০৩] আবদেল রহিম উমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম

মুসলিম আরবী শব্দ এটি ইসলাম ক্রিয়ামূল হতে উদ্ভুত কর্তৃবাচক শব্দ। সাধারণ অর্থে মুসলিম বলতে ইসলাম গ্রহণকারীকে বুঝায়। অর্থ্যাৎ ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসাবে নিজেকে দাবী করাই মুসলিম হওয়ার প্রধানতম পরিচায়ক। বাংলা ভাষায় এর প্রতিশব্দ হিসাবে মুসলমান শব্দটি প্রচলিত। আল মুনজিদ অভিধান মতে মুসলিম শব্দের অর্থ- ইসলামের অধিকারী ব্যক্তি।[১০৪]

পরিভাষায় বলা চলে যারা কালেমা পড়ে আল্লাহ ও রাসূল (স) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ঈমানের সাতটি শর্তকে বিশ্বাস করে তাদেরকে মুসলিম বা ইসলাম গ্রহণকারী বলে। অন্যকথায় কোন ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা নারী, যদি স্বীয় জীবনকে আলাহর ইচ্ছার সম্মুখে নত করে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে মুসলিম বলা হয়।[১০৫]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যাবতীয় বিষয়কে বিশ্বাস করে এর আচার-অনুষ্ঠান ও আইন কানুনকে নিজ জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার সামনে সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করা ব্যক্তিকেই মুসলিম বলা যায়। কুরআন ও হাদীসে প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় সম্পর্কে অনেক গুণাবলীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ইসলামী আইনবিদদের মতানুযায়ী- কোন ব্যক্তি যদি মৌখিকভাবে ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় তবে তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে পার্থিবজগতে সে আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করুক বা না করুক, কিছুই আসে যায় না। এটা আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার দাবী করার পরও এমন কোন কাজ করে যা মানুষকে ইসলাম হতে বের করে দেয়, যেমন- কুফরী কাজ, শিরক ইত্যাদি তবে তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে না। অবশ্য এরূপ কাজের পর পুনরায় একত্ববাদের কালিমার সাক্ষ্য দিলে তাঁকে মুসলিম হিসাবেই গণ্য করতে হবে।

---

[১০৪] আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৭.

[১০৫] Ruqaiyyah, ibid, p. 47

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমুসলিম

অমুসলিম শব্দটি মুসলিম শব্দপূর্বে 'অ' উপসর্গযোগে গঠিত। নঞার্থক 'অ' যুক্ত এ শব্দের অর্থ যারা মুসলিম নয়। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারীবৃন্দ কিংবা নাস্তিক সম্প্রদায় সবাই অমুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রশাসনিক কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট ভাবে পরিচালনার স্বার্থে অমুসলিমকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-যিম্মী, মু'আহাদ, মুস্তা'মান ইত্যাদি।

তবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে অমুসলিমদের এরূপ বিভাজন নেই। কেননা এ বিভাজন শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার, প্রশাসন ও দায়িত্বশীলদের সাথে বসবাসরত অমুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান নেই সেসব ক্ষেত্রে সম্পর্ক নির্ধারণে এরূপ বিভাজন অযৌক্তিক। অবশ্য ইসলামী সাধারণ মূলনীতিতে অমুসলিমদেরকে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। যথা- ক. আসমানী কিতাবাধারী অমুসলিম বা আহলে কিতাব, খ. আসমানী কিতাবহীন অন্যান্য অমুসলিম। উভয় প্রকারের অমুসলিমদের সাথে ব্যবহারগত ক্ষেত্রে ব্যাপক না হলেও নানা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা এ দু'প্রকারের অমুসলিমদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করব।

ক. আসমানী কিতাবের অনুসারী অমুসলিম

ইসলামী পরিভাষায় এ প্রকারের অমুসলিমগণকে বলা হয় আহলুল কিতাব। অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অনুসারী, তথা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান। ইসলামী বিশ্বাস মতে- এ দু'সম্প্রদায়ের লোকগণই আসমানী কিতাব লাভে ধন্য। ইয়াহূদীদের নবী মূসা (আ) এবং খ্রিস্টানদের নবী ঈসা (আ) উভয়েই ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত মানব। তাঁরা উভয়েই যথাক্রমে তাওরাত ও ইন্‌জীল নামক আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হন। তাঁদের প্রচারিত ধর্ম ছিল মহান আল্লাহ পাকেরই নির্দেশিত পথ; মানব মুক্তির অন্যতম পথ। পরবর্তীতে এ নবীদ্বয়ের দেখানো পথ হতে তাদের অনুসারীরা বিচ্যুত হয়ে পড়ে। বিশেষত তাওহীদ তথা একত্ববাদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে তারা আসমানী কিতাবদ্বয়কে বিকৃত করে ফেলে। যার প্রেক্ষিতে খোদায়ী ধর্মের পরিপূর্ণতা বিধানে অবতীর্ণ হয় ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

আহলে কিতাবকে পাশ্চাত্য পরিভাষায় বলা হয়- "The People of the Book."[১০৬] আর এদের পরিচয়ে বলা হয়েছে- "The term 'People of the Book' in the Quran refers to followers of Monotheistic Abrahamic Ruligion that are older than Islam. This includes all Christians, all Jews and Sabains."[১০৭]

বস্তুত আহলে কিতাব প্রত্যয়টির ব্যবহার সর্বপ্রথম আল কুর'আনেই লক্ষ্য করা যায়। আর এ দ্বারা প্রধানত যে দুটি ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তা হলো ইয়াহূদী ধর্ম ও খ্রিস্টার্ন ধর্ম। অবশ্য কতিপয় পাশ্চাত্যবিদগণ আহাল কিতাবের আওতায় জরথ্রুস্ট ধর্ম ও হিন্দুধর্মকেও অন্তর্ভূক্ত করেন।[১০৮] তবে ইসলামী পরিভাষায় আহলে কিতাব প্রত্যয়টি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা শুধু ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বেলায়ই প্রযোজ্য। আল কুরআনের অনেক জায়গায় আহলে কিতাব শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উপস্থাপিত হল-

- "তুমি বল। হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতিত কাহারও ইবাদাত না করি, কোন কিছুকেই তাহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।"[১০৯]

- "হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে তাহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহর নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে"।[১১০]

---

[১০৬] বিস্তারিত দেখুন-
- Hurbert Busse, ***Islam, Judaism and Christiarity, Theological and Historical affiliations,*** *Princeto*n, NJ: Mascus weiner, 1988
- F.E Peters, ***The Monotheists: Jews, Christians, and Muslim in Conflict and Competition,*** Vol1, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2003
- Farhur Rahman, ***Major Religions of the Quran,*** 2nd ed. Minneapolis, MN: Bibliotheca Islamica, 1994, p.162-170.

[১০৭] S.V. Deshika Char, ***Hinduism and Islam in India,***Caste, Religion and Socity from Antiquity to Early Modern times, Markus Wiener Publishes, Princeton, 1997, p.46

[১০৮] Peter Clark, ***Zoroastrianism: An Introduction to an ancient faith.*** Sussex Academic Press, 2009, p.25-30

[১০৯] আল-কুরআন, ৩:৬৪

[১১০] আল-কুরআন, ৫: ১৫

Dhaka University Institutional Repository

- বল "হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইন্‌জীল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই।' তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করে। সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দু:খ করিও না"।[১১১]

আল কুর'আনের বহু আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাবের উদ্দেশ্য করে নানা বক্তব্য প্রদান করেছেন। এগুলোর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাদের স্বরূপ ফুটে উঠে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা আহলে কিতাব খ্যাত ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি।

ইয়াহূদী ধর্ম

বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম ধর্ম বিশ্বাস হলো ইয়াহূদী ধর্ম। জনসংখ্যার বিচারে এটি পৃথিবীর নবম বৃহত্তম ধর্মমত।[১১২] এর অনুসারী সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ।[১১৩] ইয়াহূদীদের উৎপত্তি মূলত হযরত ইব্রাহীম (আ) হতে। তাঁর পুত্র ইসহাক, তদীয় পুত্র ইয়াকুব (আ) এর বারজন পুত্র সন্তান ছিলো। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল ইয়াহুদা। হযরত ইয়াকুবের এই পুত্র ইয়াহুদার সন্তান ও উত্তরপুরুষরাই ইয়াহুদী নামে খ্যাত। এজন্যে ধর্মবিদগণ ইয়াহূদীদের ধর্মকে ইব্রাহীমী (Abrahamic) ধর্ম বলে থাকেন।[১১৪]

ইসলামের পরিভাষায় ইয়াহূদী ধর্ম হলো-হযরত মূসা (আ) এর প্রবর্তিত বিধানবলীতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম। মূসা (আ) এর পরবর্তীতে আরো বেশ কিছু নবী-রাসুল এ ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করেন।

---

[১১১] আল-কুরআন, ৫:৬৮,

[১১২] Mahwah, ***World Almanac and Book of Facts 2000 NJ***, Primidia Reference Inc. 1999

[১১৩] ***"World People: Religions,"*** C/A world Fact book, Central Intelligence Agency: 2007, USA

[১১৪] Lovis Iacob, ***'Judaism' in Freb Skolnik 'Encyclopaedia Judaica, II*** (2nd ed) Farmington Hill: Thomson Gale, 2007, p:511

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যবিদগণ ইয়াহূদী ধর্মকে Judaism এবং ইয়াহূদীদেরকে Jews বলে অভিহিত করেন। এ ধর্মের পরিচয় প্রদানে কে এন তেওয়ারী বলেন-[১১৫]

> "Judaism is the religion of the Jews, the discendents of the ancient Hebrews, 'the chosen prople'. It is based on a revelation made to the prophet Moses on the Mount Sinai. It is thus a revealed religion and is "the classical paradigm of a God made religion".

আর ইয়াহূদীগণ সম্পর্কে বলা হয়- "Jews, the original people of the Book (Arabic, Ahl al-Kitab) to whom Allah granted a series of revelations through chosen prophets".[১১৬]

ইয়াহূদী ধর্মের মূল বিশ্বাস

সংক্ষিপ্তভাবে ইয়াহূদীদের মূল ধর্মবিশ্বাস হলো-

১. স্রষ্টা বা ঈশ্বর হলেন একজন। এ হিসাবে ইয়াহূদী ধর্ম একেশ্বরবাদী। তাঁদের মতে- তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর অন্য নাম-যেহোবা (দয়ার প্রতীক), ইলোহিম (বিচারক), শেখিনা (সর্বত্র বিরাজিত), মাকোম (সর্বত্রগামী)। [১১৭]

২. এ ধর্মমতে- স্রষ্টা মানব জাতির মুক্তির জন্য বহু নবী রাসূল তাদের মাঝে পাঠিয়াছেন। তাদের মধ্যে সর্ব প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মূসা (আ)। [১১৮]

৩. ইয়াহূদী ধর্মে ফেরেশতা ও মন্দ আত্মা তথা শয়তানের বিদ্যমান থাকা স্বীকৃত।

৪. এ ধর্মমতে, বনী ইসরাঈলরা তথা ইয়াহূদীগণ স্রষ্টার নির্ধারিত মানুষ (The chosen people); স্রষ্টা তাদেরকে তাওরাত ও ধর্মের রক্ষক হিসাবে নির্বাচিত করেছেন।

৫. ইসরাইল হলো তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গীকারকৃত ভূখন্ড। (The promised land)

---

[১১৫] Keder Nath Tiwari, ***Comperatire Religion***, Delhi: Motilal Banarsidass, 1983, p.104
বিস্তারিত জনার জন্য দেখুন-
- Dan Cohn-Sherbok, ***Judaism: History, belief and practice***, Routledge, 2003
- John Day, ***Yahweh and the Gods and Goddesses of Conaan***, Chippenhem: Sheffield Academic Press, 2000.
- Teffilin, ***The Book of Jewish knowledge***, New York: Crown Publisher, 1964
- Million Steinberg, ***Basic Ijudaism***, New York: Harcourt Brace Iovanovich, 1947

[১১৬] Ruqaiyyah, Ibid, p.35

[১১৭] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, *পৃথিবীর ধর্মগুলি*, ঢাকা:উম্মা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ.৭৩

[১১৮] কেদার নাথ তিওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯

Dhaka University Institutional Repository

৬. তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত কেবল একটি গ্রন্থই নয়। বরং একটি আচরণবিধি, একটি শৃংঙ্খলাবিধি।[১১৯]

৭. ইয়াহূদীগণ আত্মার অমরত্ব ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী। যদিও এ বিষয়ে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই তথাপিও তারা স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী।[১২০]

৮. নৈতিক চরিত্র অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি পালনও ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম অংশ।

৯. এ ধর্ম মতে-সকল মানুষ সমান এবং ঈশ্বরের আকৃতিতে সৃষ্ট। এ বিশ্বকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। সুতরাং তাঁকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে চলাফেরা করতে হয়।

১০. সর্বোপরি এ ধর্ম নিজকে ঐশী ধর্ম বলে মনে করে। তাদের মতে-ইয়াহূদী ধর্ম স্রষ্টা কর্তৃক অবতারিত আসমানী দিক নির্দেশনা। এর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত।

ধর্মগ্রন্থ

ইয়াহূদীদের মুল ধর্মগ্রন্থ হলো তাওরাত। এটি মহান আল্লাহ কর্তৃক আসমানী বাণী হিসাবে হযরত মূসা (আ) এর প্রতি অবতারিত। বর্তমান বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রথম পাঁচটি পুস্তক হলো এই তৌরাত গ্রন্থ। তাদের দাবী অনুযায়ী ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রথম পাঁচ পুস্তক বা তাওরাত দু'অংশে বিভক্ত লিখিত ও মৌখিক। তৌরাত বা ওল্ড টেস্টামেন্ট ব্যতীত ইয়াহূদীরা আরো যেসব ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসরণ করে থাকে তা হলো-

১. হালাকখা-(মৌখিক তাওরাতের আইন ও তাত্ত্বিক অংশ)

২. হাগগাদা-(মৌখিক তাওরাতের ইতিহাসভিত্তিক অংশ)

৩. মিদরাশ- (তাওরাতের সমস্যা ভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ)

৪. মিশনা-(মৌলিক আইন সংক্রান্তগ্রন্থ)

৫. তালমুদ- মিশনার ব্যাখ্যা গ্রন্থ। যা ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্রের সর্বশেষ সংযোজন। একে ইয়াহূদীধর্মের এনসাইক্লোপেডিয়া বলা হয়।[১২১]

---

[১১৯] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

[১২০] তেওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯

[১২১] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ..৭৩-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ইয়াহূদী ধর্মের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপিত হল-

- ইয়াহূদীগণ চান্দ্রমাস উদযাপন করে থাকে। সৌরবছর তাদের ধর্মীয় হিসাব নয়। তবে সৌরবছরের সাথে সামঞ্জস্য করতে কয়েক বছর পরপরই লিপিয়ার হয়। যা ৩৮৪ বা ৩৮৫ দিনে পরিপূর্ণতা লাভ করে।[১২২]
- ইয়াহূদীরা দৈনন্দিন উপাসনায় বিশ্বাসী। সকালে ঘুম হতে ওঠার পর, সাজগোজ ও আহারের পূর্বে, ঘুমানোর সময় ইত্যাদি দৈনন্দিন নানা কাজে তাদের উপাসনা ও প্রার্থনা প্রচলিত রয়েছে।
- তাঁদের প্রার্থনালয়ের নাম 'সিনাগগ' (Synagogue), আর যাজকদের বলা হয় 'রাব্বী'।
- তাঁদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো- রোশ হাসানাহ (ইয়াহূদী নববর্ষ), ইয়ুম কিপুর (প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষমাপ্রার্থনার উৎসব), হানুকাহ (আলোক উৎসব), প্যাসোভার (সাপ্তাহিক উদযাপন উৎসব), শাবৌত (সাপ্তাহিক আনন্দ ভোজ), সাক্কুত (মেলা) ইত্যাদি।[১২৩]
- সাপ্তাহিক পবিত্র দিন হিসাবে তারা সাবাত বা শনিবারকে মান্য করে থাকে। কেননা তাদের মতে এদিন স্রষ্টা বিশ্ব ব্রহ্মা- সৃষ্টির পর বিশ্রামে গিয়েছিলেন।[১২৪]

- Ten commandments বা দশ আজ্ঞা ইয়াহূদীদের ধর্ম বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য পালনীয় বিষয়। বাইবেলের 'Exodus' পর্বের ২০:২১৭ এবং 'Deutoronomy' এর ৫:৬-২১ অংশে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান । সংক্ষেপে এ আজ্ঞাগুলো হলো: ঈশ্বরের বাণী-

    ১. আমিই হচ্ছি তোমাদের স্রষ্টা ও ঈশ্বর
    ২. আমা ব্যতীত কোন ঈশ্বর নেই; এবং আমার কোন বাহ্যিক আকৃতি নেই।
    ৩. তোমরা কখনো আমার নামের অপব্যবহার করোনা।
    ৪. সাবাত (শনিবার) দিবসকে স্মরণ রাখিও ও এদিনকে পবিত্র মনে করো।
    ৫. স্বীয় মাতা-পিতাকে সম্মান করো।
    ৬. প্রাণী হত্যা করো না
    ৭. ব্যভিচার করো না
    ৮. চুরি করো না
    ৯. প্রতিবেশির ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না
    ১০. প্রতিবেশির স্ত্রী, সম্পদ, দাস-দাসী ও পশু সম্পদের প্রতি লোভ করো না।[১২৫]

---

[১২২] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

[১২৩] Milton Steinberg, ***Basic Indaism***, New York: Harcout Brace Joranovich, 1947, p.36

[১২৪] Tefllim, ***"The Book of Icaish Knowledge"*** New York: Crown Publishers, 1964, p.458

Dhaka University Institutional Repository

- ইহুদী ধর্মবিশ্বাসীরা আধুনিলকালে বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
  ১. অর্থোডক্স ইয়াহূদীবাদ: এ দলের ইয়াহূদীরা মূসা (আ) প্রবর্তিত আইন ও তালমুদের পূর্বতন অনুশাসনের অনুসারী হিসাবে পরিচিত।[১২৬]
  ২. নিওলগ ইয়াহূদীবাদ: এর উৎপত্তি হাঙ্গেরীয়ান ভাষাভাষী অঞ্চলে, এরা রক্ষনশীল ইয়াহূদীবাদের শাখা হিসাবেও পরিচিত।
  ৩. রক্ষণশীল ইয়াহূদীবাদ: এর উৎপত্তি হয় জার্মানীতে ঊনবিংশ শতকে। তবে এর বিকাশ ঘটে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।
  ৪. প্রগতিশীল ইহুদীবাদ: এর উৎপত্তি হয় জার্মানিতে। এ মতানুসারীগণ সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তালমুদের পরিবর্তিত, সংশোধিত ও সংযোজিত বিধানের অনুসারী। এরা আবার উদারপন্থী ও সংস্কারপন্থী দু'ভাগে বিভক্ত।[১২৭]

- জায়নবাদ ইয়াহূদীদের অন্যতম প্রধান আন্দোলন। এটা মূলত রাজনৈতিক আন্দোলন। ইয়াহূদীদের জন্য সার্বভৌম ও জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে ইয়াহূদী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন তাকেই জায়নবাদ বা Zionism বলা হয়।[১২৮] তাদের ভাষায়-স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ইয়াহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট ভূখন্ড উদ্ধারের আন্দোলনই এই জায়নবাদ। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে এ আন্দোলন ব্যাপক গতি লাভ করে এবং এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরাইল রাষ্ট্র, যা তাদের মতে 'The Promised Land' হিসাবে গণ্য। বর্তমানে এই জায়নবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইয়াহূদী তথা ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

---

[১২৫] দেখুন David Hazong, ***The Ten commandments***, New York: Scribner, 2010
[১২৬] তিওয়ারী, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৮
[১২৭] তেওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
[১২৮] Jeffrey, S. Gurock, ***American Zionism: Mission and politics***, New York, 1988, p.289

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআনে ইয়াহূদীধর্ম

আল কুরআনে ইয়াহূদী ধর্ম প্রসঙ্গে নানা আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ইয়াহূদীদের স্রষ্টা সম্পর্কে ধারনা, একত্ববাদ, মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বেশ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে আল কুরআনে। ইসলাম ধর্ম মতে, ইয়াহূদীরা হযরত মূসা (আ) এর প্রবর্তিত ধর্মমতের অনুসারী দাবী করেন । বর্তমানে তাঁরা হযরত মূসা (আ) এর প্রচারিত দ্বীনের অনুসরণকারী নয়। বরং তারা তাওহীদ ত্যাগ করে শিরকের মধ্যে লিপ্ত। আল কুরআনের ভাষায়- "ইয়াহুদীগণ বলে 'ওযায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং 'খ্রিস্টার্নগণ বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। উহা তাহাদের মুখের কথা, পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে।"[১২৯] আলকুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- "ইয়াহুদীগণ বলে, "আল্লাহর হাত বুদ্ধ, উহারাই বুদ্ধ হস্ত এবং তাহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত।"[১৩০] "যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল কিন্তু তাহরা উহা বহন করে নাই। তাহাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ, কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৩১]

বর্তমান ইয়াহূদী ধর্মের অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সরাসরি নির্দেশ-

> "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শের অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারী থাকিবে না"। [১৩২]

অবশ্য মূসা (আ) এর তাওরাত প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে কুরআনে বেশ ইতিবাচক বর্ণনাও বিদ্যমান। এর প্রকৃত কারণ ইসলাম পূর্ববর্তী নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। আল কুরআনের বর্ণনা-

- "আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়ত প্রাপ্ত হও"।[১৩৩]

---

[১২৯] আল কুরআন, ৯:২৮
[১৩০] আল কুরআন, ৫:৬৪
[১৩১] আলকুরআন, ৬২:৫
[১৩২] আল কুরআন, ২:১২০
[১৩৩] আল কুরআন, ২৩:৫৩

Dhaka University Institutional Repository

- "এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসুলগণ প্রেরণ করিয়াছি, মরিয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি" ।[১৩৪]
- "অত:পর আমি মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ; যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সমন্ধে বিশ্বাস করে" ।[১৩৫]

মুসা (আ) এর উন্নত মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল্লাহর সাথে তাঁর বাক্যালাপের ঘটনায় ।[১৩৬] আল্লাহ বলেন- "অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি । যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসুল যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মুসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যলাপ করিয়াছিলেন" ।[১৩৭] তাঁদের ধর্মগ্রন্থ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

> "নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যাহারা আল্লাহর অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাহাদিগকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী" ।[১৩৮]

বস্তুত: আল কুরআনের নানা বর্ণনাই ইয়াহূদীগণ সম্পর্কে ইসলামের ধারণার সুস্পষ্ট প্রমাণ । ইসলাম ইয়াহূদীদের নবী হযরত মুসা (আ) এর নবুওত ও রিসালাতের এবং তাওরাত কিতাবের আসমানী হওয়ার স্বরূপ বিশ্বাস করে। তবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবের পর ঐ বিধানের ঐশী কার্যকারিতার দাবী মেনে নেয় না। বরং ইসলাম হলো আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত ধর্ম সমূহের পূর্ণাঙ্গতা দানকারী একমাত্র অনুসরণীয় ধর্ম ।

---

[১৩৪] আল কুরআন, ২:৮৭
[১৩৫] আল কুরআন, ৬:১৫৪
[১৩৬] আল কুরআন, ২৮:২৯-৩২
[১৩৭] আল কুরআন, ৪:১৬৪
[১৩৮] আল কুরআন, ৫:৪৪

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান ধর্ম

জনসংখ্যা বিচারে বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম। ইংরেজীতে একে বলা হয় Christianity; আর আরবী তথা ইসলামী পরিভাষায় নাছরানিয়্যাহ বলা হয়। এ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ২.১ বিলিয়ন বা ২১০ কোটি।[১৩৯] খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় খ্রিস্টান (Christian) । তার কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'নাছারা' ।

এ ধর্মের উৎপত্তি মূলত হযরত ঈসা (আ) হতে। খ্রিস্টানগণ যাঁকে Jesus Christ হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে। হযরত ঈসা (আ) এর প্রচারিত ধর্মই খ্রিস্টান ধর্ম হিসাবে পরিচিত। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জন্মের প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। অত:পর তিনি বনী ইসরাঈলের ইহুদীদের মধ্যে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। এটাই পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্ম হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কে.এন. তেওয়ারী বলেন- "As is well known, it has its origin in the teachings of Jesus, a Jew by birth and reported to be born of a virgin mother, Mary." [140]

খ্রিস্টান ধর্মের মুল ধর্মবিশ্বাস:

খ্রিস্টানদের মুল ধর্ম বিশ্বাস হলো-

- খ্রিস্টান ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম অর্থাৎ এ ধর্ম মতে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা একজন তিনি অসীম, চিরজীবী, সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজমান। তিনিই এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর বিনাশকারী, ধ্বংসকারীও তিনিই।

---

[১৩৯] CIA Fact Book, Ibid, 2007

[১৪০] তেওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-

-মুস্তাফা হিলমী, *আল ইসলাম ওয়াল আদইয়ান*, মিশর: দারু-ইবন জাওজী, ২০০৫, পৃ.২১৩-২৫২

- Michael Ramsey, ***Jesus and the Living Past***, Oxford Univesity Press, 1980
- Alam Padgetl & Sally Bruyneel, ***Introducing Christianity***, N.Y: Oribis Book, 2003
- Methnew Arlen Price & Michael Coleins, ***The story of Christianity***, New Youk: Dorling Kindersley, 1999
- Tinda Woodhead, ***Christiahity: a very short Introduction***, Oxford: Oxford University Press, 2004

Dhaka University Institutional Repository

- ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টানদের অন্যতম ধর্ম বিশ্বাস। এটা হলো- ঈশ্বর মূলত একজন হলেও তিনি তিনটি রূপে অবস্থান করেন। অন্যকথায় বলা চলে তিন প্রকারের শক্তির মিলিত সত্তাই ঈশ্বর। এ তিনজন হলেন-

'God the Father, স্রষ্টা পিতা

God the Son, পুত্র যীশু

God the Holy Spirit or Ghost পবিত্র আত্মা'

- যীশু বা হযরত ঈসা (আ) ঈশ্বরের অংশ ও তাঁর একটি রূপ। মানবতার মুক্তির জন্য তিনি ধরায় আগমন করেন এবং মানুষকে স্বর্গীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।
- স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদান এ ধর্মের অন্যতম প্রধান শিক্ষা।
- আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হলেও এধর্মে পূনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের স্থান নেই। বরং তারা ইহকাল ও পরকাল এ দু'প্রকার জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।
- পৃথিবীতে মানুষকে স্রষ্টা তাঁর স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। কিন্তু মানুষ পাপ পূণ্য, ভাল মন্দের বিচার বিবেচনা না করে নিজ মর্যাদাকে বিনষ্ট করে।
- খ্রিস্টানগণ আদি পিতা হযরত আদম (আ) এবং তৎপরবর্তী হযরত ইব্রাহীম , হযরত মুসা (আ) প্রমুখ নবীদের নবুওয়াতে বিশ্বাসী। তবে তাদের মতে-সর্বশ্রেষ্ট পথ প্রদর্শক হলেন হযরত ঈসা, কেননা তিনি নিজেই ঈশ্বর।
- হযরত ঈসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সরাসরি কুমারী মাতা মেরী (মরিয়ম) এর গর্ভে জন্ম লাভ করেন।[১৪১]
- তিনি মানুষের মুক্তির জন্য শুলিবিদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গ করেন এবং এ ঘটনার তিনদিন পর স্বর্গে চলে যান।[১৪২]
- পরবর্তীতে শেষ যামানায় তিনি মানুষের মুক্তির কল্যাণের জন্য পুনরায় আবির্ভূত হবেন। তিনিই সকল নবীর ভবিষ্যতবাণীকৃত মসীহ বা পাপ মোচনকারী।[১৪৩]
- খ্রিস্টানগণ ফেরেশতা, শয়তান ও মন্দ আত্মায় বিশ্বাস করে।

---

[১৪১] W Funk Robert, ***The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus***, Harper San Francisco, 1998, p.491

[১৪২] Ibid, p.496

[১৪৩] Ibid, p.503

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মগ্রন্থ

খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো বাইবেল, আল কুরআনে যা ইন্‌জীল নামে অভিহিত। বাইবেলের দু'টি অংশ- ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট। খ্রিস্টানগণ মূলত নিউ টেস্টামেন্টের অনুসারী। গ্রীক ভাষায় লিখিত এই নিউ টেস্টামেন্টের পুস্তক সংখ্যা ২৭টি, যা ৪টি অংশে বিভক্ত। যথা-

ক) গসপেল-নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম চারটি পুস্তক।

খ) নবীদের কাহিনী-১টি পুস্তক।

গ) এপ্রিসেলস-২১টি পুস্তক।

ঘ) ঐশী বাণী বা এপোকেলিপস-১টি পুস্তক।[১৪৪]

গসপেল মোট ৪টি। যীশু খৃষ্টের জন্ম হতে শুরু করে শুলিবিদ্ধ হওয়া বা তিরোধান পর্যন্ত সময়ের বিবরণ, যীশুর ধর্মপ্রচার, অলৌকিক কর্মকান্ড, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিই মূলত গসপেলের বিষয়বস্তু। নিউ-টেস্টামেন্টে এ ৪টি গসপেলকে একত্রে 'সিনোপটিক গসপেল' বলা হয়। আবশ্য পরবর্তীতে এ চারটি গসপেলকে কেন্দ্র করে আরো অসংখ্য গসপেল রচিত হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সব ভাষাতেই বাইবেল পাওয়া যায়। তবে দুঃজনক হলেও সত্য যে, ভাষান্তর কাজে ও স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে বাইবেল রচিত হওয়ায় আজ পর্যন্ত তা অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব হয়নি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- খ্রিস্টানদের উপসনালয়কে বলা হয় গীর্জা বা Church । গ্রীকশব্দ গীর্জা অর্থ প্রভুগৃহ।[১৪৫] গীর্জার মধ্যে প্রাথমিক ও মূল গীর্জা হলো ক্যাথিড্রাল, যার অর্থ চেয়ার। এসব চেয়ারে বিশপগণ অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং ক্যাথিড্রাল হলো ঐ গীর্জা যাতে ন্যূনতম একজন বিশপ বসবাস করেন।
- খ্রিস্টান জগতের প্রধানতম ব্যক্তি হলেন পোপ। তিনি হলেন এ জগতে খ্রিস্টের প্রতিনিধি। এছাড়া বিশপ, কার্ডিনাল, প্রীস্ট, ডিকন, ফাদার প্রমুখগণও খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু হিসাবে স্বীকৃত।
- খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো বড়দিন বা মেরী ক্রিসমাস। যীশু খৃষ্টের জন্মদিন হিসাবে সারা বিশ্বের খ্রিস্টানদের নিকটই এদিন অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ। প্রতিবছর ২৫ শে ডিসেম্বর এ দিন পালিত হয়।

---

[১৪৪] Helmut Koester, ***Introduction to the New Testament,*** Philadelphia, 1982, Vol-II, p.172

[১৪৫] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

- এছাড়াও খ্রিস্টানগণ আরো যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- এডভেন্ট, ইস্টার সানডে, গুড ফ্রাইডে, দি লাস্ট সাপার, দি হলি উইক, ইউকারিস্ট, হোলি কম্যুনিয়ন ইত্যাদি।
- খ্রিস্টানদের পবিত্র চিহ্ন হলো ক্রুশ চিহ্ন। তাঁরা নানা কাজে হাত দ্বারা ক্রুশ চিহ্নের ইঙ্গিত করাও পবিত্র মনে করে। মূলত, তাদের মতে, যীশুর শুলিবিদ্ধ হয়ে মানবতার মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করার ঘটনা হতেই এ চিহ্নের উৎপত্তি।
- সাক্রামেন্ট বা স্রষ্টার অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান খ্রিস্টানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। খ্রিস্টধর্মে ৭টি সাক্রামেন্টের অনুমতি রয়েছে। যথা-১. ব্যাপটিজম বা পানি দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ ২. পবিত্র যোগ ৩. অনুশোচনা বা পাপ স্বীকার ৪. কনফারমেশন ৫. রোগীকে আনুষ্ঠানিক তেল লেপন ৬. বিয়ে এং ৭. হোলি অর্ডারস।[১৪৬]
- খ্রিস্টানগণ নানা দল উপদলে বিভক্ত। এদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খ্রিস্টান দলগুলোর মধ্যে প্রধান দু'টি দল হলো-
    ১. রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ঃ এরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ও পোপের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এরা গোঁড়া খ্রিস্টান হিসাবে পরিচিত।
    ২. অর্থোডকস খ্রিস্টান - এদেরকে গ্রীক অর্থোডক্স বা ইস্টার্ণ অর্থোডক্স ও বলা হয়। এরাও গোঁড়া খ্রিস্টান, তবে তারা পোপকে খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে না। এরা গীর্জায় মূর্তি রাখার বিরোধী হিসাবেও পরিচিত।
    ৩. প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান- এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে ষোড়শ শতকে। বিশেষ করে মার্কিন নেতা মার্টিন লুথার কিং'য়ের আন্দোলনের ফসল খ্রিস্টানদের এই দল। এরা রোমান ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি খুব একটা মেনে চলে না।

এছাড়াও খ্রিস্টানদের দল উপদলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লুথেরান, অ্যানাব্যাপটিস্ট, প্রেসবাইটেরিয়াল, ক্যালভিনিস্ট, এবং লিকানিটুম, মেথডিজম, কুয়েকার, কংগ্রেসনালিষ্ট, ইউনিটারিয়ান ইত্যাদি।

[১৪৬] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআনে খ্রিস্টধর্ম

খোদায়ী ধর্ম হিসাবে আল কুরআন খ্রিস্টান ধর্ম, এর প্রচারক ঈসা (আ), তদীয় মাতা মারইয়াম (আ), তাঁদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিল প্রভৃতি সম্পর্কে নানা তথ্য উপস্থাপন করেছে। বিশেষত হযরত ঈসা (আ) এর জন্ম, তার শুলিবিদ্ধ না হওয়া, তিরোধান, অলৌকিক ঘটনাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আল কুরআনে বিদ্যমান।

হযরত ঈসা (আ) এর বিস্ময়কর জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর মাতা মরিয়মের পবিত্রতা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন- "এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল। অত:পর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন"।[১৪৭]

হযরত ঈসা (আ) এর প্রতি ইন্‌জীল শরীফ নাযিল এবং এর অনুসারীদের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে আল কুরআনের বর্ণনা-

> "মারইয়াম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ তাহাকে ইঞ্জিল দিয়াছিলাম, তাহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো"। ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদানুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক।[১৪৮]

ঈসা (আ) কে শুলিবিদ্ধ করা প্রসঙ্গে খ্রিস্টানদের ভুল ধারণা খন্ডন করে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দেন-

> "আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহকে হত্যা করিয়াছি, তাহাদের এই উক্তির জন্য (তাহার লা'নত গ্রস্থ হইয়াছিল)। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[১৪৯]

---

[১৪৭] আলকুরআন, ২১:৯১। হযরত ঈসা (আ) এর জন্ম বৃত্তান্ত জানতে দ্রষ্টব্য,আলকুরআন ৩:৪৫-৪৭; ১৯:১৬-৩৪

[১৪৮] আলকুরআন, ৫:৪৬; ৫৭:২৭

[১৪৯] আলকুরআন, ৪:১৬৭-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ, ঈসা (আ) এর আল্লাহর পুত্র ও স্বয়ং ঈশ্বর দাবী করা ইত্যাদি ধারণার অপনোদন ও খন্ডন করেও আল কুরআনে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী-

> "যাহারা বলে 'আল্লাহই মারইয়াম তনয় মসীহ' তাহারা তো কুফুরী করিয়াছেই। অথচ মসীহ বলিয়াছিল- 'হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত কর। কেহ আল্লাহর শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই"।
> যাহারা বলে আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো কুফুরী করিয়াছেই-যদিও এক ইলাহ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই; তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফুরী করিয়াছে, তাহাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবে"।[১৫০]

ঈসা (আ) এর আগমন ছিল আল্লাহ কর্তৃক তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে, যা পরবর্তীতে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য দেখা যায় ঈসা (আ) শেষ নবী আগমনের সুসংবাদও প্রচার করেছিলেন। তার বক্তব্য তুলে ধরে আল কুরআনের বাণী-

> "স্মরণ কর মারইয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের নিকট আসিল তখন উহারা বলিতে লাগিল 'ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু"।[১৫১]

বস্তুত আল কুরআনের রর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মূসা (আ) পরবর্তী প্রধান রাসুল ছিলে হযরত ঈসা (আ)। তিনি মানুষকে তাওহীদ ও পূর্ববতী নবীদের দেখানো পথেই ঐশী কিতাব ইঞ্জিলের মাধ্যমে দাওয়াত দেন। এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আগমনের সুসংবাদ ও তাঁকে মান্য করার নির্দেশ দেন। কিন্তু খ্রিস্টানগণ কালক্রমে হযরত ঈসা (আ) এর শিক্ষা হতে দূরে সরে যায় এর নানা কুফুরী ও শিরকী ধ্যান ধারণা, ধর্ম বিশ্বাস স্বীয় ধর্মে স্থাপন করে। আল কুরআনে এসবেরও খন্ডন করা হয়েছে দৃঢ়ভাবে। আর খ্রিস্টানদেরকে তাওহীদ ও পূর্বতন কিতাবসমূহের প্রকৃত শিক্ষার দিকে আহবান করে মুক্তির পথ প্রদর্শন করছে। আল্লাহর বাণী- "বল হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই"।[১৫২]

---

[১৫০] আলকুরআন, ৫:৭২, ৭৩
[১৫১] আলকুরআন, ৬১:০৬
[১৫২] আলকুরআন, ৫:৬৮

Dhaka University Institutional Repository

খ. আসমানী কিতাবহীন অমুসলিম সম্প্রদায়

ইসলামী দৃষ্টিতে দ্বিতীয় প্রকারের অমুসলিম হলো ঐসব অমুসলিম যারা কোনরূপ ঐশী কিতাব লাভ করেনি। বরং খোদা প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণের পরিবর্তে তারা মানব রচিত নৈতিকতা, ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহকেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য নানা বিষয় তাদেরকে ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছে যুগে যুগে। প্রাচীন মানুষের অজ্ঞতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শক্তির মোকাবিলায় অক্ষমতা, ম্যাজিক, জাদু, টোটেম, ট্যাবু, গণক, জ্যোতিষির ভবিষ্যদ্বাণী, অলৌকিকত্ব, ভাগ্য বিশ্বাস, মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ও বীর ব্যক্তিদের স্মরণ ও পূজা-অর্চনা ইত্যাদি বিষয় এসব ধর্ম বিশ্বাসকে করেছে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত। পাশাপাশি মানুষের দূর্দশা লাঘব ও সামগ্রিক মুক্তির লক্ষ্যে ধ্যান-তপস্যা, চিন্তা-ভাবনা প্রসূত মানবকল্যাণমূলক মতবাদও একসময় ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। এসব ধর্মের অনুসারীরাই মূলত ঐ দ্বিতীয় প্রকারের অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। এদের মধ্যে প্রধানতম দুইটি ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম, সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুধর্ম

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। এর অনুসারী সংখ্যা ১০০ কোটির কাছাকাছি।[১৫৩] প্রধানত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলেই এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। ভারত, নেপাল, মরিশাস, গায়ানা, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো, সুরিনাম প্রভৃতি দেশে এ ধর্মের অনুসারীদের দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতীয়দের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হিন্দুদের অবস্থান বিরল নয়।

হিন্দুধর্মের প্রকৃত নাম 'সনাতন ধর্ম'। সনাতন অর্থ শাশ্বত, চিরন্তন ও সর্বজনীন আইন বা মতবাদ। হিন্দু শব্দটি মুলত মুসলিমগণ কর্তৃক প্রদত্ত। ভারতের সিন্ধু নদকে মুসলিমরা বলতেন হিন্দু। এ ধারাবাহিকতায় এ নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতা ও জনপদকে ফার্সী ভাষায় বলা হতো হিন্দু আর তাদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মকে বলা হতো হিন্দু ধর্ম। মূলত এভাবেই সনাতন নামের স্থলে হিন্দু নামের প্রচলন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মের কোনরূপ উৎপত্তি বা প্রবর্তক, প্রচারকের পরিচয় নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। এমনকি এ ধর্মের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ও পরিচয়ও নেই। এটি সুসংবদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্ম নয়। বরং এটি সত:স্ফূর্তভাবে গজিয়ে ওঠা ও মানব সমাজে কালক্রমে বিকশিত একটি স্বভাবজাত ধর্ম। এটি আর্যদের জাতীয় ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষে আগমন করে। অত:পর এখানকার স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে লোকসমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মূলত কোন ঐশী দিক নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে নানা যুগে নানা স্থানে প্রচলিত ব্যখ্যাহীন ধর্মবিশ্বাসের সামাজিক রূপমালাই হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম নামে পরিচিত। কে এম সেন বলেন-

> "Hinduism is more like a tree that has grown graduelly than like a building that has been erected by some great architect at some definite point in time. It contains within itself the influences of many cultures and the body of Hindu thought thus offers as much varity as the Indian nation itself". [১৫৪]

ইংরেজীতে এ ধর্মকে বলা হয় 'Hinduism', আর আরবীতে 'বারহামিয়্যাহ' বা 'হিন্দুকিয়্যাহ'। এ ধর্মের আরো বেশ কিছু নাম পাওয়া যায়। যথা পৌত্তলিক ধর্ম, পৌরাণিক ধর্ম, আর্যধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদ ইত্যাদি। এ ধর্মের অনুসারীদের বলা হয় 'হিন্দু'।[১৫৫] বৈদিক এবং বেদানুমোদিত পৌরাণিক আদর্শ যারা স্বীকার করেন,

---

[১৫৩] B Peter Clarke (ed), ***The Religious of the world: Understanding the living Faiths***, USA: Marshall Editions Ltd. 1993, p.125

[154] K.M. Sen, ***Hindusim***, Delhi: Penginin Books, p.15

[155] হিন্দু ধর্মের পরিচয় ও বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য

- ড. মুস্তাফা হিলমী, ***আল ইসলাম ওয়াল আদইয়ান***, প্রাগুক্ত, পৃ-৭১-১০৩।
- W.Kenneth Morgan (ed), ***The Religion of the Hindus***, Delhi, Motilal Bararasidas, 1987

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রানুমোদিত বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম- সাধনা, উপাসনা বা পূজাদি করেন এবং সনাতন ধর্মের কল্যাণচিন্তাকে জীবনে প্রয়োগ করে জীবনযাপন করেন তাঁরাই হিন্দু। আর তাঁদের ধর্মই হিন্দুধর্ম।[১৫৬]

হিন্দু ধর্মের ধর্মবিশ্বাস, মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যঃ

হিন্দু বা সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদানে আলোচ্য স্থানে এর মূল ধর্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্যাবলী ও মূলনীতির নানা দিক তুলে ধরা হলো-

ক. হিন্দু ধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী ধর্ম। এধর্ম মতে ঈশ্বরই সবকিছুর মূল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি সর্বশক্তিমান।[১৫৭]

খ. বর্তমান কালে অবশ্য হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বাস খুব একটা দেখা যায় না। বরং বর্তমানে হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ত্রিত্ববাদ, বহুশ্বেরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসীরাই আধুনিক কালের হিন্দুদের মূল অংশ হিসাবে গণ্য।

গ. হিন্দু ধর্ম মতে- ধর্ম হলো তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। যথা-বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান। অর্থাৎ কতকগুলো বিশ্বাস, কতকগুলো আচার ও কতকগুলো অনুষ্ঠান-এ তিনটি মিলে মানুষের ধর্ম।[১৫৮]

ঘ. হিন্দুগণ দেবতা ও বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের মতে -দেবতা হলেন ঈশ্বরের শক্তির সাকার রূপ। দেবতাদের মধ্যে প্রধান হলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। তাছাড়া মহাদেব, অগ্নি, ইন্দ্র, উমা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি দেব-দেবী ঈশ্বরেরই নানা শক্তির প্রকাশ মাত্র।

ঙ. অবতারবাদ হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ধর্ম মতে-অবতারগণ হলেন ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। অর্থাৎ ধর্মকে অধর্ম হতে বাঁচাতে ও মানুষের মোক্ষলাভের দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে

- A. Michacls, ***Hindusim: Past and Present***, USA, Princeton Unikersity Poess, 2004
- A.L. Basham, ***A Caltural History of India***, Oxford Univesity Press, 1999.
- David Forenzen, ***Who Invented Hindusim***?, New Delhi, 2006

[১৫৬] ড. পরেশচন্দ্র মন্ডল, ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড*, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৮, পৃ.১

[১৫৭] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, ড. দিলাপকুমার ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন অধিকারী, প্রাগুক্ত, পৃ.০১

[১৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

নানা রূপে মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরাই হলেন অবতার। হিন্দু অবতারদের মধ্যে প্রধান হলেন মনু, বরাহ, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রমুখ।

চ. হিন্দুধর্ম মতে-ঈশ্বর হলেন পরমাত্মা। আর মানবাত্মা হলো অমর ও অবিনশ্বর। এ মানবাত্মার মূল উদ্দেশ্য হলো দৈহিক তথা পার্থিব ভোগ বিলাস থেকে ধর্ম সাধনার মাধ্যমে মোক্ষলাভ করে পরমাত্মার সাথে মিলন।

ছ. জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ হিন্দুধর্মের মূল বিশ্বাসগুলোর অন্যতম। তাদের মতে-কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ তার পার্থিব কর্মের কারণে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ করবে। কর্মফলের কারণে পরবর্তী জন্মে মানুষ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জীবন লাভ করে। আর জন্ম জন্মান্তরের এই চক্রকে বলা হয় সংসার। এভাবে সংসারের নানা জন্মের মাধ্যমে নিজ কর্মকে সুন্দর ও যথার্থ করার চেষ্টা সাধনার মাঝেই মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত।

জ. জন্মান্তরবাদের পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম স্বর্গ-নরকেও বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাসানুযায়ী মানুষ পার্থিব কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ ও নরক, সুখ ও শান্তি ভোগ করবে। তবে এগুলো চিরস্থায়ী নয়। বরং মৃত্যুর পর সুখ ও শান্তি ভোগের মাধ্যমে পাপ-পূণ্যের ক্ষয় হলে মানুষ পুনরায় জন্মান্তরবাদের আওতায় দেহধারণ করে পৃথিবীতে জন্ম নেয়।[১৫৯]

ঝ. হিন্দু ধর্মে বর্ণবাদ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মানুষের কর্মের মাধ্যমে নানা বর্ণে বিভাজন মূলত হিন্দু ধর্মের সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্নবাদ অনুসারে হিন্দুধর্ম চারটি বর্ণে বিভক্ত। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র। অবশ্য আধুনিকালে চন্ডাল বা অস্পৃশ্য নামক আরেকটি বর্ণের অস্তিত্বও দৃষ্টিগোচর হয়। সামাজিক সম্পর্ক, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় কর্তব্য পালনসহ জীবনের নানা প্রয়োজনে, নানা কর্মে এ চারটি বর্ণে লোকদের পৃথক পৃথক অবস্থান হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ঞ. মোক্ষলাভ বা ঈশ্বর প্রাপ্তি হিন্দুধর্মের অনুসারীদের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য ভগবত গীতা নামক গ্রন্থে মোক্ষলাভের জন্য হিন্দুদের তিনটি মার্গ বা পথের কথা বলা হয়েছে। যথা-

- কর্মমার্গ-নিস্কাম কর্মের মাধ্যমে মোক্ষলাভ
- জ্ঞানমার্গ-যোগ ও সাধানার মাধ্যমে মোক্ষলাভ
- ভক্তিমার্গ-ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তির ফলে দেবতাদের তুষ্টি ও মোক্ষ লাভ।[১৬০]

---

[১৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

[১৬০] সোহবার উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। এগুলোকে প্রধানত দু'টিভাগে ভাগ করা হয়। যথা-শ্রুতি বা ঐশী বাণী সম্বলিত গ্রন্থ। যেমন-বেদ; অপরটি হলো- স্মৃতি (মানব রচিত গ্রন্থ, নিজস্ব স্মৃতিতে রক্ষিত নানা বাণী, উপদেশাবলী ও ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ) যথা-রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি।[১৬১]

হিন্দুদের প্রধানতম ধর্ম গ্রন্থ হলো বেদ। তাদের মতে-এটি ঈশ্বর প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থ। এটি গদ্য ও পদ্য উভয় ধারায় রচিত। এর দুটি অংশ। যথা-

ক. মন্ত্র-বেদের বাক্যকে বলা হয় মন্ত্র

খ. ব্রাহ্মণ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিবরণ

বেদের চারটি বিভাগ রয়েছে। যথা-ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অর্থবেদ।[১৬২] প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মে বেদের প্রভাব এত বেশি যে এ ধর্মকে বৈদিক ধর্ম নামেও আখ্যায়িত করা হয়। বেদ ব্যতীত হিন্দু ধর্মে আরো বেশ কিছু ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১.বেদ সংহিতা-এ গ্রন্থে ঈশ্বর, পরমাত্মা, জীবনদর্শন, মোক্ষলাভসহ সকল প্রকার সত্যজ্ঞানের বর্ননা ও বিবরণ রয়েছে।

২. আরণ্যক-ধর্মদর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ।

৩.উপনিষদ- ব্রহ্মজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা, সাধনা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। হিন্দু ধর্মে শতাধিক উপনিষদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১২ খানা হলো প্রাচীন উপনিষদ। প্রধান উপনিষদগুলো হলো-ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য, মূন্ডক, মান্ডুকা ইত্যাদি।[১৬৩]

৪. ভাগবত গীতা-উপনিষদের সারসংক্ষেপ।

৫. ভাগবত পুরান-সৃষ্টি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, আন্দোলন ও উপাখ্যানভিত্তিক ধর্মগ্রন্থ। এর অন্য নাম শ্রীমদ্ ভাগবত।[১৬৪]

৬. ধর্মসূত্র বা সূত্রশাস্ত্র-দান সংক্রান্ত ধর্মগ্রন্থ।[১৬৫]

৭. রামায়ন-অবতার রামের জীবনালেখ্য।

৮. মহাভারত-কৃষ্ণের নানা রূপের ও কর্মকান্ডের সাহিত্যিক বর্ণনা সংক্রান্ত ধর্মগ্রন্থ।

৯. বেদান্ত শাস্ত্র-বেদের টাকা টিপ্পনি ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ।

১০. দেবী মাহাত্ম্য-তন্ত্র ও যোগ সাধনা গ্রন্থ ইত্যাদি।

---

[১৬১] W.K. Morgam, Ibid, p.87

[১৬২] ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল, ড. দিলাপকুমার ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন অধিকারী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫

[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

[১৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

[১৬৫] সোহবার উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নরূপ-

- হিন্দুদের উপাসনালয়ের নাম মন্দির। আর এর পরিচালক হলেন পুরোহিত। অবশ্য হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য মন্দির অবশ্যক নয়। বরং সাধারণভাবে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ বিশেষ উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠানেই কেবল মন্দিরে গমন করেন।
- হিন্দুদের উপাসনার প্রধান অবলম্বন হলো নানা দেবদেবীর প্রতিমা বা মূর্তি। মন্দির সমূহের পাশাপাশি হিন্দুগণ নিজ বাসগৃহেও এসব মূর্তি স্থাপন করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতেই এমন উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব বিদ্যমান।
- সকালে ঘুম হতে উঠেই পূজা-অর্চনা ও প্রতিমাদের প্রণামের মাধ্যমে দিবসের কার্য শুরু করা হিন্দু ধর্মের অন্যতম ধর্মীয় আচার। তাছাড়া সান্ধ্যপূজা, উপবাস, ব্রত পালন, মন্ত্রজপ, গীতাপাঠ ইত্যাদি তাদের উপাসনা ও প্রার্থনার প্রধান প্রধান পদ্ধতি।
- 'ওম' শব্দ ও স্বস্তিকা প্রতীক হিন্দুদের প্রধান পরিচায়ক চিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়া তীর- ধনুক, তিলক চিহ্ন, ত্রিশুল ইত্যাদিও হিন্দুদের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়।
- হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দূর্গাপূজা। অবশ্য স্থানভেদে হিন্দুদের এসব পূজা পার্বণের নানা নাম দেখা যায়। হিন্দু ধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো-
    - দূর্গাপূজা-এর অন্য নাম রামলীলা, দশোহারা, দশাইন ইত্যাদি। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম ১০ দিন মন্দ শক্তি, রাবণের বিপক্ষে হিন্দুদের অবতার রামের বিজয় উপলক্ষে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহা-সপ্তমী, মহা-অষ্টমী, মহানবমী, বিজয়া-দশমী ইত্যাদি এ পূজার প্রধান প্রধান পর্ব।
    - হোলী-বসন্তের আগমন উপলক্ষে কাঠি বা শলাকায় আগুন ধরিয়ে ও নানা রং ছিটানোর মধ্যদিয়ে এ উৎসব পালিত হয়।
    - দেওয়ালী-এটি হিন্দুদের আলোক উৎসব। এর অপর নাম দীপাবলী।
    - জন্মাষ্টমী-শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিন।
    - রাখী বন্ধন-ভাই বোনের সম্পর্ক দৃঢ়করণ উৎসব।
    - কালী পূজা-শক্তির আরাধনা উৎসব।
    - সরস্বতী পূজা-বিদ্যা লাভের জন্য পূজা-অর্চনা।
    - লক্ষ্মীপূজা-ধনসম্পদ লাভ ও রক্ষার নিমিত্তে পূজাপাঠ।
    - গনেশা চতুর্থী-দশ দিনব্যাপী গনেশের জন্মোৎসব।
    - রথযাত্রা-জগন্নাথের রূপে কৃষ্ণের ভ্রমণ স্মরণে উৎসব।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া হনুমান-জয়ন্তী, একাদশী, চৈত্র সংক্রান্তি, মেসা সংক্রান্তি, নাগপঞ্চমী, মনসা পূজা, রামনবমী, শারদ পূর্ণিমা, অমরনাথ যাত্রা, নবরাত্রি, বসন্ত পঞ্চমী ইত্যাদি নানা পূজা পার্বণ হিন্দুধর্মের বিশেষ অলংকার স্বরূপ।[১৬৬]

- তন্ত্রবাদ বা শক্তিবাদ হিন্দু ধর্মের অন্যতম অংশ। এর উদ্ভব হয় পঞ্চম শতকের শেষপদে। তন্ত্রবাদে তন্ত্রের চারটি অংশ (ক) জ্ঞান দর্শন (খ) যোগ-ব্যায়াম (গ) আনুষ্ঠানিকতা (ঘ) ধর্মীয় উপাসনা ও সামাজিক নিয়ম অনুসরণ।[১৬৭]
- হিন্দু ধর্ম নানা যুগে নানাভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় এ ধর্মের অনুসরণে আরো অনেক নতুন নতুন মতবাদ ও ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যথা-বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখ ধর্ম, ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে বহুত্ববাদী ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ায় হিন্দু ধর্মেও নানা শাখা প্রশাখার জন্ম নিয়েছে প্রায় প্রতিযুগেই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-শাক্ত মতবাদ, শৈবধর্ম, সন্ন্যাসবাদ, বৈষ্ণব মতবাদ, পৌরাণিক ধর্ম, তান্ত্রিক মতবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ ইত্যাদি।
- যুগে যুগে হিন্দু ধর্মে সংস্কারকগণের আবির্ভাব ও মানবকল্যাণে তাদের চিন্তাধারার প্রচারও হিন্দুধমর্কে বিশেষায়িত করেছে। তন্মোধ্যে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবানন্দ স্বরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রী চৈতন্যদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্মানিত।

---

[১৬৬] Pratins Bowes, ***The Hindu Religious Tradition & Philosophical Approach***, Delhi, Allied Pab. 1976, p.15

[১৬৭] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্ম

বিশ্বের প্রধান ও জনপ্রিয় ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যতম। বর্তমানে এটি বিশ্বের ষষ্ঠতম বৃহৎ ধর্ম হিসাবে পরিচিত।[১৬৮] এর অনুসারী সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি।[১৬৯] দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

মহামতি গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধ ধর্ম। গবেষকদের মতে-বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্ম হতে উদ্ভুত একটি নবতর ধর্মের রূপ।[১৭০] গৌতম বুদ্ধের জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়া, হিন্দুধর্মের অবতার হিসাবে গৌতম বুদ্ধের স্বীকৃতি এবং পরবর্তীতে এ ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্মের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান হওয়াই মূলত এই ধারণার প্রধান কারণ। তবে ধর্মগত বেশ কিছু সাদৃশ্য সামঞ্জস্য থাকলেও বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বেদ, উপনিষদ এবং বহুশ্বেরবাদ ইত্যাদি ধারণা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করে না। বরং বলা যায় মানুষের বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভের পথই বৌদ্ধ ধর্ম। এডওয়ার্ড কনজ বলেন- "Buddhism as traditionally conceived is a path of salvation attained through might into the ultimate nature of reality".[১৭১] বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর ভারতে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। এর প্রবর্তক ও প্রচারক হলেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর বাণী ও নির্দেশিত পথ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অনুসরণীয় আদর্শ। ইসলামী পরিভাষায় এধর্মকে বলা হয় 'বু'যিয়া'।[১৭২]

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য ও ধর্মবিশ্বাস

- বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম হতে একটি দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ধর্মবিশারদদের মতে- ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম।[১৭৩] এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়নি। অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করার কোন প্রমাণও বৌদ্ধ ধর্মে পাওয়া যায় না। বরং এটি মানবতাবাদী ধর্ম। এতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ও পরম মুক্তির পথসন্ধান দেয়া হয়েছে।

---

[১৬৮] www.adherents.com/buddhism/population
[১৬৯] CIA Factboork, Ibid, 2007
[১৭০] K.N.Tiwari, Ibid, p.43
[১৭১] Edward conze, ***Buddhism, Its Essence andDdevelopment***, London, p.15
[১৭২] বৌদ্ধধর্ম সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে দেখুন-
-ড. মুস্তাফা হিলমী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১-১৩০
-Dr. B.R. Ambedkar, ***The Buddha and His Dhamma***, Nagpur; Buddha Bhoomi Publication, 1997
- Rupert Gethin, ***Foundations of Buddhism***, Oxford University Press. 1988
- Walpola Rahula, ***What the Buddha Taught***, UK, Grove Press, 1974.
- Karen Armstrong, ***Buddha***, USA, Panguin Books, 2001
[১৭৩] K.N. Tiwari, Ibid, p.47

Dhaka University Institutional Repository

- বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক ও শীর্ষ ধর্মনেতা হলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। গৌতম বুদ্ধের বাণী, কর্ম, সাধনা, পথনির্দেশনা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের মুল শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাস। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ সালে গৌতম বুদ্ধ শাক্যরাজা শুদ্ধোধন ও রানী মহামায়ার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৭৪] এ হিসাবে তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। বরং তিনি জ্ঞান লাভের পর হতেই মানুষের দুঃখ, কষ্ট, রোগ-শোক, মৃত্যু-জরা ইত্যাদির স্বরূপ অনুসন্ধান ও সমাধানের জন্য চিন্তিত থাকতেন। এরই প্রেক্ষিতে ২৯ বছর বয়সে গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধগয়া শহরের বোধি বৃক্ষের (অশ্বত্থ গাছ)[১৭৫] নীচে তপস্যারত অবস্থায় আলোকপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বোধ বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। এ থেকেই সিদ্ধার্থ গৌতমের নাম হয় বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। অতঃপর গৌতম তাঁর প্রাপ্ত জ্ঞান ও সাধনা মানবতার মুক্তির জন্য প্রচার করতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুসারী সংখ্যা বাড়তে থাকে। এভাবে শেষ জীবন পর্যন্ত স্বীয় মতবাদ প্রচার করে ৮০ বৎসর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ সালে তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।[১৭৬]
- প্রাথমিক কালে বৌদ্ধধর্ম ছিল পুরোপুরি নৈতিকতা ভিত্তিক ধর্ম। এতে কোনরূপ আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না। পরবর্তীতে মহাযানী বৌদ্ধগণ নানা ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন করেন।[১৭৭]
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রধানতম শিক্ষা হলো তিন আশ্রয় লাভ করা। এ আশ্রয় তিনটি হলো-বুদ্ধের আশ্রয়, ধর্মের আশ্রয় এবং সংঘের আশ্রয়। বৌদ্ধ ধর্মমতে নবদীক্ষার সময় আগন্তুককে এই তিন আশ্রয়ের কথা বলতে হয়-"আমি ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করছি, আমি ধমের্র আশ্রয় গ্রহণ করছি, আমি সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করছি"।[১৭৮]
- বৌদ্ধদেরকে চারটি আর্যসত্য বিশ্বাস করতে হয়, এগুলি হলো-
    - দুঃখ আর্যসত্য অর্থাৎ দুঃখের স্বরূপ ও প্রকৃতি আছে।
    - দুঃখ সমাধি আর্যসত্য অর্থাৎ দুঃখের কারণ রয়েছে।
    - দুঃখ নিবুদ্ধ আর্যসত্য অর্থাৎ দুঃখের অবসানের পথ রয়েছে।
    - দুঃখ নিবুদ্ধ যামিনী প্রতিপাদ আর্যসত্য অর্থাৎ দুঃখ অবসানের পথ হলো নির্বাণ লাভের সাধনা করা।[১৭৯]

---

[১৭৪] সোহবার উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪
[১৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৫
[১৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৪
[১৭৭] Tiwari, Ibid, p.7
[১৭৮] সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩
[১৭৯] Tiwari, Ibid, p.47-48

Dhaka University Institutional Repository

- পঞ্চশীলা: বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের যেসব কাজ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যে সব কাজ কোন অবস্থাতেই করতে পারেন না। আর তা হলো- 'প্রাণী হত্যা, চুরি করা, ব্যভিচার, মদ্যপান করা ও মিথ্যাচার করা।' এ পাঁচটি নিষিদ্ধ কাজকে মেনে চলাকে বলা হয় পঞ্চশীলা। অবশ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে এতদ্ব্যতীত আরো পাঁচটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যথা-
    - নিষিদ্ধ সময়ে খাদ্য ভক্ষণ চলবে না
    - আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ চলবে না
    - মাথায় সুগন্ধি কিংবা তেল ব্যবহার চলবে না
    - কোন বিছানা কিংবা চেয়ার ব্যবহার চলবে না
    - অর্থ গ্রহণ চলবে না।[১৮০]
- অষ্টমার্গ ঃ নির্বাণ তথা দুঃখ হতে মুক্তিলাভের মাধ্যম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম আটটি নীতি মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করে। এগুলো হলো সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।[১৮১] তাদের ধর্ম মতে- "সম্যক অর্থ হলো শুদ্ধ ও ভাল। সুতরাং দৃষ্টি, কথা, ইচ্ছা, কাজ, প্রচেষ্টায়, জীবন পরিচালনা, সচেতনতা ও সাধনার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেই একজন মানুষ নির্বাণ বা মুক্তিলাভ করতে পারে।
- বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে মধ্যপন্থী হতে শেখায়। এ ধর্মমতে জীবন যাপন, কর্ম ও বাক্য সর্বদাই উন্নত নৈতিকতার অনুশীলন করতে হবে। বিধ্বংসী, একগুয়ে কিংবা গোঁড়ামীপূর্ণ আচরণ করা যাবে না। যাবতীয় মন্দ স্বভাব অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
- বৌদ্ধ ধর্মমতে মানুষের প্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ করা। নির্বাণ হলো মানুষের আত্মিক মুক্তি। পার্থিব জগতে কাজের দ্বারা মানুষ এ নির্বাণ লাভ করতে পারে। এজন্য তাঁকে সর্ব প্রকার খারাপ ত্যাগ করে অষ্টমার্গ অনুশীলন করতে হবে। নির্বাণ লাভ করার দ্বারা মানুষ পার্থিব যাবতীয় দুঃখ কষ্ট হতেও মুক্তি লাভ করে।
- পূনর্জন্মবাদ: বৌদ্ধ ধর্ম মতে- "মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে। পূর্বজন্মের ভাল পূণ্য কাজের অনুপাত হিসাবে পরজন্মে তার অবস্থা নির্ধারিত হবে। অবশ্য নির্বাণ লাভ করলে মানুষের পূর্ণজন্ম হয় না। বরং এসময় সে পরমাত্মার সাথে মিলে যায়।
- বৌদ্ধ ধর্মের আরো উল্লেখযোগ্য কটি মূলনীতি হলো-
    - মানুষ ও প্রাণীকূলের কল্যাণ কামনা।
    - অহিংসা পরম ধর্ম।
    - প্রাণীহত্যা মহাপাপ।

---

[১৮০] সোহবার উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩
[১৮১] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মগ্রন্থ

বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। এটি পালি ভাষায় লিখিত। নির্বাণ লাভের জন্য সকল প্রকার তত্ত্ব ও সাধনার বিস্তারিত বিবরণ এতে পাওয়া যায়। ত্রিপিটক মুলত তিনটি পুস্তকের সামষ্টিক নাম। এ তিনটি পুস্তক হলো-

ক) বিনয় পিটক-এতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী ও অনুসারীদের জন্য নানা নীতি, এর প্রয়োগ, এবং যথার্থতা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

খ) সুপ্ত পিটক-গৌতম বুদ্ধের প্রদত্ত বক্তৃতা, ভাষণ ও ধর্মোপদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গ) অভিধম্ম পিটক-এতে গৌতম বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষার ব্যাপক ও অর্থবোধক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অন্যান্য তথ্য

- বৌদ্ধ ধর্মের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হলো বিহার বা সংঘ। এতে বৌদ্ধ সমাজের শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মালোচনাসহ নানা জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের উপসনালয়কে বলা হয় 'প্যাগোডা' বা মঠ।
- বৌদ্ধগণ প্রতি মাসেই নানা উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন-নবচন্দ্রের উদয়, পূর্ণিমা, অষ্টমীর দিন উপবাস ব্রত পালন ইত্যাদি। ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা বা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। এ দিন বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসাবে গণ্য। এছাড়া বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের দিন, মৃত্যু দিন, মাঘী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা ইত্যাদি উৎসবও পালন করা হয়।
- বৌদ্ধগণ আচার-পালন ও পূজা-অর্চনার মাধ্যমে নিজ ধর্ম পালন করে থাকে। গৌতম বুদ্ধের মূর্তিতে মাল্যদান, মূর্তির প্রতি সম্মান দেখানো, পূজা করা, ভিক্ষুদের দান-উপহার প্রদান করা ইত্যাদি মূলত তাদের আচার হিসাবে পরিচিত। তাছাড়া ত্রিপিটক পাঠ, ধর্মালোচনা, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী আলোচনা ইত্যাদিও ধর্মকর্ম হিসাবে অনুশীলন করা হয়।
- অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও বেশ কিছু দল উপদল দেখা যায়। আচার অনুষ্ঠানগত পার্থক্য ও বিশ্বাসগত কারণে বৌদ্ধগণ যে সব সম্প্রদায়ে বিভক্ত তন্মধ্যে প্রধান হলো হীনযান ও সহজযান সম্প্রদায়। তাদের পরবর্তীতে আরো বেশ কিছু ছোটবড় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। যেমন-সর্বস্থিবাদ, যোগাচার, সৌত্রন্টিকা, বিনয়, সত্য, লোকেত্তরবাদ, মধ্যমিকা, সুখ্যবতী, নিচিরেন, তন্ত্রবাদ, কাদামপা, গ্যাসকোপা ইত্যাদি।[১৮২]

[১৮২] সোহবার উদ্দন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ধর্ম

প্রকৃতপক্ষে অমুসলিম সম্প্রদায় উপর্যুক্ত চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ দ্বারা আরো অনেক ধর্মাবলম্বীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন-শিখ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিন্টোধর্ম, আজীবিক ধর্ম, তাওবাদ, কনফুসিয়ান ধর্ম, জরথ্রুস্টবাদ, আদি বিশ্বাস (এনিমিজম), বাহাই ধর্ম, অজ্ঞেয়বাদ, কৌম ধর্ম, উপজাতীয় ধর্ম ইত্যাদির অনুসারীবৃন্দ। তবে তন্মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরাই জনসংখ্যা ও সমাজে প্রভাব বিস্তারের বিচারে অগ্রগণ্য। এজন্য আলোচ্য অধ্যায়ে শুধু এদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদত্ত হলো। অবশ্য অনেক গবেষক এ দু'টি ধর্মকেও ঐশী তথা খোদা প্রদত্ত ধর্ম হিসাবে নানা যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। কিন্তু বাস্তবতা বিচারে এসব যুক্তি-প্রমাণ কোনটাই অকাট্য নয়। তার চাইতেও বড় কথা আল কুরআনে কিংবা ইসলামের কোন জায়গাতেই এ সম্পর্কিত কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সম্পর্কেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে নিশ্চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ধর্ম ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলাম পূর্ব বাংলাদেশের ধর্মসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান অমুসলিমদের ঐতিহ্য ও সামাজিক লোকাচার ও অনুষ্ঠান সমূহের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রথমত প্রচলিত এসব ধর্মের ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক। তদুপরি এদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশের ফলে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিমদের সে সম্পর্ক ও যোগসূত্র গড়ে ওঠে তারও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ জরুরী। এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম ও জীবনধারার কালক্রমিক পরিবর্তন এবং সর্বশেষ ধর্ম হিসাবে ইসলামের আগমন ও সমাজ জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব বাংলার হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে থাকে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আর্যপূর্ব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের কোনরূপ সুসংগঠিত রূপ ছিল না। বরং প্রাচীন বাংলার লোকজন নানা কৌমে ভাগ হয়ে বসবাস করত।[১] এসব কৌমের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস ছিল। আর এসব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত তাদের ধর্মানুষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোন স্বীকৃত রূপ ছিল না। বরং সমাজ বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী ধর্মপুর্ব সমাজের- ম্যাজিক, টোটেম, ট্যাবু ইত্যাদিই ছিল প্রাচীন বাংলার ধর্মের শাশ্বত রূপ। সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে কিংবা প্রকৃতির রোষানল হতে বাঁচার জন্য এর তোষামোদ, পূজা-অর্চনা করা, জীববলি দান, শক্তি ও তন্ত্র সাধনা ইত্যাদিই ছিল প্রাচীন বাংলার কৌমসমূহের ধর্ম ও বিশ্বাস। কৃষি প্রধান এ সমাজের ফল-ফসল বৃদ্ধির জন্য ধর্মানুষ্ঠান, বৃষ্টিপাতের জন্য পূজা-অর্চনা কিংবা ফসল উঠানোর কৃতজ্ঞতা উৎসব তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হত। অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চার হাজার বছর পূর্বের এ আর্যপূর্ব যুগ প্রাচীন বাংলার উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করে থাকে।[২] পরবর্তীতে আর্যদের আগমন এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৭৫০ সনে উড়াল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত কিরঘিজ অঞ্চল হতে আর্যদের কয়েকটি গোত্র ইরানে প্রবেশ করে।[৩] অত:এর কালক্রমে আর্যগণ সিন্ধু, পাঞ্জাব হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাতেও আর্যদের আগমন ঘটে এবং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় আর্য প্রভাব বিস্তার লাভ করে।[৪]

---

১. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৪

২. A. K. Sur, ***Prehistory and Beginnings of Civilization in Bengal***, Calcatta, 1969, p. 69

৩. এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৬, পৃ.৫

৪. ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ.৯২

Dhaka University Institutional Repository

আর্যদের আগমনে প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাদের মাধ্যমেই প্রাচীন বাংলার জনগণ সর্বপ্রথম ধর্মের সুসংগঠিত রূপ প্রত্যক্ষ করে। আর্যসমাজ ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। নানা প্রকার কল্পিত দেবদেবী ও প্রকৃতির পূজা ছিল আর্যদের ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। তাদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। আর্যগণ বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে ভারতে আগমন করে। ড. সুকুমার সেনের মতে "ভারতবর্ষে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি সম্ভবত দুই বা ততোধিক ধারায় আসিয়াছিল। প্রথমে যাহা আসিয়াছিল তাহাকে বলিতে পারি প্রাচীন বা প্রাক-বৈদিক ধারা। পরে যাহা আসিয়াছিল তাহা অর্বাচীন বা বৈদিক ধারা"।[৫] বাংলাদেশে আগত আর্যগণ ছিলেন মূলত পরবর্তী তথা বৈদিক ধারার। তাদের প্রচারিত ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল তৎকালীন বাংলার প্রধানতম ধর্মবিশ্বাস। প্রচলিত বিভিন্ন কৌমের অসংগঠিত ধর্মবিশ্বাসকে আর্যদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, সেসময়কার কৌম ধর্মগুলি ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য ধর্মানুষ্ঠান কিংবা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর্যপূর্ব যুগের বহু লোকাচার আর্যসমাজেও স্থায়ী আসন লাভ করে।

আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্যাপকতা লাভ করে মূলত গুপ্ত শাসনামলে। গুপ্ত রাজাগণ আর্যদেরকে ভূমিদান করে এদেশে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেন।[৬] তাদের স্থায়ী বসতির ফলে এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা, ইত্যাদির প্রচলন ঘটল বাঙালী সমাজে। ধর্ম চর্চার সাথে এসময় বেদ-বেদান্ত ও সংস্কৃতি চর্চাও শুরু হলো। আর্যদের এ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব এত বেশি ছিল যে বাংলাদেশে নানা ধর্মের উত্থান ও আগমনেও এটি কখনই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যদিও নানা কারণে ধর্মচর্চা কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদ স্তিমিত হলেও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তা আবার স্বরূপে উজ্জীবিত হয়েছে যুগে যুগ।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে রাজা শশাঙ্কের শাসনামলে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৬০১ সনে গৌড়ের রাজা হন শশাঙ্ক।[৭] তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসারের চেষ্টা চালান। এসময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চালান বলেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় বিস্তৃত হয় গৌড় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে সেন বংশের শাসনামলে। সেন রাজাগণ ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী। খ্রিস্টীয় ১০৯৮ সন হতে ১১৬০ সন পর্যন্ত রাঢ়ের রাজা ছিলেন বিজয় সেন।[৮] তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কুলীন প্রথা ইত্যাদির প্রচলন করেন। তার সময়ে ব্রাহ্মণগণ ব্যাপক রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেন রাজবংশই ছিল বাংলার শেষ হিন্দু রাজ বংশ। পরবর্তীতে মুসলিমগণ এদেশে প্রভাব বিস্তার করেন এবং বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় বিশ্বাসে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকতর হতে থাকে।

---

৫. ড. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (১ম খন্ড) কলিকাতা. ১৯৯৩, পৃ.৯

৬. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, *রাজা আদিশূর ও সামলবর্মা কর্তৃক বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নঃ একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট*, গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৮-৯৯, পৃ.৭১

৭. এ. কে.এম নাজির আহমদ,প্রাগুক্ত, পৃ.১২

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্মঃ

আর্যযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ ব্যতীত অপর যে ধর্মটি সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। মগধের রাজা বিম্বিসার এর শাসনামলে (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ সন হতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯৩ সন) মহামতি সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার শুরু করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত এ ধর্মমত অতি অল্প কালেই বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক মতানুযায়ী মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালের (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ হতে ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) পূর্বেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[৯] বিশেষ করে পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বর্ণনায় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধির বর্ণনা পাওয়া যায়।[১০]

মৌর্যবংশীয় শাসকগণ যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়া সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন তথাপিও দেখা যায় যে মহামতি অশোক নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁকে বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও শান্তির বাণী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।[১১] মৌর্য পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। তাদের সময় ব্রাহ্মণগণ ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু এসময়ও বৌদ্ধ ধর্ম সমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের গুপ্ত রাজাগণও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ছিল পাল রাজাদের শাসনামল। এসময় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। পাল রাজাগণ সকলেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং রাজবংশীয়ভাবে এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মূলত পাল রাজাগণই ছিলেন তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল। এ প্রসঙ্গে ও ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখেন-

> "পালযুগে বাঙালী শুধু বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বৌদ্ধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভও করিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বৌদ্ধ বিহার এবং বাঙ্গালী প্রণীত গ্রন্থরাজি তদানীন্তন বাংলার ধর্মজীবনে যুগান্তর সৃষ্টির অক্ষয় সাথী। ধর্মজীবনে এই প্রদেশব্যাপী আলোড়নের ফলে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম বন্যার জলের ন্যায়ই দেশের আনাচে কানাচে প্রবেশ লাভ করিল।"[১২]

---

৯. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬

১০. RC Majumdar, ***History of Ancient Bengla***, Calcutta, 1974, p.530

১১. এ, কে, এম নাজির আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১২. ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর অবদান*, কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল বেশ সমৃদ্ধ। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয় বরং এ ধর্মটি বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাবক হিসাবে কাজ করছিল। বাংলায় আগত পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তদানীন্তন বৌদ্ধ শাসিত বাংলার উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিবরণ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন।[১৩] পরবর্তীকালের পরিব্রাজক ইউয়ান চুয়াং, শেং-চি, উৎ-সিং প্রমুখের বর্ণনায় বৌদ্ধ ধর্মের নানা বিবরণ ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। ইউয়ান চুয়াং তৎকালীন বাংলার চারটি আঞ্চলিক রাজ্যে- মধ্য-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বিস্তীর্ণ ফসলভরা গ্রামাঞ্চল, জনবসতিপূর্ণ নগরী ও বৌদ্ধ বিহার প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি প্রতিটি রাজ্যেই অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিটি বিহারে এক বা দুইশত ভিক্ষু অবস্থান করতেন বলেও মন্তব্য করেন।[১৪] ঐতিহাসিক ব্যারি মরিসন বাংলার ভূমি সংক্রান্ত লিপিমালা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে- ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম মেঘনার পূর্বাঞ্চলে সমৃদ্ধ ছিল এবং এ ধর্ম এ অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।[১৫]

বাংলার পাল সম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম তার সোনালীযুগ অতিক্রম করলেও ভারতের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্মের তখন পতনের যুগ শুরু হয়ে গেছে। ক্রমে বাংলাতেও এর ছোঁয়া এসে লাগে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি বা পতনের জন্য দায়ী প্রাচীন বাংলার অন্যান্য ধর্ম। বিশেষ করে হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল প্রতাপ ও প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হতে থাকে। এসময় তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির অনুরূপ মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা ধরনের মতবাদ সাধন ভজন পদ্ধতি গড়ে ওঠে।[১৬] প্রাচীন বাংলার বিশ্বাস ও আচারের নিকট বৌদ্ধধর্ম এতটাই আত্মসমর্পণ করে যে ব্রাহ্মণ্যবাদের মত বৌদ্ধধর্মেও দেবদেবীর পূজা-অর্চনা শুরু হয়ে যায়। যা তৎকালীন লৌকিক হিন্দু ধর্ম হতে খুব একটা ভিন্নতর ছিল না। মূলত এভাবেই স্বকীয়তা হারিয়ে বৌদ্ধধর্ম ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের শাখা হিসেবেই পরিবর্তিত হয় যা পরবর্তীতে এর বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। প্রখ্যাত গবেষক ট্রেভর লিং বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পতনের জন্য এ রূপান্তরকেই দায়ী করেন। তার মতে- বৌদ্ধদের এ অবনতির জন্য ইসলাম দায়ী নয় বরং তাঁর নিকটতর ব্রাহ্মণ্যবাদ ও প্রাচীন বাংলার ধর্মগুলোর ব্যাপক প্রভাবই ছিল প্রধানতম কারণ।[১৭]

---

১৩. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

১৪. J. Legge (ed), ***A Record of Buddhist Kingdoms by Fa-hiem***, Oxford, 1886, p.100

১৫. S. Beal, ***Buddhist Record of the Western World II***, London 1884, p.194-202

১৬. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮

১৭. Trevor Ling, ***Buddhist Bengal and After***, D. Chattopadhayaya (ed) History and Society, Calcutta 1978, p. 320-323

Dhaka University Institutional Repository

জৈন ধর্ম:

আর্যদের অপর ধর্মমত জৈন ধর্মও একসময় বাংলার রাঢ় অঞ্চলে তৎপরতা লাভ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন তীর্থকর মহাবীর যখন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাঢ় দেশে এসেছিলেন তখন সেসময়কার লোকেরা তাঁর উপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল বলে জৈন-পুথিতে উল্লেখ রয়েছে।[১৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও জৈনধর্ম বাংলায় বেশ প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে সম্রাট অশোকের সময় পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলে নির্গ্রন্থ জৈনদের বসবাসের প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকে উত্তর-বাংলাতে জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসারের বর্ণনাও বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত। সর্বোপরি এদেশে জৈন ধর্মের প্রসারের প্রধানতম দলীল সম্ভবত জৈন গোদাসগনীয় ভিক্ষুদের চারটি শাখার নামকরণ হতে গ্রহণ করা যায়। জৈনকল্পসূত্রে এ চারটি শাখার নাম তাম্রলিত্তিয়, কোটিবর্ষীয়া, পোণ্ডবর্ধনীয়া ও খব্বডীয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] লক্ষণীয় যে এ নামগুলো প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্তি, কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুন্ড্রবর্ধন (বগুড়া) ইত্যাদি অঞ্চলের নাম হতেই গৃহীত। স্বভাবতই এটি প্রাচীন বাংলায় জৈন ধর্মের প্রচলন ও প্রসারের অন্যতম প্রমাণস্বরূপ।

গুপ্ত শাসনামলে জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রসারতার কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বর্তমান গোয়াল ভিটা (প্রাচীন বা গোহালী) নামক স্থানে আবিস্কৃত জৈন বিহারের ধ্বংস বিশেষ গুপ্ত যুগেরই নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়। সুন্দরবন, দিনাজপুর, বাকুঁড়া ইত্যাদি স্থানে আবিস্কৃত জৈনমূর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাল আমলের জৈন ধর্মের প্রচলনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। চালুক্যরাজ বীরবলের মন্ত্রী বস্তুপালের জৈনতীর্থ দর্শনের ইতিবৃত্ত হতে ত্রয়োদশ শতকেও বাংলায় নির্গ্রন্থ জৈনদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এর পরবর্তী সময় হতে জৈনদের উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বস্তুত পাল আমল হতেই জৈনদের পতন শুরু হয় এবং কালক্রমে একসময় বাংলায় এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বৈষ্ণব মতবাদ:

হিন্দু, বৌদ্ধদের পাশাপাশি বাংলায় বৈষ্ণব মতবাদেরও জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে পঞ্চম শতাব্দীকাল হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ মতবাদ বাংলার ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন এ মতবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিল। সে সময়কার ভূমি সংক্রান্ত লিপিমালা বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত গবেষক ব্যারি মরিসন প্রমাণ করেছেন যে- "সে যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ ছিল বৈষ্ণব মতবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা বৌদ্ধধর্ম নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, উত্তর, মধ্য ও পূর্ববঙ্গে সে সময় নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে ভূমিদান সংক্রান্ত যে সব লিপিমালা জারী হয়েছিল তন্মধ্যে ৭২টি লিপির ৭০টিই ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য। বাকী দু'টি ছিল শৈব প্রতিষ্ঠানের"।[২০]

---

১৮. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪-১৬৫
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭
২০. Barrie M. Morison, ***Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal***, Tucson 1970, p.154, লিপি বিশ্লেষণ ৮৪ পৃ থেকে ও সারণী ৬-১২

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বৈষ্ণব মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদেরই অংশবিশেষ। যদিও কিছুকালের জন্য এটি আলাদাভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও বলা যায় যে প্রাচীন বাংলার অন্য ধর্মগুলোর প্রভাবে এটি বেশিদিন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। বিশেষত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর ফলে এর প্রচার ও প্রসার রুদ্ধ হয়ে ক্রমে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্যান্য ধর্মঃ

প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধধর্ম, কিংবা জৈন ও বৈষ্ণব মতবাদ ছাড়াও আরো বেশ কিছু স্বতন্ত্র ধর্ম ও মতবাদের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে এসব মতবাদ কোনটিই আর্যপূর্ব কৌম ধর্ম ও আর্যধর্মের লোকাচার, বিশ্বাস ইত্যাদির ভিতকে নাড়াতে পারেনি। বরঞ্চ সামান্য পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পৃথক ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিছু কিছু ধর্ম আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ এর বিশেষ ব্যাখ্যা হিসাবে মূল আর্যভিত্তিকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ছোট ছোট এসব ধর্ম ও মতবাদ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আজীবিক ধর্ম, শৈবধর্ম, নাথ ধর্ম, পৌরাণিক ধর্ম, গণেশ্বর মতবাদ, সহজিয়া মতবাদ ইত্যাদি।

জৈনপূর্ব কিংবা সমসাময়িক ধর্ম হিসাবে আজীবিক মতবাদ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রচারক ছিলেন দাসবিদ্রোহের অন্যতম নেতা মখলিপুত্র গোসাল। তিনি গৌতম বুদ্ধের গুরু ছিলেন বলেও জানা যায়। বাংলার পাঠালিপুত্র, রাঢ় ইত্যাদি অঞ্চলে এদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। বিশেষ করে মহাবীর যখন রাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন তখন তিনি বড় বড় লাঠিধারী আজীবিক ধর্মপ্রচারকদের দেখা পেয়েছিলেন।[২১] পরবর্তীতে আজীবিকগণ নিগ্রন্থ জৈনদের সাথে মিশে যায়। আর্যপূর্ব কৌম সমাজের ধ্যান ধারণা ও ধর্ম বিশ্বাসের সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্য নিয়ে শৈবমিত্র বাংলায় একসময় প্রচলিত ছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ও শশাঙ্কের মাধ্যমে এ ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিল।

সহজিয়া মতবাদ ছিল বাংলায় তুলনামূলক নবীন মতবাদ। মূলত এটি ছিল প্রাচীন ধর্মগুলির প্রতিক্রিয়া হতে সৃষ্ট ধর্ম। বিশেষ করে সেন শাসনামলে হিন্দু ধর্মের প্রভাব সমাজে নানা বর্ণভেদ ও বৈষম্যের প্রতিবাদেই এ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। রমেশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্ট ভাবেই হিন্দু শাসনের শেষভাগে এ মতবাদের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।[২২] এ সম্প্রদায় ছিল মূলত অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্ম সাধনায় বিশ্বাসী। তারা তুচ্ছ জাত বিচারের উর্ধ্বে উঠে মানুষের অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা বলতেন।

---

[২১] অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫

[২২] ট্রেভর লিং, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২০-৩২৩

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এটি নতুন কোন মতবাদ ছিল না। বরং পূর্বতন ধর্মের মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে ছিল। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে, প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে, নাথ ও বাউল সাহিত্যে এ মতবাদ বিবৃত ছিল। তবে এ মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ না করার পেছনে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে- সহজিয়া মতবাদ ব্যক্তি জীবনকে যেরূপ প্রভাবিত করেছিল, সমাজ ও রাজনীতিকে সেরূপ প্রভাবিত করতে পারেনি। এজন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভবে এটি ব্যক্তি পর্যায়েই রয়ে যায়। বর্তমান কালেও এ ধরনের মতবাদের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। তবে পূর্বকালের ন্যায় আজো এটি ব্যক্তি দর্শন হিসেবেই পরিচিত; ব্যাপক প্রচার পায়নি কখনোই।

ইসলামপূর্ব ধর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য:

বাংলায় ইসলামপূর্ব যে সব ধর্ম প্রচলিত ছিল তা মূলত ছিল দু'ধরনের। আর্যপূর্ব কৌম ধর্ম ও আর্যধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে আর্যধর্মগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেও বাংলায় এটি তাদের মূল রূপ ধরে রাখতে পারেনি। বরঞ্চ কৌম ধর্মগুলোর প্রভাবে এগুলো ব্যাপকভাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় কৌমধর্মগুলোর আচার-অনুষ্ঠান আর্যধর্মে নব্যদীক্ষিত লোকজন ছাড়তে পারেনি বরং দুধরনের ধর্মকে একীভূত করে বাংলার এক ভিন্ন ধরনের ধর্মবিশ্বাস চালু করে। আর্যধর্মের উপর কৌমধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাবে ইসলামপূর্ব বাংলার ধর্মগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল নিমরূপ -

১. মাতৃতান্ত্রিকতা:

বাংলার আর্যপূর্ব কৌমগুলো ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আর্যধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদে এ মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব ছিল ব্যাপক। এজন্যই দেখা যায় যে আর্য ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের শান্তির মূল নিয়ামক একজন দেবীরূপী নারী। দেব সাধনার তুলনায় আর্যধর্মে দেবীদের সাধনাই প্রধান হয়ে ওঠে। দেবীরূপে দূর্গা, কালী, লক্ষ্মী, স্বরসতী প্রমুখ মূলত কৌম সম্প্রদায়গুলোর মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রভাব বলে মনে করা যায়। হিন্দুদের নানা দেবী সম্পর্কে অজয় রায় মন্তব্য করেন-

> "অনুমান করা হয় জাতিতে এরা ছিলেন বিভিন্ন কৌমের আরাধ্য দেবী। কালক্রমে বিভিন্ন কৌমের মেলামেশার ভিতর দিয়ে এসব দেবীদেরও সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে। যা ছিল এককালে প্রাচীন বিশ্বাস ক্রমে তা-ই ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিভিন্ন কৌমের আরাধ্য দেবীরা ক্রমে দুর্গা কালী, চন্ডী প্রভৃতি রূপের সাথে মিশে গেছেন"।[২৩]

---

[২৩] অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

২. ধর্মানুষ্ঠানঃ

কৌম সমাজের ধর্মানুষ্ঠান আর্য প্রধান ধর্মকে প্রভাবিত করেছে নানা ভাবে। দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করা, অদৃশ্য শক্তির আরাধনা, বিশেষ গাছ-পাথরকে সিদুঁর, কলাপাতা ইত্যাদি দিয়ে পূজা-অর্চনা করা, গ্রাম দেবতা, বনদেবতা ইত্যাদি পৃথক পৃথক দেবতার উপাসনা মূলত কৌমদেরই ধর্মানুষ্ঠান। পরবর্তীতে যা হিন্দু ধর্মের মূল আচার অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হয়ে যায়। পরবর্তীতে বৈদিক ব্রাহ্মণরা পাথর পূজা ও কিংবা গ্রাম দেবতা ইত্যাদির পূজা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৌম ধর্মানুষ্ঠানগুলির প্রভাব ব্রাহ্মণদের এরূপ বিধান কার্যকর করতে দেয়নি কোনদিন।

৩. কৃষিপ্রধান অনুষ্ঠানঃ

বাংলার প্রাচীন কৌমগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। কৃষিই ছিল তাদের জীবন ও জীবিকা। তাদের দৈনন্দিন চলাফেরা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি সবই ছিল কৃষিভিত্তিক। এজন্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মানুষ্ঠানেও ছিল কৃষি প্রাধান্য। কৃষির সফলতায় পূজা পার্বন করা কিংবা ধর্মানুষ্ঠানে কৃষি উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি ছিল কৌম সম্প্রদায়েরই প্রচলন।

পরবর্তীতে হিন্দু সমাজেও এসবের প্রচলন ব্যাপকতা পায়। পূজা-অর্চনা ও সামাজিক লোকাচার ধান, দূর্বা, ধানগুচ্ছ, কলাগাছ, হলুদ, পান-সুপারী ইত্যাদির ব্যবহার প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিরই নিদর্শন। তাছাড়া নবান্ন উৎসব, বীজ ছড়াবার অনুষ্ঠান, শালিক ধান বুনবার অনুষ্ঠান, প্রথম ফলনকে কেন্দ্র করে উৎসব, পিঠা-পুলী উৎসব ইতাদি ছিল বাঙালীর কালক্রমিক রূপান্তরিত ধর্মানুষ্ঠান। বর্তমানেও এগুলো সমাজ ও সংস্কৃতিরই পরিচায়ক।

৪. ধর্মবিশ্বাসঃ

কৌম সম্প্রদায়গুলোর ধর্মবিশ্বাস আর্যধর্মগুলোতে প্রভাব পেয়েছিলো ভালভাবেই। কৌমসমাজের আদিমতম ভয়, আশা, বিশ্বাস ইতাদিকে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করতে পারেনি কোনদিন। যাদুবিশ্বাস, টোটেম, ট্যাবু ইতাদির প্রচলন আজো লক্ষণীয়। হিন্দুদের চড়ক পূজার অনুষ্ঠান আমাদেরকে আদিম সমাজের যাদুবিদ্যা অনুষ্ঠানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া কৌমসমাজের টোটেমও বর্তমানে লক্ষ্যণীয়। কৌমসমাজে নানা পশুপাখি ছিল টোটেম স্বরূপ। এগুলির মূর্তি কিংবা ছবি তারা পূজা করত। পরবর্তীতে বৈদিক আর্যধর্মেও এর সাদৃশ্য বিস্ময়কর হলেও সত্য। পৌরাণিক কাহিনীতে নানা পশুপাখীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- স্বরস্বতীর বাহন হাস, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, দুর্গার বাহন সিংহ, বিষ্ণুর বাহন গরুড় ইত্যাদি। তাছাড়া গনেশ, মনসা ইত্যাদির পূজাও টোটেম এরই আধুনিক ও পরিবর্তিত সংস্করণ হিসাবে আজো টিকে আছে সারা বাংলায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কুসংস্কার ও পৌরাণিকতা:

প্রাচীন কালের ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম দিক ছিল কল্পনা প্রবণতা ও কুসংস্কার। বস্তুত জ্ঞানের অভাব ও প্রকৃতির সামনে অসহায়তার কারণে মানুষ বাধ্য হয়েই নানা কল্পকাহিনী, পৌরাণিক রূপকথা তৈরি করত; আশ্রয় নিত নানা কুসংস্কারে। বাংলার প্রাচীন কৌমগুলিতে এগুলি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পরবর্তীতে মানুষ এসব কল্পনা প্রবণতা ও কুসংস্কার হতে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং যখনই কোন সমস্যার যৌক্তিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে জন্ম নিয়েছে নানা কল্পনা ও কুসংস্কার। এমনকি মুসলিম শাসনের অব্যহিত পূর্বেও বাংলায় পৌরণিক মতবাদের উত্থান এসবেরই সাক্ষ্য বহন করে। কৌম সম্প্রদায়ের মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা আজো খাসিয়াদের মাঝে বর্তমান।[২৪] মৃত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধ, মৃতদের খাবার দেয়া, আত্মার শক্তিশালী হয়ে ওঠা, গ্রামদেবতার কাছে মানত করা, পশু বলি এমনকি নরবলি দেয়া ইত্যাদি কুসংস্কার বাংলার প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল।

৬. তন্ত্রসাধনা ও আধ্যাত্মিকতা:

প্রাচীন যুগের ধর্মগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তন্ত্রসাধনা ও আধ্যাত্মিকতা। এগুলি ছিল ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী আচার অনুষ্ঠান। যাদু-মন্ত্র, ঝাঁড়ফুঁক, বান মারা ইত্যাদির মাধ্যমে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে প্রার্থনা ছিল তৎকালীন ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বস্তুত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি দুর্বলতা ও অজ্ঞানতা হেতু এ বিষয়গুলো সমাজে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কৌম সমাজের এসব তন্ত্রসাধনাই পরবর্তীতে আর্যধর্মের ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে গৃহীত হয়। অজয় রায় লিখেছেন- "ভাল ফসল, জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি কামনায় সে কালের মানুষ যে অনুষ্ঠানসমূহ পালন করতো কালে আদি তাৎপর্য হারিয়ে পরবর্তীকালের ধর্মচেতনার প্রলেপে রঞ্জিত হয়ে তা-ই তান্ত্রিক সাধন-ভজন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে"।[২৫]

তন্ত্র ও শক্তি সাধনার পাশাপাশি আধাত্মিকতাও ছিল ইসলামপূর্ব ধর্মগুলোর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। ধ্যান-জ্ঞান, সাধনা, সন্ন্যাসব্রত পালন, গৃহত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক পরির্চচার দৃষ্টান্ত ঐসব ধর্মে ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে সেন শাসনামলের হিন্দু জাতিভেদ প্রথার ব্যাপক উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় বাংলায় মিস্টিসিজম বা মরমীবাদের জন্ম হয়েছিল।[২৬] সাধন-ভজনের এ ধারা অবশ্য নানারূপে বাংলার সমাজে ঠাঁই পেয়েছিল। গৃহত্যাগ করে গুহাবাসী হয়ে ধ্যান করা কিংবা আশ্রয়স্থলে সামাজিকভাবে সাধনা করা বা বাউল গান, দেহতাত্ত্বিকগণের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনা করার নজীর ছিল লক্ষণীয়। অনেক গবেষক অবশ্য মনে করেন যে এসব আধ্যাত্মিক সাধনার উপাদানসমূহ তন্ত্রসাধনারই অন্যরূপ। অর্থাৎ তন্ত্রসাধনার কঠোর ও ভয়াবহ পদ্ধতির বিপরীতে কোমলধর্মী ও আর্য নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলেই জন্ম নেয় অধ্যাত্মবাদ।

---

[২৪]. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১
[২৫]. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯
[২৬]. ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৭. বর্ণবাদঃ

বাংলায় ইসলামপূর্ব আর্য ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা সনাতন ধর্মের প্রধানতম সামাজিক সংগঠন ছিল বর্ণবাদ বা বর্ণাশ্রম প্রথা। সমাজের মানুষদেরকে একই ধর্মের মধ্যে রেখেও উঁচুনীচু বিভেদ তৈরি করত সামাজিক বৈষম্য ও অনাচারের পথ সুগম করতে এ প্রথা ছিল অদ্বিতীয়। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরাই ছিল সর্বপ্রধান। এমনকি তাঁদের নামানুসারে সে ধর্মকে ব্রাহ্মণবাদও বলা হত। বাকী স্তরগুলো ছিল যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এছাড়া চন্ডাল বা অস্পৃশ্য নামে অলিখিত বর্ণও ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনে।

বস্তুত মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাদের ধর্মকে ব্যবহার করে সমাজে নানা স্তরের সৃষ্টির ফলে শাসক ও ধর্ম প্রধানদেরই পার্থিব সুবিধা অর্জিত হয়। বর্ণবাদের এই প্রথা সমাজে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে যুগে যুগেই মানুষ এ প্রথার হাত হতে বাঁচার জন্য ধর্মান্তরিত হয় এই বাংলায়। বাংলার বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে এর অবদানও কম নয়। এমনকি সেন বর্মণ যুগে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বর্ণপ্রথা পুনরুজ্জীবিত হলে এর প্রতিক্রিয়ায় মরমীবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায়।

৮. উদারতা ও মানবতাবোধঃ

প্রাচীন বাংলায় ধর্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার উদাহরণ ছিল বেশ লক্ষণীয়। বিশেষ করে কৌম ধর্মগুলোর আচার অনুষ্ঠান আর্যধর্ম আসার পরও প্রচলিত ছিল বিনা বাধাতেই। যদিও আর্যধর্মের ব্যাপক প্রভাব ও আত্মীকরণের ফলে কৌম ধর্মগুলো স্ব স্ব অবস্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত বাংলার জনগণ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানে নিজেদের উদার ও মানবতাবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সর্বদাই। এজন্য দেখা যায় গোত্রতান্ত্রিক কৌমগুলির পৃথক পৃথক ধর্ম থাকার পরও ক্রমান্বয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, বৈষ্ণব মতবাদ, সহজিয়া মতবাদ ইত্যাদি ধর্ম বাংলায় প্রসারিত হয় কোনরূপ সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই। সামগ্রিকভাবে এ কথা বলা যায় যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বাংলা নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিল, আগত বৈদিক ধর্মবিশ্বাসকে নিজের আর্যপূর্ব মানসিকতা ও স্থানীয় উদারতা দিয়ে সিক্ত করেছিল- যার মধ্যে মানবতা ও উদারতা প্রাধান্য লাভ করেছিল।[২৭] গবেষক নীহাররঞ্জন রায় লিখেন- "এই উদার সাম্য ভাবনা ও মানবতার আদর্শই "মধ্যপর্বের হাতে আদি পর্বের শ্রেষ্ঠতম; মহত্তম উত্তরাধিকার। .... এই সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের ওপরই মধ্যযুগীয় বাংলার- বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদের প্রভাবিত সমাজ ও ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠা"।[২৮] অবশ্য বাংলার এ ধর্মীয় উদারতার দৃষ্টান্ত কেবল জনমনেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল।

---

[২৭] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পটভূমি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, চতুর্থ খন্ড, ১৯৮৩, পৃ. ৬৩

[২৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপাঠ, কলিকাতা ১৯৪৯, পৃ. ৮৬০ – ৮৬৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাংলার এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় সম্রাট বা রাজাগণ অন্য ধর্মের উপাসনালয়গুলিতে অর্থ সাহায্য করেছেন। তাদের প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন; ধর্মকাজে ভূমিদান করেছেন। আবার তৎকালীন সাহিত্য ও গানে ভিন্নধর্মী রাজাদের প্রশস্তি ও বন্দনার উল্লেখও বিরল ছিল না। অবশ্য এসবক্ষেত্রে বৌদ্ধরাজাগণ বেশ উদার ছিলেন বলে দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা অহিংসা ও সাম্য শান্তির বাণী অনুসারে তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারে পৃষ্টপোষকতা করলেও অন্য ধর্মের প্রতিও ছিলেন যথেষ্ট সহনশীল। এমনকি অনেক সময় বৌদ্ধ রাজাদের সহনশীলতায় এরূপও মনে হয়েছে যে তারা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছেন।[২৯] শাসকদের এসব উদারতার প্রভাব বাংলার জনগণের মাঝেও প্রশান্তি নিয়ে এসেছিল। ধর্মীয় সম্প্রীতির এই ধারা পরবর্তীতে বাঙালীর ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায়।

৯. বিরোধ ও সংঘর্ষঃ

ধর্মীয় উদারতা ও মানবতাবোধ বিদ্যমান থাকলেও প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় কারণে নির্যাতনও বিরোধের ঘটনাও বিরল ছিল না। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় দেখা যায় যে এসব নির্যাতন, বিরোধ কিংবা সংঘর্ষ ছিল মূলত রাজা ও শাসকদের দ্বারাই। সাধারণ জনগণের এখানে কোন স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিল না। এমনকি সাধারণ জনগণের দ্বারা সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় দাঙ্গা কিংবা সংঘর্ষের কোন ঘটনাই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়নি। রাজাগণ স্বীয় ধর্ম প্রচারার্থে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অত্যাচার-নিপীড়ন করতেন। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালান। তিনি বৌদ্ধদের বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন, বহু বৌদ্ধ বিহার ও নিদর্শন নষ্ট করে ফেলেন। এমনকি বৌদ্ধদের হত্যা করার জন্য সরকারি নির্দেশও জারী করেন।[৩০] রাজা অশোক পুন্ড্রবর্ধনের নিগ্রহ জৈনদের অপরাধে পাঠালীপুত্রের প্রায় ১৮০০০ আজীবিকদের হত্যা করেছিলেন বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়।[৩১] তাছাড়া সেন আমলে হিন্দু ধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠা কল্পে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর যে অত্যাচার চালানো হয় তা আজো বাংলার ধর্মীয় সম্প্রীতির ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে গণ্য হয়। মূলত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব বিরোধ ও অত্যাচারের ইতিহাস বাদ দিলে প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধ ও সহনশীলতায় পরিপূর্ণই ছিল বলা যায়।

---

[২৯]. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬৩
[৩০]. এ, কে, এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩
[৩১]. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

১০. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা:

প্রাচীন বাংলার ধর্মগুলো মূলত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সব ধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছে সেগুলোই প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে সর্বাধিক। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে অনেক ধর্মই বিলুপ্ত হয়েছে কালক্রমে। যেমন- আজীবিক ধর্ম, নাথ ধর্ম, অবধুতদের ধর্ম ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলার রাজাগণ প্রায় সবাই ছিলেন নিজ ধর্মের পৃষ্টপোষক। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা বজায় রাখলেও নিজ ধর্মের সাহায্য-সহযোগিতায় তারা পুরো রাজশক্তি ব্যবহার করতেন। ফলে যুগে যুগে বাংলায় রাজধর্ম হিসাবে নানা ধর্ম বি শেষ করে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। প্রাচীন রাজাগণ ও রাজবংশগুলো যে ধর্মের পৃষ্টপোষকতা করত তা হলো-[৩২]

পৃষ্ঠপোষক	শাসনাধীন অঞ্চল	ধর্ম
• রাজা বিম্বিসার	মগধ	বৌদ্ধধর্ম
• নন্দ বংশ	মগধ	বৌদ্ধধর্ম
• হর্যঙ্ক বংশ	মগধ	বৌদ্ধধর্ম
• মৌর্য বংশ	মগধ	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• অশোক মৌর্য	মগধ	বৌদ্ধধর্ম
• গুপ্ত বংশ	মগধ	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• রাজা শশাঙ্ক	গৌড়	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• ভদ্র বংশ	বঙ্গ	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• খড়্গ বংশ	সমতট	বৌদ্ধধর্ম
• দেব বংশ	সমতট	বৌদ্ধধর্ম
• পাল বংশ	গৌড়	বৌদ্ধধর্ম
• চন্দ্র বংশ	সমতট	বৌদ্ধধর্ম
• বর্মণ বংশ	গৌড় বরেন্দ্র	ব্রাহ্মণ্যবাদ
• সেন বংশ	গৌড়	ব্রাহ্মণ্যবাদ

[৩২] এ. কে. এম. নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮-১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন প্রাচীন বাংলা নানা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর বিভিন্ন রাজারা বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। ফলে দেখা যায় যে একই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধর্মের শাসন প্রচলিত ছিল। বস্তুত রাজাদের এসব পৃষ্টপোষকতার ফলে তৎকালীন সময়ে ঐসব অঞ্চলে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতিপত্তি ব্যাপক প্রসার লাভ করত।

১১. রূপান্তর ও আত্মীকরণ:

ধর্মসমূহের রূপান্তর, পরিবর্তন ও পারস্পরিক আত্মীকরণ ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম পূর্ব যুগে প্রায় প্রতিটি ধর্মই ছিল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। উৎপত্তিগতভাবে কিছু ধর্ম বা মতবাদ ছিল মূল ধর্মের শাখা স্বরূপ। যেমন: আর্যধর্ম সনাতন হতে ব্রাহ্মণ্যবাদ, পৌরাণিক ধর্ম, শৈব ধর্ম, শক্তিধর্ম, বৈষ্ণব মতবাদ, সন্ন্যাস ধর্ম ইত্যাদির জন্ম । আবার অনেক ধর্ম নতুন ভবে আত্মপ্রকাশ করে পরবর্তীতে কালের পরিক্রমায় অন্য প্রধান ধর্মের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যেমন- জৈন, আজীবিক, নাথ ধর্ম ইত্যাদি। এছাড়াও কোনটি ধর্ম হিসেবে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও অন্য ধর্মের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবাণিত হয়ে পড়ে। যেমন- আর্যধর্মের উপর কৌম ধর্মের প্রভাব; কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি। মূলত ধর্মসমূহের এই রূপান্তর ও আত্মবিলোপ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জুড়েই সংঘটিত হয়েছে বারবার।

আর্যপূর্ব কৌম ধর্মগুলোই ছিল প্রধানত বাংলার অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানের মূল। আর্যধর্ম হিসাবে সনাতন, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদির আবির্ভাব হলেও কৌম ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান কোনটাই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং এগুলো ক্রমে আর্যধর্মের রঙ গ্রহণ করে রূপান্তরিত হয়ে নতুন ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে ওঠে। তদ্রুপ জৈন ধর্মের প্রায় সমসাময়িক আজীবিক মতবাদও একসময় নানা প্রভাবে জৈন ধর্মে মিশে যায়।[৩৩] পাল আমল পর্যন্ত বাংলার জৈন ধর্মের প্রচার প্রসার থাকলেও পরবর্তীতে তা নি:শেষ হয়ে যায়। ইতিহাসবিদদের মতে তা ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।

বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্ম বৌদ্ধও এই রূপান্তর প্রক্রিয়া হতে মুক্ত থাকতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন-

> "যেসব বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং যা প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ নিজে তাঁর ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম তারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সবরকমের দেবদেবীর (কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন নাম দিয়ে, আবার কোন ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন না করেই) পূজা ও আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করে প্রথম এক রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে লৌকিক হিন্দুধর্ম থেকে তা খুব একটা ভিন্ন ছিল না"।[৩৪]

---

[৩৩] অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫

[৩৪] Chimpa Lama, and D. Chattopadhyaya, ***Taranatha's History of Baddhism in India***, Simla, 1970, Preface, p. XII–XIII

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের এই পরিবর্তন মূলত বাংলার আর্যপূর্ব জাতির উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। অনেকের মতে- "এধরনের রূপান্তরের ফলেই বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ বাধাগ্রস্থ হয় এবং এর পতন ত্বরান্বিত হয়"।

বাংলার অপর ধর্মগুলো যেমন বাউল মতবাদ, মরমীবাদ, সহজিয়া মতবাদ, সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদিও প্রকৃত অর্থে কোন আলাদা ধর্মবিশ্বাস নয়। বরং পূর্বতন আর্যধর্মের নানা উপাদান ও কৌম বিশ্বাসগুলোর সমন্বয়ে তৈরী মতবাদ হিসাবেই এগুলো পরিচিত। যার অনেকেই পরবর্তীতে নানা নামে আবার মূল ধর্মগুলোতেই রূপান্তরিত হয়েছে। প্রধান আর্যধর্ম হিসাবে প্রাচীন বাংলার সনাতন ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদ অন্য কোন ধর্মে মিশ্রিত না হলেও এতে রূপান্তর ঘটেনি এমন বলা যায় না। বরং নানা ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আর ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে এটিও স্বীয় বৈদিক ধ্যান-ধারণা বজায় রাখতে পারেনি। কৌম ধর্মগুলির প্রভাবে এ আর্যধর্ম সময়ের পরিক্রমায় বাঙালী হিন্দু ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যাতে বৈদিক রীতি নীতির তুলনায় দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবই বেশি প্রতিফলিত হয়।

১২. সভ্যতা ও সংস্কৃতি:

প্রাচীন বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। এর ইতিহাস ঐতিহ্য, সাহিত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সবগুলোতেই পাওয়া যায় প্রাচীন ধর্মগুলোর ছোঁয়া। কৃষিপ্রধান কৌমগুলোর প্রভাবে বাংলার ঐতিহ্যে কৃষিসংক্রান্ত উৎসব, পার্বণ যেমন প্রধান স্থান দখল করে রয়েছে, তেমনি মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে এদেশের আচার অনুষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের ভূমিকাই মূখ্য দেখা যায়। বস্তুত কালের পরিভ্রমণে আর্যপূর্ব সমাজের সেসব অনুষ্ঠান আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রধান অংশে পরিগণিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার সভ্যতার নিদর্শন বুঝাতেও ধর্মগুলোর আশ্রয় নেয়া আবশ্যক। এখন পর্যন্ত হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার যেসব নিদর্শন আমরা পেশ করি তা হয়তো কোন বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির নয়তো কোন মূর্তি। দেবদেবীর প্রতিমা নিমাণে নানা প্রকার কারুকার্য ও অলংকরণ আমাদের উন্নত স্থপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন। এছাড়া ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাসা, পিতল বা তামার তৈরী নানা উপাদান এবং ত্রিশূল, তীর, ধনুক, ঢাক-ঢোল, বাঁশী ইত্যাদিই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন।

অন্যদিকে সাহিত্য বিবেচনায়ও বাংলাকে ধর্ম হতে আলাদা করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ মূলত ধর্মীয় সাহিত্য হিসাবেই পরিচিত। সরহপা, লুইপা, হিল্লোপা, কাহ্নপা, শবরপা, ভুসুকপা, কুক্কুরীপা প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্চাপদ আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য সম্পদ। এর পরবর্তীতে মধ্যযুগীয় পর্যায়েও বাংলার সাহিত্য ছিল ধর্ম নির্ভর। বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ন, মহাভারত, নানা পৌরাণিক রূপকথা ইত্যাদি সাহিত্য উপর্যুক্ত বক্তব্যেরই সার্থক প্রমাণ স্বরূপ। এমনকি হাল আমলে প্রচলিত বাউল গান, লোকসঙ্গীত ইত্যাদিতেও ধর্মীয় প্রেরণা ও ভাবের আদান-প্রদানই বেশি লক্ষণীয়। বস্তুত ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলায় ইসলামের আগমন ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক বিশ্লেষণে এদেশে ইসলামের আগমণ ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আবশ্যক। মূলত কোন সময় হতে এদেশে মুসলিম ও অমুসলিম সম্পর্কের সূত্রপাত হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় না। কেননা ইসলামের আগমনের ফলেই এদেশে মুসলিম জাতির আবির্ভাব চাই সে মুসলিম বহিরাগত হোক কিংবা দেশি ধর্মান্তরিত মুসলিম হোক। ঐতিহাসিকগণ নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেও বাংলায় ইসলামের আগমনের কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ বের করতে পারেননি। তবে এ সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে না রেখে তাঁরা আমাদেরকে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নানা সময়ের সন্ধান দেন যাতে এদেশে ইসলামের আগমনকাল সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়। ঐতিহাসিকদের সেসব মতামতের আলোকেই আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলায় ইসলামের অভ্যুদয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

একথা সর্বসম্মত যে বাংলায় ইসলামের রাজকীয় অনুপ্রবেশ ঘটে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী এর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে। খ্রিস্টীয় ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ তৎকালীন বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে রাজধানী নদীয়ায় পরাজিত করেন। বস্তুত এর মাধ্যমে বাংলায় বিজয়ীর বেশে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ঐতিহাসিকগণ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদের এই বিজয়াভিযানের সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ বর্ণনা করেননি। তবে সে সময়কার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস সিরাজ স্বীয় গ্রন্থে এ সংক্রান্ত নানা যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করে মোটামুটি একটি সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন-

> "ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ গৌড় অঞ্চলটি বিজয়ের পর নদীয়াকে জনমানবশূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করে বর্তমান লক্ষ্ণৌতিতে তাঁর সরকারের রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি অঞ্চলটির নানা অংশ স্বীয় শাসনাধীন করেন, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেন, সারা অঞ্চলে খুৎবা পাঠের প্রচলন করেন, মুদ্রা প্রকাশ করেন এবং তাঁর স্বীয় উদ্যোগ ও আমীর ওমরাহদের প্রচেষ্ঠায় বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাহ নির্মাণ করেন"।[৩৫]

বস্তুত এ সময়কার বিজয় উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এরূপ একটি মুদ্রা হতেই এ বিজয়ের সময়কাল আন্দাজ করা হয়। তৎকালীন একটি মুদ্রায় মুদ্রিত ছিল রমজান ৬০০ হিজরী বা মে, ১২০৪ খৃ:। মূলত এটিই ছিল বাংলা বিজয়ের বিশেষ ক্ষণ যা ঐতিহাসিকগণ নানা পর্যালোচনার পর স্বীকার করে নিয়েছেন।[৩৬]

---

[৩৫]. Minhaj Uddin Abul Umar Usman, ***Tabakat-1-Nasiri: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hisdustan (810-1260),*** trans. H. G Reverty (Calcutta: Asiatic Society of Bengal 1881; Reprint- New Delhi: Oriental Books Reprint corp. 1970) p.559-60.

[৩৬]. John Deyell, ***Living without silver: The Monetary History of early Medieval North India***, Delhi: Oxford University Press, 1990, p.364

Dhaka University Institutional Repository

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদের এই বিজয়ের ফলে বাংলায় ইসলাম ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রচারিত হয় এ ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক মতভেদ নেই। তবে কতিপয় ঐতিহাসিক নানা প্রমাণের মাধ্যমে এ কথা সুদৃঢ় করেছেন যে, প্রাচীন বাংলা ইসলাম ও মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এ বিজয়ের অনেক পূর্বেই। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক হতে ১০ম শতকের মধ্যেই ইসলাম এদেশে প্রবেশ করে এবং প্রচারিত হয়। যদিও তা ব্যাপক আকারে জনমনে তখনো প্রবেশ করেনি। এনামুল হক বলেন- "তের শতকে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির প্রবেশ ঘটে, যদিও মুসলিম সাধকশ্রেণী সামান্য সংখ্যায় হলেও এদেশে ধর্ম প্রচার শুরু করেন এগার শতক হতেই"।[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বাংলায় ইসলামের পরিচয় প্রসারিত হয় দুটি মাধ্যমে। আর তা হলো বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার। ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত যে, আরবদের সাথে সুপ্রাচীনকাল হতেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সুতরাং একথা অযৌক্তিক নয় যে, মক্কা-মদীনায় ইসলাম প্রচারের সময় হতেই ভারতীয়গণ ইসলাম সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেছিলেন। অবশ্য মহানবী (স) সরাসরি কোন সৈন্যদল কিংবা ধর্মপ্রচারকদল ভারতে প্রেরণ করেননি। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। নিম্নের দু'টি হাদীসই এ প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য:

- হযরত আবু হুরায়রাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূল (স) আমাদেরকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং আমি যদি সে সময় জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমার সমস্ত ধন-সম্পদ ও স্বীয় জীবন সে অভিযানে ব্যয় করতে দ্বিধা করব না। আমি যদি সেখানে নিহত হই তবে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করব; আর যদি গাযী হিসাবে ফিরে আসি তবে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করব।"[৩৮]
- হযরত সাওবান (রা:) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন- "আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের অগ্নিকুন্ড হতে নিস্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি হলো হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল এবং অপরটি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ:) এর সহায়তাকারী সেনাদল।"[৩৯]

বস্তুত শুধু এ দু'টি হাদীসই নয় বরং রাসূল (স) এর সাথে হিন্দুস্থানের আরো গভীরতর সম্পর্কের কথাও জানা যায়। মহানবী (স) ভারতীয় সুগন্ধি দ্রব্য লাভ করেন এবং ভারতের কুঞ্জের রাজা শরবতক তাঁকে আচারও পাঠিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান।[৪০]যা হোক, মহানবী (স) এর সময়েই আরব-ভারত সম্পর্ক ভারতবর্ষে ইসলামের অনুপ্রবেশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

---

৩৭. Mohammad Enamul Haq, ***A History of Sufism in Bengal***, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1975, p.144.

৩৮. ইমাম নাসাঈ, ***নাসাঈ শরীফ***, কিতাবুল জিহাদ, ঢাকা: কুতুবখানা রাশিদিয়া, তা. বি., পৃ. ৫২

৩৯. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী, ***সহীহ সুনানুন নাসাঈ***, ২য় খন্ড, রিয়াদ: মাকতাবুত তারাবিয়াতুল আরাবী লিদুয়ালিল খালিজ, ১৯৮৮, পৃ. ৬৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে আরব ভূগোলবিদদের বর্ণনা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণও ভারত-আরব সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার জন্ম দিয়েছিল। তাঁদের বিবরণী হতে একথা পরিস্ফুট হয় যে, ভারতবর্ষে তথা বাংলায় আগমণের পথ কিংবা এখানকার বন্দর, অবস্থান, সামাজিক, রাজনৈতিক অবকাঠামো সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন। আরব ভূগোলবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলায়মান বিস্তারিত বাণিজ্যপথের ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র অংকন করেন। এতে তিনি আরবগণ কর্তৃক বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের পথ নির্দেশ করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির নাম ছিল 'সিলসিলাতুত তাওয়ারীখ'।[৪১] পরবর্তীতে ইবন খুরদাদবিহ, আল ইদ্রীসী, আল মাসউদী, ইয়াকুত ইবন আব্দুল্লাহ প্রমুখ ভূগোল ও ইতিহাসবিদগণ আরব-ভারতের নানা দিক উন্মোচন করেন। তাঁদের বর্ণনায় বাংলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার কতিপয় নিম্নে পেশ করা হলো-

নবম শতাব্দীর আরব ভূগোলবিদ ইবন খুরদাদবিহ বলেন যে সরন্দীপ (শ্রীলংকা) এবং গোদাবরী নদী পেরিয়ে এগিয়ে গেলে সমন্দর নামে একটি বন্দর রয়েছে যার আশে পাশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। তাঁর মতে-এই বন্দরে কামরূপ (আসাম) হতে মিষ্টি পানির পথে পনের/বিশ দিনে নৌকা যৌগে চন্দনকাঠ আনা হয়।[৪২] ইতিহাসবিদ আল ইদ্রাসীও এ স্থানের উল্লেখ করে বলেন- এটি একটি বড় নদীর মোহনায় অবস্থিত। বস্তুত ভূগোলবিদদের এসব বর্ণনা প্রাচীন বাংলার চাঁদপুর নদী বন্দরকেই ইঙ্গিত করে। ইদ্রীসী অন্যত্র লিখেন- 'বাগদাদ' ও 'বাসরাহ' থেকে আরব বণিক এবং পর্যটকগণ মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা যাওয়া করতেন"।[৪৩] ভূগোলবিদ ইবন খুরদাদবিহ চট্টগ্রামের রামু অঞ্চলের বর্ণনায় বলেন- সরন্দ্বীপের পর জাজিরাতুর রামি নামে একটি ভূখন্ড আছে। আল মাসউদী উল্লেখ করেন- ভারত সাগরের তীরে নদীবিধৌত একট দেশ বিদ্যমান।[৪৪]

তাছাড়া আরব ভূগোলবিদদের বর্ণনার ব্যবহৃত রুহমী, রামি, সমন্দর, সরন্দ্বীপ, সুরতন ইত্যাদি নামের ব্যবহার মূলত এদেশের নানা অঞ্চলেরই বর্ণনা। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ 'বরহিন্দ' দ্বারা উত্তর বাংলাকেই ইঙ্গিত করেছেন।[৪৫] তিনি বলেন- "বিশাল সাগরে আরবগণ জাহাজে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে যখনই মহাসাগরে এই দেশের লাল মাটি লক্ষ্য করত তখন 'বরহিন্দ' বা 'বররিহিন্দ' বলে চিৎকার করে উঠত। তখন থেকেই এর নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরবী বররি শব্দের অর্থ স্থলভূমি"।[৪৬] বস্তুত আরব ভূগোলবিদদের এসব বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তারা বাংলা ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাঁদের এসব বিবরণ আরব বণিকদের বাণিজ্য পথের সন্ধান দেয় এবং এসব দেশের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। যা পরবর্তীতে এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করে।

---

৪১. K. A. Nizami, ***Comprehensive History of India***, New Delhi: Peoples Pubs House, 1982, p.37

৪২. Sir H. M. Elliot and Prof. John Dowson, ***The History of India as told by its own Historians***, Vol-1, Allahabad: Kitab Mahal, 1964, p. 2

৪৩. ড. মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিম অব বেঙ্গল*, রিয়াদ,১৯৮৫,পৃ. ৩০

৪৪. নাসির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২

৪৫. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৪৬. মুফাখখারুল ইসলাম, *উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পাঠ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪, পৃ.৭১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইসলাম অনুপ্রবেশের সর্বপ্রধান মাধ্যম ছিল আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক। ইসলামপূর্ব কাল হতেই এ বাণিজ্যিক সম্পর্ক চলে আসছিল। আরবগণ ইসলাম গ্রহণ করলেও বাণিজ্যিক সম্পর্কে কোনরূপ পরিবর্তন আনেননি। বরং ইসলামপূর্ব যুগের ন্যায় ইসলাম পরবর্তীতেও তারা বাণিজ্য উপলক্ষে চীন-ভারত আগমন করতেন। আরবদের এ বাণিজ্যপথের বর্ণনায় সৈয়দ সুলায়মান নদভী লিখেন-

> "আরবরা কাশবাতে আসত পারস্য উপসাগরের পারস্য উপকূল ধরে এবং তারপর তায়েয নামক বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করত। তারপর তারা সিন্ধুর বন্দর থাথ এ আসত, তারপর গুজরাট ও কাথিওয়ারের বন্দর সমূহে ভিড়ত। যথা: খানা, খামরায়াত, মানবারা, চেমুর, বাহবোচ, ভারহুত, গান্ধার, ঘোঘা, সুরাট; অত:পর যেত মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দর সমূহে, যথা: মালাবার, করমন্ডল, কেপকেমোরিন (কুমার), এাভাকুর (কুলুম), ম্যাঙ্গালোর, চালইয়ী, পিন্ডারাণী, চান্দ্রাপুর, হানুর, ছেফাতান, কালিকট ও মাদ্রাজ এবং তারপর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করত। এখানে তাদের কেন্দ্র ছিল সিলেট। একে তারা বলতো সিলাহাত। তারপর তারা যেত চট্টগ্রাম, একে বলতো সাদজাম, এখানে থেকে শ্যাম হয়ে চীন সাগরে প্রবেশ করতো"।[৪৭]

বস্তুত আরব-চীন বাণিজ্যযাত্রার মূলসূত্র ছিল ভারতবর্ষ। এজন্য ভারতকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগই তাদের ছিল না। বরং ভৌগলিক অবস্থানের এ সুবিধাকে আরবরা কাজে লাগিয়েছে বেশ ভালভাবেই। চীনের পাশাপাশি ভারতবর্ষর সাথেও তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীরতর হয়ে উঠেছিল। এরই প্রেক্ষিতে বাংলার চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বন্দরগুলোতেও তাদের যাতায়াত ছিল স্বাভাবিক। ফলে দেখা যায় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকেই আরব বণিক ও ব্যবসায়ীগণ এদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন এবং পরবর্তীতে এসব উপকূলীয় বন্দরসমূহ আরব বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। সৈয়দ সুলায়মান নদভীর 'আরব আওর হিন্দ কি তালুকাত' গ্রন্থের সূত্র ধরে মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন-

> "সাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের মালাগর, কালিকট, চেরর এবং আমাদের চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আরবদেশ থেকে বছরে অন্তত দুবার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙ্গর করত। ফলে বাণিজ্য পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হতো তেমনি সংবাদাদিরও আদান-প্রদান চলত।"[৪৮]

একথা অস্বীকার করা যায় না যে- আরব বণিকদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যের সাথে সাথে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে তাঁরা ইসলাম প্রচারের সুযোগটাও হাতছাড়া করেননি। তাঁদের প্রচারণা ও প্রভাবে অতি সহজেই সেসব এলাকায় ইসলাম জনপ্রিয়তা লাভ করে। এভাবে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও

---

৪৭. তাঁরাচাঁদ, (এস মুহিবুল্লাহ অনূদিত) *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯১৮, পৃ.২৯

৪৮. সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *আরবো কি জাহাজরাণী*, হুমায়ুন খান অনূদিত, আরব নৌবহর, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

তৎসংলগ্ন এলাকার আরবীয় বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে স্থানীয় কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং এ ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সুফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পুর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৪৯] সুতরাং বলা চলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকেই সে যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীন এবং বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে৭১২ খৃঃ আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে স্থায়ী আরব মুসলিম বসতি স্থাপনের ফলে সারা ভারতে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়।[৫০]

বাংলাদেশে ইসলাম অনুপ্রবেশের অন্যতম মাধ্যম ছিল মুসলমানদের ধর্মপ্রচার। মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকতে পারে। যেহেতু পূর্বেই আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য সম্পর্কের কারণে পারস্পরিক যাতায়াত ও যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সেপথ ধরে ধর্মপ্রচারকদের এসব দেশে আগমন অস্বাভাবিক ছিল না। অধিকন্তু মুসলিমগণ ধর্মপ্রচারকে নিজ নিজ ধর্মীয় কর্তব্য এবং ধর্মপ্রচারের জন্য জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করাকে গৌরবের কাজ মনে করতেন। মুসলিমদের এরূপ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভরপুর। প্রাচীন বাংলায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম কে আসেন তা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে ইসলাম প্রচারে বঙ্গদেশে প্রথম যে প্রচারক দল এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন মহানবী (স) এর কিছু সাহাবী। রাসূল (স) এর মামা সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওহাব (রা) নবুওতের সপ্তম সনে (খ্রিস্টীয় ৬১৭ সনে) কায়স ইবন হুযাইফা (রা) উরওয়াহ ইবন আছাছা (রা), আবু কায়স ইবন হারিছ (রা) ও কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমকে সাথে নিয়ে আবিসিনিয়া হতে চীনের উদ্দেশ্যে দুইটি জাহাজ নিয়ে রওয়ানা হন।[৫১] তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চীনে ধর্মপ্রচার। এ লক্ষ্যে তাঁরা আরবদের বাণিজ্যপথ ধরে নানা বন্দরে অবতরণ করেন। সুস্পষ্টভাবে কোন বর্ণনা পাওয়া না গেলেও তাঁদের এ ভ্রমণে তাঁরা সে সব বন্দরে অবতরণ করেন এবং সেখানে যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কেননা ইসলাম শুধু চীনবাসীদের জন্যই নয় বরং সকল এলাকার জন্যই। সুতরাং ইসলাম প্রচারের এ সুযোগে তাঁরা হাতছাড়া করেননি; এটাই ছিল স্বাভাবিক শাইখ যাইনুদ্দীন স্বীয় তুহফাতুল মুজাহিদীন গ্রন্থে ভারতের মালাবার বন্দরে এরূপ একদল আরবদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের তথ্যপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। সাহাবী আবু ওয়াক্কাসের এ চীন যাত্রায় অবশ্যই তাঁকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙ্গর করতে হয়েছিল।[৫২] কেননা তৎকালে রসদ সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য এর কোন বিকল্প ছিল না। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, সাহাবীগণ বাংলায় অবতরণ

৪৯. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৭, পৃ.১৬৭

৫০. মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন, *বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৮৮, পৃ.৩৪৫

৫১. মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্থানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮, পৃ. ১৩-২০

৫২. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)*, পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ.৫৫

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং রসদ সংগ্রহের স্বল্পকালীন সময়েও ইসলাম প্রচার করেন। সে সময় কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা জানা না গেলেও বাংলার জনগণ সে সময় ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছিল- ইসলামের অনুপ্রবেশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করলে ভারতে ইসলাম প্রচারের এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। এসময়ই ইসলাম প্রচারের জন্য বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রচারক বাংলায় আসেন। তাদের নেতা ছিলেন মাহমুদ ও মুহায়মিন (র)। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদ উদ্দীন (র), হযরত হোসেন উদ্দীন, হযরত মর্তুজা, হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত আবু তালিব (র) প্রমুখ। এভাবে পরপর পাঁচটি দল বাংলায় আসেন ও ধর্মপ্রচার করেন।[৫৩]

এছাড়াও ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এর বিজয়ের পূর্বে বহু সুফী-সাধক ও মুবাল্লিগ ধর্মপ্রচারার্থে এদেশে আগমন করেছিলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মধ্য এশিয়ার বালখের শাসক শাহ-মুহাম্মদ সুলতান বালখী। তিনি নৌপথে সন্দ্বীপ পৌঁছান এবং পরবর্তীতে হিন্দু রাজা বলরামের রাজ্য হরিরামনগর এসে উপস্থিত হন। এরপর তিনি মহাস্থানগরে (বর্তমান বগুড়া) বসতি স্থাপন করেন। এখানে তিনি মাদ্রাসা, মসজিদ স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৫৪] একাদশ শতকের মধ্য ভাগে অপর একজন বিখ্যাত মনীষী এদেশে এসেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছিলেন শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী। তিনি নেত্রকোণার মদনপুরে এসে উপস্থিত হন এবং তৎকালীন কোচ রাজার অনুমতিতে তথায় বসবাস করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে।[৫৫]

রাজা বল্লাল সেনের সময়ও (১১৫৮-১১৭৯) এদেশে ইসলাম প্রচারকার্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এসময় বাবা আদম শহীদ নামক একজন সুফীসাধক একদল সাথী নিয়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। এছাড়া ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ সূর্যখুল আনতিয়াহ নামক জনৈক বুযুর্গ ইসলাম প্রচারার্থে বাংলায় আগমন করেন।[৫৬] খ্রিস্টীয় ১১৮৪ সালে রাজশাহী অঞ্চলে আরো একজন মুবাল্লিগের দেখা পাওয়া যায়। তার নাম শাহ মাখদুম রূপোশ (র)। তাঁর পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়।[৫৭] এভাবেই ইসলামের আবির্ভাবকাল হতেই এক শতাব্দীকালের ব্যবধানে তা প্রাচীন বাংলায় এসে আত্মপ্রচার লাভ করে। সুফী সাধক মুবাল্লিগগণ ক্রমান্বয়ে এদেশে আসতে থাকেন। এ

---

৫৩. মোঃ জয়নুল আবেদীন ও আফরোজা বেগম, *মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮১, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, পৃ. ১৭১

৫৪. এ. কে. এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫

৫৫. *Bengal district Gazetteers*, Mymensingh, ibid, 1917, P.52

৫৬. মোঃ জয়নুল আবেদীন ও আফরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২

৫৭. এ. কে. এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে আরব বণিকগণও ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে ইখতিয়ার উদ্দীনের বাংলা জয়ের ফলে এদেশে মুবাল্লিগদের আগমন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। বস্তুত খ্রিষ্টীয় ৭ম শতক হতে ১০ম শতকের মধ্যেই বাংলা ইসলামের সংস্পর্শে আসে; তবে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এর সম্প্রসারণ পূর্ণগতি লাভ করে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোও উপর্যুক্ত বর্ণনার সাক্ষ্য প্রমাণ করে। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে একটি আরবীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে এটি ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক আল-মুহাম্মদীয়া টাকশালে নির্মিত মুদ্রা।[৫৮] এ মুদ্রা বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে এনামুল হক বলেন-

> "হিন্দু সভ্যতার কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব-পারস্যের মুসলিম সঠিক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস, এমন কোন ইসলাম প্রচারক বা বণিকগণ কর্তৃক পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে এ মুদ্রা আনীত হয়। সম্ভবত যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে তথায় প্রচার করতে গমন করে তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁর মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল। যেরূপেই হউক পাহাড়পুরের আব্বাসীয় খলিফার এই মুদ্রাটি অন্তত খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বঙ্গের সাথে ইসলামের সম্বন্ধ স্থাপন করেছে।"[৫৯]

বাংলাদেশে ইসলামী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন হলো লালমনিরহাট-সদর থানার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজায় ১৯৮৬ সালে প্রাপ্ত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন সম্বলিত এ ধ্বংসাবশেষে কালিমা তাইয়্যেবাসহ ৬৯ হিজরী সনের কথা লিখা ছিল। ধারণা করা হয় ইসলাম প্রচারের একেবার প্রারম্ভিক যুগে এখানে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি মুসলিম বসতি গড়ে উঠেছিল, যা 'মজদের আড়া' নামে সুপরিচিত ণিল।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ভৌগোলিক বিবরণী ও ঐতিহাসিক প্রমাণ ইত্যাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে বাংলায় ইসলামের আগমন ইখতিয়ার উদ্দীনের নদীয়া জয়ের মাধ্যমে হয়নি। বরং এরও বহু আগে খ্রিস্টীয় ৭ম শতক হতে ১০ম শতকের কোন যে কোন সময়েই তা ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড সাইমন্ডস এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য-

> "The culture that now developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The port of this country especially Chittagong, had come under the influence of the Arabs so early as the 7th country A.D. and many of the Arabs voyagers and traders had left a permament impress upon the area. Islam therefore, took root very easily in this respective soil".[৬০]

---

[৫৮]. K. N. Dikshit, ***Memories of the Archaeaological Survey of India***, No. 55, Relho- 1938, p.87

[৫৯]. মুহাম্মদ এনামুল হক, ***পূর্ব পাকিস্থানে ইসলাম***, প্রাগুক্ত, পৃ.১২

[৬০]. Richard Symonds, ***The Making of Pakistan***, London: Faber and Faber, Rusell square, 1951, p.197

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক হতে দশম শতকের মধ্যে বাংলার জনগণ ইসলামের সংস্পর্শে আসলেও ইসলাম সে সময় উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়নি। জনসাধারণের অসহযোগিতা, প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ, যোগাযোগ ও যাতায়াত অবকাঠামোর হীনাবস্থা, সর্বোপরি গোটা বিশ্বেই মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা সে সময় বাংলায় ইসলাম বিস্তারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমান্বয়ে এসব বাধা যখন অনেকাংশে দূরীভূত হয় এবং ইখতিয়ার উদ্দীনের নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয় তখন ব্যাপকাকারে এদেশে ইসলামের বিকাশ ঘটে। ইসলামের এ ক্রমবিকাশের ধারায় ধর্মপ্রচারক সুফী-সাধকদের যেমন অবদান ছিল, তেমনি সৈন্য-রাজকর্মচারী, বণিক ও পর্যটক মুসলিমদের অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। এভাবে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির নানা উপাদানকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় মুসলিমগণ ক্রমান্বয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

এ সংখ্যাধিক্যতা মূলত এক শতাব্দীর ফসল নয়, বরং বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাপক এ ধর্মান্তরণের কারণ উদঘাটনে ঐতিহাসিকগণ সচেতন হন মূলত বাংলায় ইসলামের আগমন ও বিকাশের অনেক পরে। স্বাভাবিকভাবে উপমহাদেশে বৃটিশ রাজত্বকালেও বাংলাকে হিন্দুপ্রধান হিসাবে গণ্য করা হত। এর প্রধান কারণ ছিল সম্ভবত কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ। আর কলকাতাতে পূর্ববঙ্গের তুলনায় অধিকসংখ্যক হিন্দুদের বসবাস ছিল সবসময়ই। ব্রিটিশগণ নদীবিধৌত পূর্ববঙ্গকে একটি অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চল হিসাবেই দেখত। সুতরাং এ অঞ্চলের নানা সমস্যা সম্ভাবনা দেখার পাশাপাশি জনসংখ্যার অবস্থা পর্যবেক্ষণে তাদের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ১৮৭২ সালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলা প্রদেশে পরিচালিত প্রথম আদমশুমারী অনুযায়ী এ অঞ্চলটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ তথ্য সে সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৬১] সে আদমশুমারী অনুযায়ী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাবনা, রাহশাহী ইত্যাদি জেলাগুলোতে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং বগুড়া জেলায় ৮০ শতাংশ মুসলমানের উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়।[৬২]

---

[৬১] Rafiuddin Ahmed, ***The Bengal Muslim 1817-1906, A quest for identity***, Delhi-1981, p.1

[৬২] M Bevery, ***Report on the census of Bengal 1872***, Calcutta: Secretarial Press, 1872, p.12-15

Dhaka University Institutional Repository

আদমশুমারীর ফলাফল প্রত্যক্ষ করে তৎকালীন বাংলা প্রদেশ সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা জেমস ওয়াইজ লিখেন-"নিম্ন ও পূর্ববঙ্গে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃতির ইতিহাস বর্তমানকালে এতোবেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, এজন্য বিষয়টি নিয়ে সতর্ক পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যলোচনা হওয়া দরকার।"[৬৩] বস্তুত এর পর হতেই বাংলায় হিন্দু বৌদ্ধ জনসংখ্যার ব্যাপক ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান শুরু হয়। পরিশেষে ঐতিহাসিকদের গবেষণা, যুক্তি প্রমাণ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ ধর্মান্তরণকরণ প্রক্রিয়ার কতিপয় কারণ প্রকাশিত হয়, যা বাংলায় ইসলাম প্রসারের কারণ বা তত্ত্ব হিসাবে পরিগণিত হয়। বাংলায় ইসলামের এ ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে যে সব তত্ত্ব বা মতবাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হলো:

(ক) তরবারির মাধ্যমে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ তত্ত্ব (Sword Theory)
(খ) রাজনৈতিক পৃষ্টপোষকতা তত্ত্ব (Political Patronage Theory)
(গ) অভিবাসন তত্ত্ব (Migration Theory)
(ঘ) প্রচারণা তত্ত্ব (Persuation Theory)
(ঙ) সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব (Social Libration Theory)
(চ) সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী তত্ত্ব (Caltural Mediator Theory)
(ছ) সীমান্ত তত্ত্ব (Frontier Theory)
(জ) আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব (Regional Personality Theory)
(ঝ) খোলাগ্রাম তত্ত্ব (Open Village Theory)

বাংলায় ইসলামের ক্রমবিকাশের জন্য এসব তত্ত্বগুলোতে নানা বিষয়কে দায়ী করা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে এসব তত্ত্বগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে, যাতে করে এদেশের মুসলিম-অমুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক বাস্তবতা যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

---

[৬৩]. James wise, ***The Muhammadams of Eastern Bengal,*** Journal of Asiatic Society of Bengal, Year 63, 1894, p.28

Dhaka University Institutional Repository

তরবারির মাধ্যমে বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ তত্ত্ব
(Sword Theory)

বাংলায় ইসলামের প্রচার প্রসার ও ক্রমবিকাশের কারণ অনুসন্ধানে সর্বপ্রথম যে মতবাদটি আলোড়ন সৃষ্টি করে তা হলো তরবারির মাধ্যমে বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ তত্ত্ব। এটি বলপ্রয়োগ মতবাদ নামেও খ্যাত। এ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটিশ বাংলার সিভিল সার্জন হিসাবে প্রায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইংরেজ কর্মকর্তা জেমস ওয়াইজ (James Wise)।[৬৪] তিনি গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলায় ব্যাপক ধর্মান্তরণের কারণ হিসাবে মুসলিমদের কর্তৃক জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণকেই দায়ী করেন। অবশ্য জেমস ওয়াইজ এ মতবাদের পেছনে ব্যাপক প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেননি। তাঁর মতে-ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম সৈন্যরা অত্যুৎসাহী হয়ে বাংলার ভীরু সমাজে ইসলাম জোরপূর্বক প্রচার করেছে। তারা পূর্ব সীমান্তের ঘন জঙ্গলে ও সিলেট অঞ্চলের গ্রামগুলোতে আল হেলাল পতাকা উড়িয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরও আরব-মুসলিমদের জোর দখলে ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[৬৫]

বাংলায় জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সত্যায়নকল্পে ওয়াইজ আরো বলেন যে- খুন বা যিনার (ব্যভিচারের) শাস্তি হতে মুক্তি পাবার জন্য হিন্দুরা ভয়ে ধর্মান্তরিত হতে পারে; কেননা মুসলিমদের অধীনে এ ইসলাম গ্রহণ যে কোন অপরাধের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।[৬৬] জেমস ওয়াইজের-এ বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থনে আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রধানতম মাধ্যম ছিল ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদের বাংলা বিজয়। এটা তরবারির মাধ্যমেই হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এদেশে আগত সুফীসাধক ও মুবাল্লিগদের নানা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার অসংখ্য বর্ণনা লক্ষণীয়। এ. কে. এম. শাহনেওয়াজ বলেন-

> "বাংলায় প্রেমবাণী প্রচারক সুফীদের পাশাপাশি যোদ্ধা সুফীদেরও অস্তিত্ব ছিল। এরাও ধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অমুসলিম রাজা ও ভূস্বামীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে গিয়ে অনেক সুফী শহীদ হচ্ছেন। কেউ কেউ গাজীও হয়েছেন। যেমন-ঢাকার রামপালে বাবা আদম শহীদ, রাজশাহীর তুর্কানা শহীদ, পাবনার শাহজাদপুরের মখদুম শাহদ্দৌলা শহীদ, মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান মাহী সওয়ার ও রাজশাহীর মখদুম শাহ রূপোশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৬৭]

---

৬৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:

James Wise, ***The Hindus of Eastern Bengal***, Journal of the Asiatic Society of Bengal 62, No 3, 1893, p. 1– 8

- ***The Muhammadams of Eastern Bangal***, Journal of the Asiatic Society of Bengal 63, 1894, p. 28 – 63

- ***Notes on the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal***, Vol 2, London, 1883

৬৫. James Wise, ***The Muhammadans of Eastern Bengal***. ibid, p. 29

৬৬. James Wise, ibid, p. 28-30

৬৭. এ. কে. এম শাহনাওয়াজ, *সুলতানী বাংলার ধর্মচিন্তা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, সংখ্যা ২৫-২৬, ১৪০৫-০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

তবে জেমস ওয়াইজের এ বলপ্রয়োগ তত্ত্বটি সমালোচনা মুক্ত নয়। বরং এ ব্যাখার অসারতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পন্ডিতমহলের সচেতনতা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।[৬৮] বস্তুত জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণই যদি বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ হতো, তবে মুসলিমদের সংখাধিক্য দিল্লী, আগ্রা, গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলেই বেশি হত; বাংলায় নয়। কেননা ঐসব অঞ্চল ছিল মুসলিমদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ও শক্তির কেন্দ্রস্থল। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ঐসব অঞ্চলেই মুসলিমগণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। প্রত্যন্ত বাংলায় মুসলিমদের এতটা শক্তি বা সমার্থ্য ছিল না।

বলপূর্বক ধর্মান্তরণে আরো যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো রাজশক্তি কিংবা তরবারির ভয়ে ধর্মান্তরিত হলে তা বেশিদিন টিকে থাকে না। ভয়প্রদর্শনকারী শক্তি স্তিমিত হয়ে গেলেই লোকজন স্বীয় পূর্বধর্মে ফিরে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জোরপ্রর্দশন লোকজনকে কোন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না করে উল্টো দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে নতুন ধর্ম গ্রহণে অনীহা তাদের মনমানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফলে। রাজস্থানের মিউ সম্প্রদায় এরূপ অবস্থার উজ্জ্বল প্রমাণ। মোগল শাসনের ধর্মান্তরণে শাস্তি দেয়ার কারণে পরবর্তীতে মিউ সম্প্রদায় ইসলাম প্রতিরোধে একাট্টা হয়।[৬৯] রাজশক্তির বা তরবারির ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং তরবারির প্রতি ঘৃণায় ইসলাম গ্রহণ হতে তারা বিরত থাকে।

তাছাড়া ইখতিয়ার উদ্দীনের বাংলা জয়ের ফলে বাংলায় ইসলাম প্রচারের কাজ সহজ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই এর কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা দেননি যে তিনি জোরপূর্বক কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। বরং তাঁর বাংলা জয় যতটা না ধর্মীয় কারণে ছিল তার চাইতে বেশি ছিল রাজনৈতিক। সুফী সাধকদের যুদ্ধ ইসলাম বলপ্রয়োগ করে প্রচারের জন্য ছিল না। বরং অত্যাচার মোকাবিলায় বা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারে বাঁধা আসায় কিংবা আত্মরক্ষার খাতিরেই এসব যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এসব যুদ্ধের পর সুফী-সাধকগণ কোন ক্ষেত্রে বিজয়ী হলেও পরবর্তীতে এ স্থানের অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জোরজবরদস্তি করেননি। বস্তুত জেমস ওয়াইজের এ মতবাদ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের দু'চারটি উদাহরণ যে নেই তা নয়।[৭০] তবে এগুলো বাংলার ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের জন্য দায়ী নয় কোনভাবেই।

---

৬৮. দ্রষ্টব্য: Peter Hardy, ***Modern European and Muslim Explanations of conversion to Islam in South Asia: A Preliminary Survey of the Liberation***, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, No 2, p. 177-206.

৬৯. S. R. Sharma and R. N Srivastara, ***Institutional Resistance and Empiric Study in Society of Religion***, Sociological Bulletin 10, No 1, March 1967, p.77

৭০. আকসাদুল আলম, ***বাংলায় ইসলাম বিস্তার: একটি পর্যালোচনা***, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঊনবিংশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন-২০০১, পৃ.১৪২

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা তত্ত্ব
(Political Patronage Theory)

বাংলায় ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত। বিশেষ করে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীরা এরূপ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাকে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেন। কেননা তাদের মতে ধর্ম সামাজিক মর্যাদা ও উন্নতি প্রদানকারী বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন বাংলায় রাজনীতি কিংবা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে প্রধান নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়।

এ মতবাদ অনুসারে বাংলায় ব্যাপক ধর্মান্তরের প্রধান কারণ হলো জীবন-যাপনে প্রচলিত সরকারের কৃপাদৃষ্টি/আনুকূল্য লাভের আশায় শাসক শ্রেণীর ধর্মকে গ্রহণ করা। এরূপ ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে চাকুরী, মর্যাদা লাভ, শাস্তি ও কর প্রদান হতে অব্যাহতি, সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন কিংবা অর্থনৈতিক সুবিধালাভ ইত্যাদি দায়ী। বাংলায় মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর নিকট হতে নানা পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য ধর্মান্তরের নানা ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়। ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেন-ভারতীয়দের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে তারা নিজেদের নওমুসলিম হিসাবে খলজি সুলতানদের কাছে উপস্থাপন করত এবং বিনিময়ে তাদের মর্যাদা অনুসারে তাদেরকে সম্মানসূচক আলখাল্লা দিয়ে পুরস্কৃত করা হত।[৭১] পর্তুগিজ পরিব্রাজক বারবোসা এর বর্ণনা মতে ষোড়শ শতকে রাজানুগ্রহ লাভের আশায় অনেক বিধর্মীই মুসলমান বা মূর এ পরিণত হন।[৭২] পিটার হার্ডি এর মতে-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে এমন অনেক নওমুসলমান দেখা যায় যারা রাজস্ব অনাদায়ের কারণে কারারুদ্ধতা হতে রেহাই পাওয়া কিংবা পৈত্রিক জমি রক্ষার জন্য এ ধর্মান্তর কবুল করেছিল।[৭৩]

এতদ্ব্যতীত পুরোপুরি ধর্মান্তরিত মুসলিম না হলেও নানা স্বার্থান্বেষণে অনেককেই ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথেও একমত হতে দেখা যায়। সরকারি কেরানি ও প্রশাসনিক কর্মচারি নিয়োগের সময় গাঙ্গেয় অঞ্চলের কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্রের পারসানি ও সিন্ধুর তামিল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে এরূপ নজীর ইতিহসে বিরল নয়।[৭৪] অন্যদিকে পারিবরিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন সৈন্য-সামন্ত, কর্মচারী এবং দাসগণ পার্থিব সুবিধা লাভের আশায় প্রশাসকগণের ধর্মীয় চেতনায় একাত্মতা ঘোষণা করার বিষয়টিও মনস্তাত্তিকগণ স্বাভাবিক বলেই বিবেচনা করেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ধর্মান্তরিত না হলেও ঐ ব্যক্তিদের পরবর্তী প্রজন্ম অনেকাংশেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। সুতরাং বাংলায় ইসলাম বিস্তারে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার এরূপ পরোক্ষ প্রভাবও কম ছিল না।

---

[৭১] Ibn Battuta, ***The Rehela of Ibn Battuta***, trans. Mahdi Hussain, Baroda: Oriental Institute 1963, p.40

[৭২] D. Barbosa, ***The Book of Duarte Barbosa***, Eng tr. by U. I. Dares Vol ii, London 1921, p.148

[৭৩] P. Hardy, ibid, p.80-81

[৭৪] Aziz Ahmed, ***Studies in Islamic Calture in India Environment***, Oxford: Clerendon Press, 1964, p.105

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার কারণেও বাংলায় ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল বহুলাংশে। বাংলার একেবারে প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়-এ অঞ্চলে ধর্ম সর্বদাই রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করেছে। বাংলার মুসলিম শাসকগণও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইসলাম প্রচারকে তাঁরা তাদের অন্যতম কর্তব্য বলেও মনে করতেন। স্বীয় রাজদরবারে ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম ও সুফীসাধকদের সমাদর করতেন। এজনই দেখা যায় বাংলায় মুসলিম শাসনামলে বিপুল সংখ্যক ইসলাম প্রচারক মুবাল্লিগ এদেশে এসেছিলেন। এছাড়াও ইসলাম চর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরী ও মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ স্থাপনে তাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। এসবের ফলে বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকতা লাভ করে বিস্ময়করভাবে।

কিন্তু বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের পেছনে এ মতবাদের উপস্থাপন ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পূর্ণাঙ্গ হিসেবে প্রতীয়মান হয় না। বরং তরবারি বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের তত্ত্বের ন্যায় এ তত্ত্বও প্রাচীন বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের পর্যবেক্ষণে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এ তত্ত্ব মতে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে যেহেতু বাংলায় ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া ব্যাপকতা লাভ করেছে সেহেতু মুসলিমদের বসবাসস্থল মুসলিম শাসকদের আবাসস্থলের নিকটবর্তী হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ যে সব স্থানে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বেশি কিংবা প্রভাব প্রাধান্য সুস্পষ্ট সে সব স্থানে মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য হওয়ার কথা। কিন্তু গোটা উপমহাদেশেই রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ও প্রাধান্যের সাথে ইসলামীকরণের বিপরীত সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয়। দেখা যায় যে, মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থলের তুলনায় যেসব স্থানে মুসলিম শাসকদের প্রাধান্য তুলনামূলক অনেক কম সেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলেই মুসলিমদের সংখ্যা বেশি। ১৯০১ সালের ভারত আদমশুমারী মতে-

> "এসব জেলার (পূর্বাঞ্চলের) কোনটিই মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিচিত নয়। ঢাকা প্রায় শতবৎসরকাল নগরের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু ফরিদপুর ছাড়া এর আশেপাশের জেলাগুলোর তুলনায় এখানে মুসলমান কম। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে প্রায় সাড়ে চারশ বৎসর যাবৎ মুসলিম শাসনের কেন্দ্র ও রাজধানী ছিল। কিন্তু তৎসংলগ্ন দিনাজপুর, রাজশাহী ও নদীয়ার তুলনায় সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম।"[৭৫]

সুতরাং বাংলার ব্যাপক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইসলামীকরণের জন্য এ তত্ত্ব ঐতিহাসিকগণ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেননি। অবশ্য রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেছিল বটে, তবে ব্যাপকভাবে নয় বলেই গবেষকগণ ধারণা করেন।

---

৭৫. *Census of India, 1901*, Vol-6, The lower provinces of Bengal and their Deudatories, Calcutta: Bengal Secretarial Press, 1902, p.156

Dhaka University Institutional Repository

অভিবাসন তত্ত্ব
(Migration Theory)

বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যার ব্যাপকতার কারণ নির্দেশক এ অভিবাসন তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ছিলেন আবু এ. গজনভি। পরবর্তীতে বাঙালী গবেষক খন্দকার ফজলে রাব্বিও এ মতবাদের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন।[৭৬] এ মতবাদের উদ্ভব ঘটে মূলত বেভারলির সামাজিক মুক্তি তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায়। ১৮৭২ সালে আদমশুমারীতে মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের কারণ হিসেবে বেভারলি অন্ত্যজ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করার বিবরণ পেশ করেন। এতদদৃষ্টে বাংলার গণধর্মান্তরের ব্যাখ্যায় বেভারলির রিপোর্টের বিরোধিতা করে গজনভি তাঁর এ মতবাদ পেশ করেন। তিনি বলেন-বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চন্ডাল বা কৈতর্বদের বংশধর নয়; বরং তাঁরা বিদেশী বংশোদ্ভূত, যদিও অনেক ক্ষেত্রের তার মাত্রা কমবেশি হতে পারে।[৭৭] মুসলিমদের জন্মহারের ব্যাপকতা, ইসলামে কৌমার্যব্রত বা সন্ন্যাসবাদের প্রতি নিরুৎসাহিতকরণ সর্বোপরি বাঙালীদের তুলনায় আরবীয়দের আয়ুর পরিমাণ বেশি হওয়া ইত্যাদি বিষয় বাংলার অধিবাসী মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে।[৭৮] এতদ্ব্যতীত বহিরাগতদের সাথে স্থানীয়দের বিবাহ, রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আশায় বাংলায় আগমন, সুফী-সাধক, বণিকদের আগমনেও এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বাংলায় মুসলিম আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারি। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের মাধমেই মূলত এদেশে উল্লেখযোগ্য হারে অভিবাসী মুসলিমের আগমন ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ বখতিয়ার খিলজীর অনুগামী সৈন্যের নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করতে না পারলেও এটা সুস্পষ্ট যে বাংলা বিজয়ের পর বখতিয়ার খিলজী এ অঞ্চল হতেই দশ হাজার সেন্য নিয়ে তিব্বত অভিযানে বের হন।[৭৯]

---

[৭৬] বিস্তারিত জানতে দেখুন-

-Abu A Ghuznavi, ***Notes on the Origin, Social and Religious Divisions and other Matters Touching on the Muhammedans of Bengal and Having Special Reference to the District of Maimensing***, India Office Library, London, N. D, European MSS., E-295, Vol-17

-Khondokar Fazli Rubbee, ***The Origin of the Musalmans of Bengal***, Dacca Society for Pakistan Studies, 1970

-K. F. Rubbee, ***Banglar Musalman***, translated by Abdur Razzaqqe, Dhaka: Bangla Academy, 1986

[৭৭] Abu A Ghuznavi, ibid, p. 297

[৭৯] আবু উমর মিনহাজউদ্দিন উসমান ইবন সিরাজদ্দীন আল জুজানী, *তবাকাত ই-নাসিরী*, কলকাতা, ১৮৮৪, পৃ.১৫২

Dhaka University Institutional Repository

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদের বাংলা বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়লে- অব্যাহত ধারায় এদেশে বিজেতা, শাসক, সৈন্য, সেনাপতি, মুবাল্লিগ, বণিক, শিক্ষক ও ভাগ্যান্বেষী হিসাবে আরব-তুর্কী ও পারস্যবাসী লোকজন আসতে থাকে।[৮০] বখতিয়ারি খিলজী ও পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ প্রয়োজনীয় মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, বাজার, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করেন। অত:পর এদের নিয়েই বাংলায় প্রথম মুসলিম সমাজ গঠিত হয়।[৮১]

অভিবাসন তত্ত্ব মতে- বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ মোটেই ধর্মান্তরকরণ নয়। বরং বাংলার বাইরের অঞ্চল, বিশেষ করে আরব ও ইরান হতে আসা মুসলমানগণ ও পরবর্তীতে তাঁদের বংশধরদের দ্বারাই গড়ে ওঠেছে। কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও গজনভি তার এ তত্ত্বের সমর্থনে বাংলার মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বেশ কিছু কারণ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে- তুর্কী শাসনপূর্ব আরব অভিবাসন, সুলতানগণ কর্তৃক বিদেশীদের ভূমিদান, মোগল বিজয়ের ফলে প্রতিটি পল্লীতে আফগানদের বিস্তৃতি, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহের ফলে পরবর্তীতে বাংলায় আরব, পারস্য ও তুর্কীদের আগমন অব্যাহত থাকে। ইখতিয়ার উদ্দীনের পর বাংলার শাসনকর্তা আলী মর্দান খিলজীর সময়ে, ১২০৮ সালে, বাংলার আরো এক বিশাল অভিবাসী দল আগমন করে।[৮২] এম. এ. রহিমের মতে- "তের শতকের প্রথম চতুর্থাংশে প্রায় ৪০,০০০ খিলজী বংশীয় তুর্কি পুরুষ, মহিলা ও শিশু বাংলায় বসতি স্থাপন করে"।[৮৩] সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র বুগরা খাঁর শাসনামলে ১৫০০০ ইলবারি তুর্কি সপরিবারে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করে।[৮৪] এভাবে দেখা যায় যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল সংখ্যক অভিবাসী এদেশে আগমন করেন এবং পরবর্তীতে তাদের দ্বারাই এ অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া নানা কারণেও এদেশে অভিবাসীদের আগমন ঘটে। যেমন: মধ্য এশিয়ায় মোঘল সেনাপতি চেঙ্গিস খানের ধ্বংসাভিযানের ফলে সেখানকার বহু সুফী সাধক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাংলায় আসেন। আলী মর্দান খলজীর পরবর্তী শাসক ইওয়াজ খলজী তাঁদেরকে বাংলায় সাদর আমন্ত্রণ জানান ও তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।[৮৫]

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে দিল্লীতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিপুল সংখ্যক লোকজন এাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে পরিবার পরিজনসহ বাংলায় আগমণ করেন।[৮৬] ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত লোদী বংশের অনেকেই বাংলায় চলে আসেন। তৎকালীন বাংলার শাসক সুলতান নুসরাত শাহ তাদেরকে বিপুল জমি-জমা দান করেন।[৮৭] এতদ্ব্যতীত বাংলায় আগত অভিবাসী সুফী সাধকদের

---

৮০. রফিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা:), *ইসলাম ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩১

৮১. জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, কলকাতা, ১৮৬২, পৃ. ৯২

৮২. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৯১

৮৩. এম. এ রহিম, *সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিস্টোরি অব বেঙ্গল*, ভল্যুম ১, করাচি, ১৯৬৩, পৃ.৬২-৬৩

৮৪. জিয়াউদ্দিন বারানী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২

৮৫. মিনহাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরী* (আব্দুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ.৫২

৮৬. আব্দুল কাশিম, *হিন্দ শাহ ফিরিশতাহ, তারিখ-ই-ফিরিশতাহ*, নেওয়াল কিশোর সংস্করণ, প্রথমপর্ব, পৃ.১৩৯।

৮৭. গোলাম হুসাইন সেলিম, *রিয়াজ উস-সালাতীন*, কলকাতা, ১৮৯৮, পৃ.১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাও নিতান্তই কম ছিল না। তাঁরা বিপুল সংখ্যক শিষ্য সমবিভব্যহারে বাংলায় আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন।[৮৮] এভাবে অভিবাসীদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে বাংলায় মুসলিম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। গবেষক গজনভি ও ফজলে রাব্বি এভাবে ইতিহাসের নানা ঘটনা ও বর্ণনার মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার তথা ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াসী হন। অবশ্য তাঁরা বাংলার স্থানীয় জনগণের ধর্মান্তরের কথাও স্বীকার করেন যদিও তাঁদের মতে তা ব্যাপককারে ছিল না। বরং তাদের ভাষায়- এদেশের বর্তমান মুসলিমদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই সাবেক শাসকের শাসনামলে আগত বৈদেশিক মুসলিম। ফজলে রাব্বির মতে- ভৌগোলিকভাবে এ অঞ্চলটি সবসময়ই বৈদেশিক আগ্রাসন হতে নিরাপদ থাকছে এবং পরিণতিতে এটা মুসলিমদের জন্য বড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।[৮৯]

তবে বাংলার গণইসলামীকরণের বিশ্লেষণে এ মতবাদটিও ঐতিহাসিকগণ সমালোচনামুক্তভাবে গ্রহণ করেননি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ তত্ত্বের আংশিক উপযোগিতা মেনে নিয়ে তাঁরা বলেন যে-বাংলায় ইসলামীকরণে এ তত্ত্ব সর্বাংশে দায়ী নয়। বরং এটাও সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। এ প্রেক্ষিতে যেসব সমালোচনা করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রথমত অভিবাসী মুসলমান বাংলার মোট মুসলিমের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছিল মাত্র। বাকী লক্ষ লক্ষ মুসলিমের ইসলাম গ্রহণের কারণ এ তত্ত্বে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলার মুসলিমদের কুলজী ও উৎসের সন্ধানে এটাও প্রমাণিত হয় এদেশের স্থানীয় অধিবাসীই ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বৈদেশিক লোকদের অনুপাত ছিল এখানে সামান্য মাত্র। তৃতীয়ত, তৎকালীন সময়ে বাংলা অভিবাসনের উপযুক্ত স্থান ছিল না। বরং এটা ছিল অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চল। যেমন আকবরের শাসনকালে বাংলার আবহাওয়া মোগলদের নিকট অস্বস্থিকর বলে গণ্য হতো এবং বাংলাতে কাউকে প্রেরণ করা নির্বাসনের সাথে তুলনা করা হত।[৯০] সুতরাং এরূপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশে উন্নত সভ্যতা হতে লোকজন অভিবাসী হিসাবে আগমন করবে তা মনস্তাত্ত্বিক বিচারে অস্বাভাবিক মনে হয়। চতুর্থত, অভিবাসনের কারণ হিসাবে ফজলে রাব্বি যে ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন তাও অযৌক্তিক। কেননা মুসলিমদের এখানে আগমনের ফলে বাইরের অন্যান্য আগন্তুকের কাছেও এ অঞ্চলে আগমনের বাধাঁও আর বিদ্যমান থাকে না। পরবর্তীতে বাংলায় ইংরেজ ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজদের আগমনও ফজলে রাব্বীর মতকে সমর্থন করে না।

বস্তুত অভিবাসন তত্ত্ব বাংলায় ইসলামীকরণের বিশ্লেষণে পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও আংশিকভাবে উপযোগী। অভিবাসীগণ বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ট অংশ না হলেও এদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাদের অবদান ছিল অসামান্য। আরো একটি ক্ষেত্রে এ তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর তা হলো বাংলার মুসলিমদের উৎস নির্ধারণ। এদেশীয় মুসলিমগণ অভিবাসী, না-কি স্থানীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বা স্থানীয় অভিজাত বাসিন্দা এরূপ উৎসের আলোচনায় এ তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে গবেষকদের বিস্তারিত গবেষণায় যা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে।

৮৮. এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলকাতা, ১৯৩৫; মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্টরি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল*, ভলুয়াম ১, রিয়াদ, ১৯৮৫

৮৯. K. F. Rubbee, ibid, p. 43

৯০. James Wise, ibid, p. 29

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব
(Social Liberation Theory)

বাংলাদেশে ইসলামের সম্প্রসারণের কারণ অনুসন্ধানে সবচেয় জনপ্রিয় ও গৃহীত তত্ত্ব হলো "সামাজিক মুক্তি তত্ত্ব" । এর মূলসূর হলো সমাজের বিদ্যমান বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় নতুনের জয়গান । এ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন ১৮৭২ সালের আদমশুমারী রিপোর্টটির সংকলন হেনরি বেভারলি ।[৯১] তাঁর মতে হিন্দুদের কঠোর জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দারুণভাবে নির্যাতিত হয় । ফলে ইসলাম ধর্মের সাম্যনীতি ও সর্বজনীন আদর্শকে তারা সহজেই গ্রহণ করে ।[৯২]

পরবর্তীকালে এইচ. এইচ. রিজলী, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, ই. টি ডালটন প্রমুখ গবেষকগণও এ তত্ত্ব সমর্থন করেন ।[৯৩] এ তত্ত্বানুসারে বাংলার জনসাধারণ বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধগণ সামাজিক নানা বৈষম্য ও অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলিমদের আগমনকে স্বাগত জানায় এবং ইসলামের জাতিগত বৈষম্যহীনতার আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে গণহারে ইসলাম গ্রহণ করে । এ তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য ইসলামের বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার অবস্থা বিবেচনা আবশ্যক । আব্দুল করিমের ভাষ্য মতে- মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলার সেন শাসনামলে রাজশক্তি গণশক্তির উপর তেমন শ্রদ্ধাশীল ছিল না । এ সময় সাধারণ মানুষ এতটা অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল যে, মুসলিম আগমনকে তারা মুক্তির হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেছে । শূন্যপূরাণ এর 'নিরঞ্জনের রুস্মায়'এর সমর্থন পাওয়া যায় । এতে দেখা যায় যে মুসলিমদের আগমনে অত্যাচারিত বাঙালীরা উল্লসিত ।[৯৪]

প্রকৃতপক্ষে সেন শাসনামলে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে । রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব চলে যায় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত শ্রেণীর কব্জায় । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদ ও জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । ফলে সমাজে এক শোচনীয় বৈষম্য দেখা দেয় । এমন সময় ইসলামের সাম্যেরবাণী ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত নিম্ন বর্ণের মানুষদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে । ফলে বর্ণবৈষম্যের শিকার সাধারণ বাঙালীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ।[৯৫] বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের তত্ত্বের প্রবক্তা জেমস ওয়াইজের নিম্নোক্ত বক্তব্যেও সামাজিক মুক্তির

---

[৯১]. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- H Beverly, ***Report on the census of Bengal 1872***, Calcutta: Secretarial Press, 1872

[৯২] H. Beverly, ibid, p. 132

[৯৩]. দ্রষ্টব্য- -Herbert Risely, Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, 1981
-W. W. Lenter, The Indian Musulmans, Calcutta, 1945
-মোহর আলী, প্রাগুক্ত, ভল্যুম ১, রিয়াদ, ১৯৮৫

[৯৪]. Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal Down to A.D 1338, Chittagong: Baitus Sharaf Islamic Research Institute, 1985, p.182

[৯৫]. এবাদাত হোসেন, পদাবলী সমীক্ষা, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে-

> "মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমনকে সে সময়কার কাঠুরে, জেলে সম্প্রদায় ও হতাশাগ্রস্থ চন্ডাল-কৈবর্তরা আনন্দিতভাবে বরণ করে নেয়নি-একথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। কেননা ইসলাম ছিল সাম্যের ঘোষণাকারী এবং এ বাহিনী তাদের নির্যাতনকারী হিন্দুর উঁচু শ্রেণীকে বশে রেখেছিল। মূলত বর্ণপ্রথা অদৃশ্যদের একই গ্রামে বসবাস নিষিদ্ধ করে। ব্রাহ্মণরা তাদেরকে নিকৃষ্টতর পেশা গ্রহণে বাধ্য করে এবং বাস্তবিকপক্ষে তাদেরকে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হিসাবে মর্যাদা দেয়। পক্ষান্তরে ইসলাম ঘোষণা করে যে ধনী-গরীব, দাস-মনিব, কৃষক-রাজপুত্র সবাই আল্লাহর নিকট সমান। সর্বোপরি ব্রাহ্মণরা যেখানে সর্বোচ্চ গুণসম্পন্ন দাসদেরও ভবিষ্যতের আলো দেখাতে পারে না। সেখানে ইসলামপন্থীগণ শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই তাদের সুখের নিশ্চয়তা দেয় না, বরং সে সাথে পরবর্তী জীবনেরও চিরন্তন সুখের ঘোষণা দেয়।"[৯৬]

জেমস ওয়াইজের এই বক্তব্য তৎকালীন বাংলার প্রচলিত দু'টি ধর্মেরই সংক্ষিপ্ত অথচ চিরন্তন বাস্তবতা তুলে ধরে। ফলে স্বভাবতই বাঙালী সমাজের অবহেলিত ও পদদলিত অংশ সামাজিক মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই ইসলামের ভ্রাতৃত্বের আদর্শে যোগদান করে।[৯৭] বেভারলির এ তত্ত্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বিশ্লেষণে অধিকতর প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। তবে সার্বিক বিবেচনায় এ মতবাদও পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা যদি সামাজিক বৈষম্যই ধর্মান্তরের প্রধান কারণ হত তবে ভারতের অন্যান্য স্থানেও এরূপ হত। কিন্তু উত্তর ভারতে, যেখানে বাংলার ন্যায়ই আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক বর্ণভেদের কাঠিন্য বিদ্যমান ছিল, সামাজিক মুক্তিলাভের কারণে ধর্মান্তর ঘটেছিল- একথা বলা যায় না।[৯৮] সুতরাং বলা চলে শুধু সামাজিক মুক্তির উদ্দেশ্যেই বাংলার গণধর্মান্তরের পেছনে দায়ী নয় বরং আর্থ-সামাজিক আরো নানা উপাদান এর পেছনে সক্রিয় ছিল।

এ তত্ত্বের মতে- ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সামাজিক বৈষম্যের শিকার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে। এ তত্ত্বানুসারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। অথচ বাংলার ইতিহাসে উঁচু বর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের উদাহরণও প্রচুর। এ প্রসঙ্গে ভোজর ব্রাহ্মণ ও সম্ভাবনাথ ব্রাহ্মণের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখযোগ্য।[৯৯] রাজা গণেশের পুত্র যদুও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে এতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে লিখেন-[১০০]

"হিন্দুকুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন"

অর্থাৎ হিন্দুদের মাঝে ব্রাহ্মণ হয়েও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। শেখ চাঁদের রসুল বিজয় কাব্যেও তিনজন ব্রাহ্মণের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী পাওয়া যায়।[১০১] বস্তুত ইতিহাসে এমন অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান যাতে দেখা যায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

---

৯৬. James Wise, ibid, p.32

৯৭. I. H. Qureshi, ***The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent***, The Hague, 1962, p.75

৯৮. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

৯৯. এ. বি এম শামসুদীন আহমদ, *সুলতানি আমলে বাংলার মুসলিম সমাজঃ গঠন ও প্রকৃতি*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬৪

১০০. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, আদি চতুর্দশ খন্ড, (সম্পাঃ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী), কলিকাতা, তা.বি., পৃ.৪৭

১০১. শেখ চাঁদ, *রসুল বিজয়*, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩য় খন্ড, ১০৪৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.১০০-১০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণা তত্ত্ব
(Persuation Theory)

প্রচারণা তত্ত্বের মূল কথা হলো- বাংলায় ইসলামের ব্যাপক প্রসারতার প্রধান কারণ হলো ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচারণা। আর এ প্রচারার্থে প্রধান ভূমিকা পালন করেন পীর, সুফী-সাধক, ফকীর-দরবেশ, মুবাল্লিগ ও আলেমগণ। এ তত্ত্ব মতে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পূর্ব হতেই ইসলাম প্রচার কার্য শুরু হয়। এমনকি বর্তমানেও এ প্রচারকার্য অব্যাহত রয়েছে। আর এটাই বাংলার গণধর্মান্তরের জন্য দায়ী।

বাংলায় সুফীদের ধর্মপ্রচারের প্রধান সুর ছিল প্রেমবাণী প্রচার। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের প্রচার করা। তাঁদের ধর্মদর্শন ছিল বলপ্রয়োগ বা জোর জবরদস্তির মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণত কোন অঞ্চলে সুফীদের একটি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ থাকত। যাতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। বস্তুত বাংলার এই খানকাহগুলোর থেকেই চারপাশের অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে।[১০২] আব্দুল করিম বলেন- "তাঁদের (শেখ বা সুফীদের) খানকাহ ছিল আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। তাঁরা জনগণকে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন এবং শাসকবর্গকে ধর্মীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। এছাড়া তাঁরা স্থানীয় জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেন"।[১০৩]

তৎকালীন সুফী সাধকদের তৎপরতা বাংলায় বেশ কটি শিক্ষা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে বিহার-পাুয়া, সোনারগাঁ, শ্রীহট্ট অন্যতম।[১০৪] এসব কেন্দ্রগুলো ছিল সুফী-সাধকদের মূল অবস্থানস্থল। এ কেন্দ্রগুলো হতেই পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বাংলায় ইসলামের প্রেম ও সাম্যের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। এরূপই এক কেন্দ্র শ্রীহট্ট ছিল হযরত শাহজালালের বসতি। তাঁর অনুপ্রেরণায় সিলেটে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ হয়েছিল বলে পর্যটক ইবনে বতুতার ভাষ্যে জানা যায়।[১০৫] বাংলায় অসংখ্য সুফী-সাধক ও আলেমগণ ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হলেন- হযরত শাহজালাল, শেখ জালাল মুহাম্মদ তাবরিজী, শাহ মখদুম রুপোশ, শাহ সফীউদ্দিন, খান জাহান আলী, জাফর খান গাজী, বাবা আদম শহীদ, শাহ মোয়াজ্জাম দানিশমান্দ, শাহ সুলতান মাহীসাওয়ার, শাহ মোস্তফা, শেখ আতা, পীর বদরুদ্দীন, নাসিরউদ্দিন সিপাহসালার, শেখ মজলিস, শাহ ফতেহ গাজী প্রমুখ।[১০৬]

---

১০২ Mohammad Enamul Haq, ***A History of Sufi-ism in Bengal***, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1975, p. 264

১০৩ Abdul Karim, ***Social history of the Muslim in Bengal***, ibid, p.128

১০৪ Jagadish Narayan Sarkr, Hindus Muslim Relation in Bengal (Medieval Period), Idarah-i-Adariyat-i-Delhi, 1985, p.19

১০৫ ইবনে বতুতা, ***The Rehala***, ibid, p.612

১০৬ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- Mohammad Enamul Haq, ***A History of Sufi-ism in Bengal***, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1975, p. 264

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণা তত্ত্বের ক্ষেত্রে সুফী-সাধক ও আলেমগণদের পাশাপাশি আরব-পারস্য হতে আগত বণিক ও সৈন্যদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজের অবসরে কিংবা ধর্মপ্রচারের সুযোগ আসলে তাঁরা তা পালন করে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতেন বিনা দ্বিধায়। তাছাড়া পরোক্ষভাবে ধর্মপ্রচার কাজে বাংলার সুলতান ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের অবদানও কম ছিল না। মূলত সকলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও কর্মস্পৃহায় ক্রমান্বয়ে বাংলার ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে। তবে বাংলার ধর্মান্তরণের জন্য শুধু প্রচারণাকেই দায়ী করা চলে না। কেননা ব্যাপক প্রচারণা ও ধর্মপ্রচার সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য স্থানে বাংলার ন্যায় ইসলাম একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে প্রচারণা তত্ত্বের অবদান বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে গবেষকগণ মনে করেন।

সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী তত্ত্ব
(Cultural Mediator Theory)

বাংলাদেশে গণইসলামীকরণের কারণ নির্ণয়ে অপেক্ষাকৃত নবতর তত্ত্ব হচ্ছে সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী তত্ত্ব। এ তত্ত্বের প্রবক্তা অসীম রায় ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে বাংলায় ইসলামের জনপ্রিয়তার নতুন এক কারণ অনুসন্ধান করেছেন।[১০৭]

তাঁর মতে-বাংলায় ইসলামের অগ্রযাত্রার পেছনে সমন্বয়ধর্মী একটি বিশেষ ধারার প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। এ ধারার পরিচালকদের তিনি "সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী" (Cultural Mediator) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলায় তাঁরাই ইসলামকে জনপ্রিয় করেছেন বলে তিনি মনে করেন। এ তত্ত্ব মতে-প্রাচীন বাংলার দু'ধরণের মধ্যস্থকারী পাওয়া যায়। প্রথমত, পীর-দরবেশ ও সুফী সাধকগণ; আর দ্বিতীয় দল হলেন বাংলার সাহিত্যিক ও লেখকগোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পীর-মাশায়েখগণ ছিলেন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট তাঁরা ছিলেন সমান জনপ্রিয়। তাঁদের সাম্যের বাণী, জনকল্যাণ, পরোপকার, মানবতাবোধ ও আধ্যাত্মিক সাধনা জনমনে তাঁদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরী করেছিল। এছাড়া তাঁদের অলৌকিকতার প্রতিও অনুরক্ত ছিল এদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মন। ফলে গণমানুষ ইহকালীন-পরকালীন নানা কল্যাণের জন্য এসব সুফী দরবেশদের অনুগত থাকত।[১০৮]

---

[১০৭]. বিস্তারিত দেখুন-

-Asim Roy, ***The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal***, Princeton: Princeton University Press, 1983

Dhaka University Institutional Repository

[১০৮] Abdul Karim, ibid, p.177

বাংলার সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এসব সুফীসাধকদের অবদান অনস্বীকার্য। সামাজিক বৈষম্যের শিকার, বিরোধপূর্ণ বাংলার জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে তাঁরা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাছাড়া শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনকারী শক্তি, পরামর্শদাতা ও অত্যাচারের বিরোধিতাকারী শান্তিদাতা হিসাবেও তাদের ভূমিকা বাংলার নানা ধর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করেছিল । এভাবে পীর-দরবেশ ও সুফীগণ আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে বাংলায় ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন এবং ব্যাপক ধর্মান্তরের ঘটনা এঁদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।[১০৯]

সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী অপর গোষ্ঠী ছিলেন বাংলা পুঁথি বা সাহিত্যের আদি লেখকশ্রেণী। তাঁরা বাংলার ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা ভাষায় আরবী ফরাসী শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে তারা সমন্বয় সৃষ্টি করেন। ফলে উভয় প্রকারের সংস্কৃতির মিশ্রণের দরুণ বাংলার ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যকার ব্যবধান দূরীভূত হয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা এ ধরনের প্রয়াস দেখতে পাই সুস্পষ্টভাবে। এভাবে ইসলাম প্রবাসী ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত না থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলার মানুষের নিজস্ব ধর্ম হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এরই ফলশ্রুতিতে সংগঠিত হয় এ ব্যাপক ধর্মান্তর।

তত্ত্ব হিসাবে নবতর হলেও অসীম রায়ের এ চিন্তাধারা বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তারের কারণ হিসাবে একেবারেই অগ্রহণীয় নয়। বিশেষত মধ্যযুগে এ সমন্বয়ধর্মী ধারাই বেশি কার্যকর ছিল বলে তিনি দাবী করেন। মূলত সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী তত্ত্ব সরাসরিভাবে ধর্মান্তরকরণে কার্যকর না হলেও বাংলায় ইসলামকে জনপ্রিয় করে তুলতে এ দু'প্রকার মধ্যস্থতাকারী ছিলেন অনন্য। পরোক্ষভাবে ইসলামকে জনপ্রিয় করায় তাদের অবদান কখনোই উপেক্ষা করা যায় না।

---

[১০৯] Asim Roy, ibid, p.38

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্ত তত্ত্ব
(Frontier Theory)

সীমান্ত তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন। তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলা অঞ্চলে মুসলিমদের উৎপত্তি ও বিকাশের এক নতুন মতবাদ পেশ করেন।[১১০] তিনি বাংলাদেশকে একটি বিশেষায়িত সীমান্ত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং ইসলাম আগমনের সময়কালীন বাংলার বিভিন্ন সীমান্ত তথা রাজনৈতিক সীমান্ত, ভৌগোলিক সীমান্ত, অর্থনৈতিক সীমান্ত, সাংস্কৃতিক সীমান্ত ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, ইসলাম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ হলো এর ভৌগোলিক অবস্থান ও অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চল।

তিনি প্রাচীন বাংলার মানচিত্র গবেষণা করে তৎকালীন বাংলার নানা ভৌগোলিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে সেসময় বাংলায় বড় বড় নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়, ফলে নানা স্থানে উর্বর পলিযুক্ত চর ও অনাবাদি ভূমির জন্ম হয়। ফলে স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চল হতে উর্বর অঞ্চলের দিকে মানুষের অভিবাসন প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। যার, ভৌগোলিক কারণেই, শেষপ্রান্ত ছিল পূর্ব বাংলা।[১১১] এ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার নতুন বসতি গড়ে ওঠতে থাকে। এসময় তৎকালীন সুফী-সাধক ও ধর্মীয় ব্যক্তিরা সেখানে বসতি স্থাপনে নেতৃত্ব দেন। মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তাঘাট, বাজার স্থাপন, মোগল সম্রাটদের সহায়তায় জঙ্গল পরিষ্কার ও নানা বাধা অপসারণ ইত্যাদি কাজে ব্যাপক অবদান রাখায় তাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে সহজেই তাঁরা ঐসব নতুন বসতিতে শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হতে থাকেন। ইটনের মতে- এটি ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক সীমান্তের উপর ভূমি সংক্রান্ত সীমান্তের বিজয়। এ বিজয়ের প্রমাণ প্রদর্শনে তিনি তৎকালীন পশ্চিমবাংলার নতুলনায় পূর্ববাংলায় বেশি মসজিদ নির্মাণ ও কমসংখ্যক মন্দির নির্মাণের তথ্য পেশ করেন। পরবর্তীতে ইটন সাংস্কৃতিক সীমান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে-বাংলার ঐতিহ্যগত উদারতা ও মানবতাবোধের ফলে সহজেই ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় স্থান করে নিতে পেরেছিল । বস্তুত ইসলামী ও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত নবতর সংস্কৃতি, অভিবাসন ও জনসংখ্যায় নতুন কৃষকশ্রেণীর উদ্ভব ইতাদি কারণে বাংলার ইসলাম ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয় এবং ফলশ্রুতিতে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ সংগঠিত হয়।

---

১১০. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*: **1204-1760**, Delhi: Oxford University Press, 1994.

১১১. R.M Eaton, ibid, p. XXIII.

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব
(Regional Personality Theory)

বাংলায় ইসলামীকরণ এর বিশ্লেষণে আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব বেশ গুরুত্বের দাবীদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী এ তত্ত্বের প্রবক্তা । তিনি প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক নানা দিক বিশ্লেষণে এ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।[১১২] আলোচ্য তত্ত্বে অধ্যাপক মমিন বাংলার ধর্মসমূহের স্বাভাবিক গতিধারার বিশ্লেষনপূর্বক এক কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। বিশেষত আর্যপূর্ব যুগ হতেই ধর্মসমূহের রূপান্তর, সংমিশ্রণ, পারস্পরিক উদারতা ও মানবতাবোধ, সর্বোপরি বাংলার দেশীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক অবকাঠামো ইতাদির অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা প্রত্যক্ষকারী আব্দুল মমিন চৌধুরী এগুলোকেই বাংলার আঞ্চলিক স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরেন। অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এসব গুণের কারণেই ইসলাম প্রবাসী ধর্ম হলেও সহজেই বাংলার হৃদয় মানসে জায়গা করে নেয়। অধ্যাপক মমিনের এ তত্ত্বের মূল সূর তাঁর ভাষায় নিম্নরূপ:

> "প্রাচীন যুগ হতেই বাংলা তার নিজস্ব উদারতা দিয়ে সকল ধর্মকেই আপন করে নিয়েছে; যেখানে আর্যধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদ তেমন দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি। আদি উপজাতীয় আচারানুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস ও আবাসন একে স্বকীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করেছে, বৌদ্ধধর্ম স্বীয় মানবতা ও সহিষ্ণুতার বাণী ছড়িয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে সে আঞ্চলিক ব্যক্তিতে এক মানবতা বোধের বীজ অঙ্কুরিত করেছে। সুতরাং যে বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে সর্বদাই সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান সেখানে বাংলায় সেন আমলে গোড়া হিন্দুবাদের প্রবর্তন এবং বর্ণভেদমূলক সমাজবিন্যাস যেন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা-ই স্বাভাবিক। অপরদিকে ইসলামের উদারনৈতিক আদর্শ হয়তো বাংলার আঞ্চলিক স্বকয়িতার সাথে অনেকটা মিল যায়। আর সে কারণেই সেন আমলের আলোড়িত ধর্ম ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম বিস্তারের পথ সুগম হয়।"[১১৩]

প্রকৃতপক্ষে আবদুল মমিন চৌধুরী আলোচ্য তত্ত্বে ইসলামের আদর্শ ও বাঙলার আঞ্চলিক ব্যক্তিত্বের মধ্যকার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। যাতে মানবতা, উদারতা ও সহনশীলতার জয়গানই ধ্বনিত হয়। আর এ জন্যই বাংলায় ইসলাম অতি অল্পকালেই জনপ্রিয় ধর্ম হিসাবে সমাদৃত হয় বলে তিনি মনে করেন।

---

[১১২] ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা: বাংলা ব্রাদার্স, ২০০২

-Abdul Momin Chowdhury, ***Aspects of Ancient Bengal Society and Socio-religions Attitude: Tradition and Continuity***, Dhaka University Studies, XXXVII, December-1982

- ***Islamization in Bengal, Some Aspects of the Socio-religious Background,*** Dhaka University Studies Part A, Vol 47, No 1, June 1990

[১১৩] আব্দুল মমিন চৌধুরী, Islamization of Bengal, ibid, p.78-79

Dhaka University Institutional Repository

খোলাগ্রাম তত্ত্ব
(Open Village Theory)

বাংলায় ইসলাম সম্প্রসারণের প্রকৃতি অনুসন্ধানে সর্বশেষ তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খোলা গ্রাম তত্ত্ব। এর প্রবক্তা আকবর আলী খান।[১১৪] তিনি বাংলা গ্রামীণ কাঠামোর সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ও প্রসারের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বস্তুত কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের কোন মতবাদ বা ধর্মের প্রসারতার কারণ নির্ণয়ে এ তত্ত্বের ব্যবহার নতুন নয়। বরং পাশ্চাত্য সমাজবিদগণ পূর্ব হতেই এর ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। ড. আকবর আলী খানের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি এ তত্ত্বটিকে বাংলার গ্রামীণ কাঠামোর উপযোগী করে বিশ্লেষণ করেছেন এবং গণধর্মান্তরের উৎস খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন।

খোলাগ্রাম তত্ত্ব মতে- সাধারণত মানব সমাজে দু'ধরনের গ্রাম দেয়া যায়। প্রথমত যূথবদ্ধ গ্রাম (Corporate Village), যা মূলত অনন্য ও শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচালিত; যাতে অর্থনীতি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আইন-শৃঙ্খলা বিস্তৃত ও সুসংহত; সর্বোপরি যে অঞ্চল একক বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বেশ শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত,খোলা গ্রাম (Open Village)। এ গ্রামের অর্থনীতি ও সমাজনীতি খুবই দুর্বল। কোনরূপ শক্তিশালী প্রশাসনিক ক্ষমতার উপস্থিতি নেই; সর্বোপরি একতাবোধ ও সামাজিক যৌথ শক্তির অনুপস্থিতির ফলে বহিরাগতদের প্রতিরোধে নেই কোন পর্যাপ্ত ক্ষমতা।

449217

ড. আকবর আলী খানের মতে-উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গ্রামগুলি যুথবদ্ধ গ্রাম হিসাবে গড়ে ওঠলেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার গ্রামগুলি ছিল Open Village. এ অঞ্চলে খোলাগ্রাম প্রচলিত হওয়ার মূল কারণ ছিল প্রধানত ভৌগোলিক। নদী-নালা, খাল-বিলের ব্যাপকতা; বন জঙ্গলের উপস্থিতি; নদীর গতিপথ পরিবর্তনে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি; নতুন ভূমির জন্ম, ফলে অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু ইত্যাদি কারণে এ অঞ্চলের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল। দৃঢ় কোন সামাজিক সংগঠন ভৌগোলিক কারণেই এখানে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। ফলে এ অঞ্চলে যেমন নতুন অভিবাসীদের ঠেকিয়ে রাখা যেত না, তেমনি নতুন ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক ধারণাও এখানে সহজেই ঠাঁই করে নেয়। আকবর আলী খানের মতে- দক্ষিণ এশিয়ার তুলনায় বাংলার গ্রামে ধর্মান্তরণের কারণে সমাজচ্যুত হবার ভয়ও ছিল বেশ কম।[১১৫] এটাও বাংলার ইসলাম প্রচারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। দৃঢ় সামাজিক সংগঠন ও যুথবদ্ধতার অভাবে নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেও কোন ব্যক্তিকে চড়া মূল্য দিতে হতো না। ফলে নতুনের প্রতি আকর্ষণ কিংবা সুবিধাভোগ নতুবা বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক না কেন মানুষ পূর্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মকে বরণ করে নেয়।

---

[১১৪]. দেখুন- Akbar Ali Khan, ***Discovery of Bangladesh: An Explanation into Dynamics of a Hidden Nation***, Dhaka: University Press Ltd, 1996

[১১৫]. Akbar Ali Khan, ibid, p.113

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য তত্ত্বসমূহ পর্যালোচনায় বলা চলে যে, বাংলায় ইসলামীকরণ কোন দৈব কিংবা আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা কারণে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। এর পেছনে যেমন অভিবাসী সৈন্য, বিজেতা, সুফী সাধক, আলেম, মুবাল্লিগদের ভূমিকা রয়েছে তেমনি রয়েছে এদেশের স্থানীয় জনসাধারণেরও অনন্য ভূমিকা। এছাড়া গণধর্মান্তরের ক্ষেত্রে এখানকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবও ছিল অতুলনীয়। উপর্যুক্ত তত্ত্বগুলোতে এ বিষয়গুলিই উঠে এসেছে প্রামাণিকভাবে। যদিও কোন তত্ত্বই বাংলায় ব্যাপক ইসলামীকরণে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি কিংবা সমালোচনা মুক্ত হতে পারেনি; তবু এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে বাংলায় ইসলামের ক্রমবিকাশে এসব তত্ত্বে বিশ্লেষিত উপাদানগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। মূলত স্থান-কাল ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব মতবাদের কার্যকারিতার পূর্বেও ছিল, এখনও বিদ্যমান। এককভাবে না হলেও সমষ্টিগতভাবে এসব তত্ত্বের বিশ্লেষণই বাংলায় ইসলামের বিকাশের মূল কারণ- একথা বলা যায় অকপটেই।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের ধর্মীয় জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক হতে অন্যতম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যার সংখ্যাধিপক্য এর অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। এর জনসংখ্যা ০১লা জুলাই ২০০৭ তারিখে ১৪২.৬ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ প্রায়।[১১৬] স্বাধীনতার পর হতে এদেশের জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মোট চিত্র তুলে ধরা হলো–

সারণি: ১

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা

সন	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৯৮১	৮৭.১১
১৯৯১	১০৬.৩১
২০০১	১২৪.৩৫
২০০৭	১৪২.৬

সূত্র : Bangladesh Population census 1981, 1991, 2001 সূত্রে প্রাপ্ত; Statistical Year Book 2008. Bangladesh Bureau of Statistics.

আলোচ্য সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে বাংলদেশের জনসংখ্যা ছিল মোট ৮ কোটি ৭১ লক্ষ প্রায়। পরবর্তী ১০ বছরে তা বেড়ে দাড়ায় ১০ কোটি ৬৩ লক্ষতে। এর পরবর্তী ১০ বছরে এ বিশাল জনসংখ্যা আরো ১ কোটি ৮০ লক্ষ বেড়ে যায়। যার বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৮ শতাংশ। পরবর্তীতে ২০০৭ সাল নাগদ এদেশের জনসংখ্যা হয় মোট ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ। বস্তুত বাংলাদেশের জনসংখ্যার এ উর্ধ্বগতি শুধু এক দশকের ফল নয় এবং প্রতি দশকেই এর জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়েই চলেছে।

বস্তুত বাংলাদেশের এ বিশাল জনসংখ্যা নানা ধর্মের লোকদের সমষ্টি। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ আরো নানা ধর্মের লোকদের সহাবস্থানের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যার শতকরা হার নিম্নের সারণিতে প্রকাশ করা হলো।

---

[১১৬] **Statistical Pocket Book of Bangladesh 2008,** ibid, Bangladesh Bureau of Statistics, January 09.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শতকরা হার

	২০০১	১৯৯১	১৯৮১
মুসলিম	৮৯.৫৮	৮৮.৩১	৮৬.৬৫
হিন্দু	৯.৩৪	১০.৫২	১২.১৩
বৌদ্ধ	০.৬২	০.৫৮	০.৬২
খ্রিস্টান	০.০১	০.৩৩	০.৩১
অন্যান্য	০.১৫	০.২৬	০.২৬

সূত্র : Bangladesh Census Report, 1981, 1991, 2001.

সারণিতে নানা সময়ে কৃত বাংলাদেশের আদমশুমারীর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম ও অমুসলিম জনগণের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী ১৯৮১ সালে বাংলাদেশর মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৮৬.৬৫ ভাগ। পরবর্তী দুই দশকে তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যার ফলে ১৯৯১ ও ২০০১ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮৮.৩১ ও ৮৯.৫৮ ভাগ।

অন্যদিকে হিন্দু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এ অনুপাত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ১৯৮১ সালে যা ছিল ১২.১৩ ভাগ। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তা নেমে দাড়ায় ১০.৫২ ভাগে। সবশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী তা আরো নেমে দাড়ায় ৯.৩৪ ভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল ১৯৮১ এবং ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যার ০.৬২ শতাংশ। মধ্যবর্তী ১৯৯১ সালে অবশ্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে ০.৫৮ শতাংশ হয়ে যায়। খ্রিস্টান জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র প্রতিফলিত হয়। ১৯৮১ এবং ২০০১ সালে ০.৩১ শতাংশ থাকলেও ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছিল ০.৩৩ শতাংশে। প্রধান এ চারটি ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যথা- ইহুদী, শিখ, মৈত্র, উপজাতীয় ধর্মাবলম্বীগণ এদেশের মোট জনসংখ্যার সামান্যই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। ১৯৮৯, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ০.২৯, ০.২৬ ও ০.১৫ ভাগ। জনসংখ্যার এ সারণি ও তুলনামূলক বিবরণীতে প্রতীয়মান হয় মুসলিমগণই এদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠী। এছাড়াও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও ভূমিকাও কম নয়। তবে বাকী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যা এদেশের বিশাল জনসমুদ্রে খুবই সামান্য মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বাংলাদেশের ধর্মতাত্ত্বিক জনসংখ্যার চিত্র নিম্নরূপ:

১। ইসলামঃ

বাংলাদেশের প্রধান ও বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগাই মুসলমান। খ্রিস্টীয় ৭ম শতক হতে ১০ম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। যা ১৩ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে ক্রমবিকশিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৩০ মিলিয়ন। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান দেখানো হলো–

সারণি : ৩

বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান (শতকরা হিসাবে)

বিভাগ	মুসলিম জনসংখ্যা
ঢাকা	৯০%
চট্টগ্রাম	৮৪%
রাজশাহী	৮৬.৮৪%
খুলনা	৮২.৮৭%
বরিশাল	৮৮%
সিলেট	৮১.১৬%

সূত্র : http:// en.wikipedia. org/wiki/Islam-in-Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

২। **হিন্দুধর্ম :**

জনসংখ্যার দিক হতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এ ধর্মের লোকদের বসবাস দেখা যায়। হিন্দু বা সনাতন ধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীনতম ধর্ম। আর্যদের আগমনের সাথে সাথে এ ধর্ম বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে ইসলামের আগমনকাল পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে। বর্তমান বাংলাদেশের ৬টি বিভাগে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান নিম্নে দেখানো হলো–

সারণি : ৪

বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী হিন্দু জনসংখ্যার অবস্থান (শতকরা হিসাবে)

বিভাগ	হিন্দু জনসংখ্যা
বরিশাল	১১.৭০
চট্টগ্রাম	১২.৬৫
ঢাকা	১০.৫
খুলনা	১৬.৪৫
রাজশাহী	১২.০৯
সিলেট	১৭.৮০

সূত্র: বাংলাপিডিয়া সূত্রে http:// en. wikipedia. org/wiki/ Hinduism-in-Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

০৩। বৌদ্ধধর্ম :

বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৭ ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস। তবে সিলেট, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেও তাদের দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের দেখানো হলো–

সারণি : ৫

বাংলাদেশে বিভাগওয়ারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান (শতকরা হিসাবে)

বিভাগ	বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা
বরিশাল	<০.০৬
চট্টগ্রাম	১২.৬৫
ঢাকা	০.০৩
খুলনা	<০.০৮
রাজশাহী	০.২৩
সিলেট	০.২০

সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া সূত্রে http:// en.wiki pedia.org/wiki/ Hinduism-in-Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

০৪. খ্রিস্টধর্ম :

আসমানী কিতাবধারী ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম অন্যতম। এটি প্রাচীন বাংলার ধর্মগুলোর অন্তর্গত নয়। ইসলামের ন্যায় এ ধর্মও বাংলাদেশে বহিরাগত ধর্ম হিসাবে প্রবেশ করে। ধারণা করা হয় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে এ ধর্ম বাংলায় বিশেষত চট্টগ্রাম বন্দর অঞ্চলে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে। অত:পর ১৫৯৯ সালে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলায় বাংলাদেশে প্রথম খ্রিস্টধর্মের উপসনালয় বা গীর্জা নির্মাণ করা হয়।[১১৭] পরবর্তীতে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারে এ ধর্ম বাংলায় স্থান লাভ করে। ইংরেজ শাসনামলে বহু খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের আগমন ও মিশানারীদের প্রবেশ এদেশে খ্রিস্টধর্ম বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারী কার্যক্রম শুরু হয় ১৭৯০-এর দশকে। মিশনারী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন উইলিয়াম কেরী ও উইলিয়াম টমাস।[১১৮] খ্রিস্টানগণ বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেননি। ফলে বাংলাদেশের প্রায় সব বিভাগেই তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে সাতক্ষীরা, নাটোর, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৩১ ভাগ।

---

[১১৭] http:// en.wikipedia.org/wiki/ christianity-in-Bangladesh

[১১৮] মোঃ মাহবুবুর রহমান, *নাটোর জেলার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১৪১১, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

০৫. উপজাতীয় ধর্ম:

উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রধানতম রূপ। এদেশে ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের পাশাপাশি উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ৩০টি উপজাতি দল রয়েছে।[১১৯] তন্মধ্যে বৃহৎ চারটি উপজাতি সম্প্রদায় হলো চাকমা, মারমা, টিপরা ও মুরং সম্প্রদায়। এছাড়াও গারো, খাসিয়া, মগ, মনিপুরী, মুন্ডা, ওরাং, সাওতাল, কাছারী, কুকি, হাজং, রাজবংশী ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে বসবাস করে। সাধারণত বাংলাদেশের পাহাড়িয়া ও পার্বত্য অঞ্চল উপজাতীয়দের আবাসভূমি হিসাবে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামেই তাদের বেশি দেখা যায়। এছাড়া সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানেও তাদের বসবাস রয়েছে। ১৯৭১ সালের হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশে উপজাতীয় মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১ মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ প্রায়। তবে বতর্মানে এ জনসংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ।[১২০] উপজাতীয় জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি। ধর্মানুপাতে উপজাতীয় জনসংখ্যার বর্ণনা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপিত হলো–

সারণি-৬

১৯৮০'র দশকের মধ্যভাগে উপজাতীয় জনসংখ্যার ধর্মতাত্ত্বিক শতকরা হার।

ধর্ম	শতকরা হার
বৌদ্ধ	৪৪
হিন্দু	২৪
খ্রিস্টান	১৩
অন্যান্য	১৯

সূত্র: www. bangla2000.com/Bangladesh/People/htm

উপর্যুক্ত সারণি মতে– উপজাতীয় জনগণের একটি প্রধান অংশ (প্রায় ৪৪ ভাগ) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের হার যথাক্রমে ২৪ ও ১৩ শতাংশ। প্রায় বাকী ১৯ শতাংশ উপজাতি জনগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করে থাকে।

[১১৯] http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism-in-Bangladesh
[১২০] http://www.bangladesh.2000.com/Bangladesh /People/htm

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইতিহাসকে উপেক্ষা করে কোন জাতিই বাঁচতে পারে না। ইতিহাসের সোনালী পাতায়ই একটি জাতির জন্ম, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিনির্মান; এর উপরই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ভবিষ্যত জীবনের দিগন্ত প্রসারিত আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন; উন্নতি ও সাফল্যের মন্ত্রে জাতি অনুপ্রাণিত হয় ইতিহাসের শিক্ষা নিয়েই। আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য বর্তমান বাংলাদেশের, যা ১৯৭১ সালের পরবর্তীতে জন্ম লাভ করেছে, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও দাঙ্গার স্বরূপ বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে গবেষণার পূর্ণাঙ্গতার স্বার্থেই বাংলাদেশ পূর্ব এই বাংলা নামক ভূখন্ডের আন্তঃধর্মীয় নানা দিকের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা বর্তমান বাংলাদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা-দর্শন মূলত প্রাচীন বাংলার হাজার বছর ধরে প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত। আর্যপূর্ব কৌম সমাজের চেতনা ও আর্যপরবর্তী জাতিসমূহের ধর্মবিশ্বাস ও মননশীলতাই আজকের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য। সুতরাং গবেষণার প্রয়োজনে এদেশের মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা উপস্থাপিত হলো।

মুসলিম-অমুসলিম ধর্মভিত্তিক এ দু'সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ধারণে স্বভাবতই এ দু ধর্মের অনুসারীদের বিদ্যমানতা আবশ্যক। এপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কের অবির্ভাব ঘটে মূলত ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে, বাংলার মুসলিমদের আগমনের মধ্যে দিয়ে। যদিও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে- বাংলায় ইসলামের পরিচিতি ও আগমন ঘটে এরও বহু পূর্বে, সপ্তম শতক হতে দশম শতকের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও ক্রমবিকাশ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি ধর্তব্য সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করা হয় মূলত মুসলিমদের রাজনৈতিক বিজয়ের পর হতেই। কেননা মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা, প্রভাব ইত্যাদি নিতান্তই অল্প ছিল। মুসলিমদের পৃথক সমাজের কথাতো দূরের কথা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় মুসলিমদের ন্যূনতম অংশগ্রহণও ছিল না। অতএব, মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বাংলায় মুসলিম বিজয় পরবর্তী কাল হতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়ই আলোচনা করা যুক্তিসংগত। এসময়ের প্রায় আট শতাব্দী কালকে (১২০৪-১৯৭১) যুগবিভাগের নানা বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের পরিমাপ অনুযায়ী প্রধানত তিনটি ভাগে করা যায়-

১. সুলতানী আমলের বাংলা
২. মোগল শাসনামলে বাংলা
৩. আধুনিক বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আলোচনায় বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী বিশ্লেষণে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গবেষকগণ বিশেষভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ঘটনার বর্ণনাতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সম্প্রীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের মন মানসিকতা, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষকগণ খুব একটা গবেষণা করেননি। অবশ্য ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এটা সর্বাংশে সত্য। কেননা ইতিহাস মূলতই রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস; বিজিত, শোসিত ও প্রজাশ্রেণীর তুলনায় যাতে বিজয়ী শাসক ও রাজন্যবর্গের বর্ণনাই বেশি লিখিত হয়। এর মূল কারণ সম্ভবত ইতিহাস লিখিত হয় বিজয়ীদের দ্বারাই। অবশ্য রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা সামাজিক ইতিহাস নিরূপণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা রাজনীতিক ও শাসকরা সমাজকে প্রভাবিত করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন; সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতার পূনর্জন্মে তাদের অবদান কম নয়। যাইহোক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে লিখিত হয়নি তা নয়, তবে সংখ্যায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নানা তথ্য প্রমাণ ও বক্তব্যের নিরিখে মুসলিম আগমন পরবর্তী বাংলার প্রধান তিনটি যুগে প্রচলিত মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে অংকিত হলো।

প্রথম যুগ

মুসলিম শাসনাধীন বাংলার প্রথম যুগ ছিল বাংলায় সুলতানদের শাসনামল। যা সুলতানী যুগ হিসাবেও পরিচিত। এর সময়কাল মোটামুটি ১২০৪ হতে ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সমগ্র বাংলা মোগল শাসকদের শাসনাধীন আসার পূর্ব পর্যন্ত এ সময়কালটা ছিল বাংলায় মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ সময়কাল ছিল মূলত মুসলিম সমাজ গঠন ও বিকাশের যুগ।[১] দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধধর্মের ক্রমশ ম্রিয়মানতার উপর দাঁড়িয়ে সেন রাজবংশের হিন্দুধর্ম পূর্ণগঠন ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বাংলা সমাজকে এক অস্থির অবস্থার মুখোমখি করে দেয়। হিন্দু সমাজ কাঠামোর পুণর্গঠন ও বর্ণবিভক্ত সমাজের নবদর্শনে সৃষ্ট বাংলার মিশ্রসমাজ সামাজিক ঐক্য ও সুসংহতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। ফলে এদেশের সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অসংবদ্ধ ও বিশৃঙ্খল। এমন পরিস্থিতিতে বাংলায় মুসলিমদের আগমন ঘটে। সূচনা হয় সুলতানী শাসনামলের। অবশ্য বাংলায় এ শাসন সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসেনি। তথাপিও একথা অস্বীকার জো নেই যে, মুসলিমদের আগমনে নতুন ভাবাদর্শ ও ধর্মের ফলশ্রুতিতে এদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানামুখী সংস্কারের ধারা পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন স্বভাবিক ভাবেই সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।[২] এর ফলশ্রুতিতেই জন্ম হয় বাংলার নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণ। বস্তুত তের শতকের প্রারম্ভে রাজনৈতিক ক্ষমতা

---

[১] Mulhammad Abdur Rahim, ***Social and Cultural History of Bengal*** (1201-1576 A.D) Karachi, Pakistan Historical Society, 1963, p. 413

[২] P.N. Chopra (ed), ***India: Society, Religion and Literature in Ancient and Medieval Period***, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi, 1990, p. 93

Dhaka University Institutional Repository

হারিয়ে বৌদ্ধ সমাজ যখন বিপর্যস্ত এবং সেন শাসনের ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণপ্রথায় হিন্দু সমাজ যখন দ্বিধাভিক্ত ঠিক সে সময়েই বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৩] আর এ সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেন বাংলার আগত মুসলিম সুফী-সাধক, আরব-তুর্কী বণিক ও সুলতানগণ।

সুলতানী শাসনামলে বাংলায় নবাগত ধর্ম ইসলামকে কেন্দ্র করে যে সমাজ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা পূর্ণাঙ্গ অর্থে বিশুদ্ধ ইসলামী সমাজ ছিল না। বরং এতে ভারতবর্ষের আর্যধর্ম ও আর্যপূর্ব ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত নানা ধ্যান-ধারনা, আচারানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষত সর্বভারতীয় লোকজ ধর্ম, বাউল মতবাদ, সহজিয়া মতবাদ ইত্যাদি সুফী-সাধকের অধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি মুসলিম সমাজ ও মানস গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন- "বাঙ্গলা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাটি শরিয়তি অর্থাৎ কোরান-অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তি মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তত নহে। সুফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মুল সুরটুকুর কোন বিরোধ হয় নাই"।[৪] ড. আহমদ শরীফ এ প্রসঙ্গেই লিখেছেন- "বাঙালীর ধর্ম সাধারণভাবে বিশুদ্ধ ইসলাম নয়, মুসলমান ধর্ম যাতে রয়েছে যুগপৎ শরীয়ত ও মারফত, কোরআন-হাদীসের পাশে পীর দরবেশ দরগাহ, মন্ত্র, মাদুলী, তাবিজ , দোয়া , ঝাঁড়-ফুঁক, তুকতাক"।[৫]

এভাবে দেখা যায় যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠনের প্রাক্কালে হিন্দু ও মুসলিমদের সংমিশ্রিত সংস্কৃতিই বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে পরিচালিত হয়। গবেষকগণ নানা উপায় মিশ্র সংস্কৃতির বর্ননা দিয়েছেন। ড. আনিসুজ্জামানের ভাষায়-

> "ইসলামে দীক্ষিত স্থানীয় মানুষেরা আবার তাদের পুরা বিশ্বাস, আচার আচরণ আকঁড়ে থাকে। পুরনো হিন্দু লৌকিক দেবদেবী আগের মতই যথারীতি পূজা পেতে থাকেন। যেমন বসন্তের দেবী শীতলা। হিন্দুদের স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর অনুসরণে মুসলমান সমাজেও লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি হয়। যেমন- ব্রাহ্ম দেবতা, বনবিবি কিংবা জলযানের দেবতা। মাঝে মাঝে হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা একই দেবতার পূজার্চনা করত যেমন সত্যনারায়ণ, যার মুসলমানী নাম হল সত্যপীর"।[৬]

সুনীতিকুমার চট্টেপাধ্যায় লিখেছেন-

> "বাঙালীর পূর্বপুরুষ যখন বৌদ্ধ, হিন্দু মুসলমান এর একটাও ছিলনা। দ্রাবিড়, নিষাদ আর কৈবর্তের আদিম ধর্ম যখন সে পালন করতো তখন সে অলৌকিক শক্তিশালী ধর্মগুরুতে বিশ্বাস করত। এই প্রকার গুরুর মৃত্যুর পরে তার দেহ মাটিতে পুতে তার উপরে মাটি বা পাথরের টিবি সাজিয়ে দিত, সমাজের মঙ্গলের জন্য সপ্তাহে একদিন টিবি পরিস্কার করত। তাতে ফুল দিত, সুগন্ধী দিত, প্রদীপ জ্বালাত। এই

---

[৩] এ কে এম শাহনেওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১১২

[৪] সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১৯৯০, পৃ. ১০

[৫] আহমেদ শরীফ, *বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান-মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২০৩-০৪

[৬] আনিসুজ্জামান, *মনন ও সৃজন: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা, পরিচয় প্রকাশন, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

টিবিকে বলত 'এডুক'। পরে এডুক হল বৌদ্ধের হাতে 'স্তুপ' বা 'চৈত্য', হিন্দু ধর্মাবলম্বীর হাতে সাধু-সন্তের 'সমাধি' আর ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানের হাতে তার রূপ হল বা নামকরণ হল 'পীরের কবর' বা 'দরগা' বা 'আস্তানা'।"[৭]

মুসলিম সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় হিন্দু মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেশ ক'টি উপাদান কাজ করেছে। গবেষকগণ এর স্বরূপ সন্ধানে নানা মত প্রকাশ করেছেন। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হলো- প্রথমত, বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের চিন্তা-চেতনা মন-মানসিকতা ছিল মূলত এদেশীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক। বংশানুক্রমিক বহু বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠেছিলো তাদের মনন ও চিন্তা-চেতনা। এই মানসিকতাই বাংলার মুসলিমদেরকে মিশ্র সংস্কৃতি আকৃষ্ট করেছিল। সুনীতিকুমার বলেন- "বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে মানসিক প্রকৃতিগত মিল পাওয়া যাবে বাঙালী হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানদের সঙ্গে। পাঠান বা তুর্কী বা আরব মুসলমানের সঙ্গে নয়। ধর্মজগতেও সেই একভাব বিদ্যমান। তার বাইরের পোশাকাকে যতই বদলাবার চেষ্টা হোক না কেন।"[৮] অন্য ভাবে বলা চলে বাংলার মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ছিল প্রকট। সে সত্ত্বা উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের চাইতে ভিন্নতর, তবে এ অঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক নিকটতর। ফলে ধর্মের ঐতিহাসিক গোঁড়া মনোভাবের পরিবর্তে আত্মিক মানবতাবোধ বাংলার মানসে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে"।[৯]

দ্বিতীয়ত, অনেক গবেষক মনে করেন যে, ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে না পারার কারণেই বাংলার মুসলিম সমাজ এরূপ মিশ্র কাঠামো পরিগ্রহণ করেছিল। জে. এন. সরকার লিখেন- "ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই এবং অতীতের ধর্মবিশ্বাসকেও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে ধর্মান্তরিত মুসলিমরা দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করিয়া গ্রামঞ্চলে পূর্ব ধর্মবিশ্বাস, দেশাচার ও লোকাচার দ্বারাই পরিচালিত হইত"।[১০]

তৃতীয়ত, ইসলামী ক্ষমতার কেন্দ্র হতে বেশ দূরে অবস্থান করায় ভৌগোলিক কারণেও এ মিশ্র সমাজ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। অধ্যাপক সরকার বলেন-

> "বঙ্গ দেশের মুসলমানগণ ইসলামের কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং মুসলমান বিজেতারা এই অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতিসমূহের সম্মুখীন হন। বহিরাগত ও বিজেতা মুসলমানেরা বঙ্গদেশে সংখ্যালঘিষ্ট ছিলেন ও শত্রুভাবাপন্ন জনসাধারণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের বৈরী মনোভাব দূর

[৭] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

[৮] A.F. Salahuddin Ahmed, *Aspect of Bengali Society and Social Thought: Tradition and Transformation*, The Dheke University Studies, XXXVIIF, Dec. 1982, p. 161-162

[৯] জগদীশ নারায়ন সরকার, *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগে)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩৮বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২

[10] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

করিতে ধর্মান্তরকরণ অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। স্বভাবতই স্থানীয় লোকাচারের সহিত একটি আপাষের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়"। [১১]

চতুর্থত, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়াও এ মিশ্র সমাজ কাঠামোর জন্য অনেকাংশে দায়ী। ইমরান হোসেন বলেন- "এদেশের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন শুধুমাত্র ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়। এর পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণও নিহিত ছিল, ফলে ধর্মমত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের বদল হয়নি এবং পূর্বকালের অনেক সংস্কার তাদের মধ্যে অক্ষুন্ন ছিল"।[১২]

পঞ্চমত, হিন্দু মুসলিম সমন্বিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রধানত দায়ী ছিলেন এদেশে ইসলাম প্রচারক সুফী-সাধক, পীর দরবেশের একাংশ। এদেশের সুফী সাধকগণ মূলত দুইভাগে বিভক্ত। যথা- বা-শরা সুফী অর্থাৎ যারা ইসলামী শরী'আত অনুসরণ করতেন একনিষ্ঠভাবে। আর অপর দল ছিলেন বে-শরা সুফী। যারা শরী'আতের বিধানবলী পালনের তুলনায় আধ্যাত্ম সাধনা ও ধ্যান মগ্নতাতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এ দ্বিতীয় প্রকারের সুফীসাধকগণই মুলত এ মিশ্রকালচার প্রবর্তনের মুল কারিগর। এদেশীয় সহজিয়াবাদ, বৌদ্ধবাদ, বৈষ্ণব মতবাদ ইত্যাদির অনুসারীগণ ইসলাম গ্রহণ করিলেও এতদিনের আচরিত ধর্ম ত্যাগ করেনি। এরা জাতিতে মুসলমান হলেও ধর্মে সহজিয়াই রয়ে যায়। এরাই ছিল বাংলার বে-শরা ফকিরদের আদিরূপ।[১৩] বে-শরা সূফীদের এমতবাদ স্থানীয় ভক্তিবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, বাউল ধর্ম, পীরপূজা, গোরপূজা, সত্যপির, বনবিবি, গাজী খাঁ, দক্ষিণরায় প্রমুখের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজার্চনা ইত্যাদির সাথে একধরনের উৎপত্তিগত ও তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য বিধানে ও বাংলার মুসলিম মানসে শুদ্ধ ইসলামী চেতনা জাগ্রতকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সুলতানী আমলের মুসলিমদের এই ধর্মবিশ্বাসকে গবেষকগণ 'ফোক ইসলাম', 'পপুলার ইসলাম' 'লৌকিক বা লোকায়ত ইসলাম' নামে নামকরণ করেছেন।[১৪] অবশ্য তৎকালীন মুসলিম সমাজ সংস্কৃতি যে একেবারেই অমুসলিম সংস্কৃতিতে মিশে গিয়েছিলে তা কিন্তু নয়। বরং ইসলাম নিজ শক্তিতে এ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সুলতানগনের পৃষ্ঠপোষকতা ও বা-শরা সুফীদের কর্মতৎপরতা ইসলামের মূল আদর্শ ধরে রাখতে সহায়তা করেছিল। ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলার ধর্মসমূহের একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলাম প্রবল প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হয় এবং নিজস্ব মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়-এ অঞ্চলে উদার ও সহনশীল মানসিকতার কারণে ধর্মসমূহের মধ্যে সর্বদাই পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর্যধর্ম হিন্দুগণ যেমন আর্যপূর্ব কৌমদের আচার-অনুষ্ঠান,

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[১২] ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবি, চিন্তা ও কর্ম*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬

[১৩] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলা বাউল ও বাউল গান, কলিকতা, ১৩৮৮, পৃ-২৭৩

[১৪] Rafiuddin Ahmed, ***The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Identity***, Delhi, 1981, Chapters III & IV, p. 124,165

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছে। তেমনি পরবর্তীতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখসহ অন্যান্য মতবাদও হিন্দুধর্মের আকর্ষণ হতে বাইরে যায়নি। তবে ইসলামের ব্যাপারে এ বিষয়টি ব্যতিক্রম। সামাজিক জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলাম স্থানীয় প্রথা ও ইতিহাসের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হলেও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস ও অবশ্য পালনীয় ধর্মাচারগুলোতে স্থানীয় রীতিনীতির অনুপ্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল সবসময়। এর মূল কারণ ছিল স্থানীয় ধর্মাদর্শনের সাথে একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের আদর্শগত বিস্তর পার্থক্য। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন-

> "হিন্দু ধর্ম ইসলামকে নিজস্ব করিয়া, মুসলমান জাতিগুলিকে হযম করিয়া ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করিতে পারিল না। কারণ, ইসলামের মুলমন্ত্র একেশ্বরবাদ। কোরানে আছে- অপবিত্র কেহই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বহুদেব উপাসকগণ আপবিত্র। এইজন্য হিন্দু সমাজ ইসলামকে গ্রাস করিতে পারিল না"।[১৫]

একনিষ্ঠ মুসলিমদের বর্ণনা করে ড.পঞ্চানন সাহা লিখেছেন "নৈতিক ইসলামপন্থীদেরও অভাব ছিল না এদেশে। কোরান হাদিসের নির্দেশ মেনে চলত এমন মুসলমানের সংখ্যাও বাংলাদেশে নেহাত কম ছিল না। অনেকেই রমজানের রোজা পালন করত"।[১৬]

প্রকৃতপক্ষে সুলতানী আমলে বাংলার মুসলিম সমাজ ও ধর্মবিশ্বাস ছিল একদিকে স্থানীয় ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত, অন্য দিকে ইসলামের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব মুসলিমদেরকে আলাদা করে রেখেছিল অন্য সম্প্রদায় হতে। এ উভয়বিধ অবস্থা শুধুমাত্র বাংলার সুলতানী আমলেই প্রচলিত ছিল না বরং বিংশ শতাব্দীতেও এ মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বাংলাদেশও এর প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। আচার্য সুনীতিকুমার লিখেছেন- "যদিও বাঙালী জাতির অর্ধেকের উপর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহা লক্ষ্যনীয় বা অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি বাঙালী মুসলমানের জীবনেও কার্যকর হয় নাই"।[১৭] ১৯০৯ সালে Imperial Gazetter এর উদ্বৃতি দিয়ে ড. পঞ্চানন সাহা উল্লেখ করেছেন-"It was untill recent by, the regular practice of low class Muhammedans to join in the Durga Puja and other Hindu festivals".[১৮] আসহাবুর রহমান লিখেন-"বাংলাদেশে কৃষকদের মাঝে উনিশ শতক পর্যন্ত অর্থোডকস ইসলামের প্রভাব ছিল একেবারেই অকিঞ্চিতকর। কৃষি সম্পর্কিত আদিম যাদু বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে এক অস্পষ্ট ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ছিল তাঁদের আচরিত ধর্ম। একে লৌকিক ইসলাম বলা যেতে পারে"।[১৯]

---

[১৫] যদুনাথ সরকার, *ভারতে মুসলমান*, কলকাতা, প্রবাসী, ১৩৩৭, পৃ. ৫৪
[১৬] ড. পঞ্চানন সাহা, *হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১, পৃ.৪৩
[১৭] সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[১৮] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
[১৯] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিজয় পরবর্তী সুলতানদের ধর্ম চেতনা ও মনমানসিকততেও মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের নিগূঢ় ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাস পর্যালোচনায় অনেক গবেষকই মনে করেন যে বাংলার প্রাথমিক যুগের সুলতানগণ ধর্মের ব্যাপারে রক্ষণশীল চিন্তা-চেতনা পোষণ করতেন। মুহাম্মদ বখতিয়ার, আলী মর্দান বা সুলতান ইলতুত্মিশের কেউই বাঙালি হিন্দু সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে বৈধতা কামনা করেননি। বরং নতুন শাসকরা বাহুবলে বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছেন।[২০] বস্তুত গবেষক, ঐতিহাসিকদের এ ধারণার জন্য দায়ী সুলতানদের কর্তৃক মুদ্রা, শিলালিপি ও ধর্মীয় স্থাপনা নির্মান। মুদ্রায় সুলতানদের নাম, সন, কলিমা খোদাই, খিলাফাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদিতে আরবি ভাষায় ব্যবহার গবেষকগণকে সুলতানগনের রক্ষণশীল মনমাত্রসিকার পরিচয় প্রদান করে। বস্তুত মুদ্রা ও শিলালিপিতে আরবীয় ব্যবহার সুলতানদের মনমানসিকতার প্রকৃষ্ট ধারনা প্রদান করেনি। বরং এটা ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিজয়ের স্মারক স্বরূপ। বিজয়ীদের দ্বারা এরূপ স্মারকের প্রচলন গোটা বিশ্বেই প্রচলিত ছিল। তাছাড়া বাংলার সুলতানগণ সমকালীন বাংলার প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে তাদের এ দেশীয় রীতিতে প্রভাবিত হয়ে নিজস্বতা প্রকাশের সুযোগ ছিল না।[২১] অধিকন্তু চতুদর্শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিষয়গুলোতে আরবীর পরিবর্তে পারসো ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার শুরু হয়।[২২]

এতদ্ব্যতীত মুদ্রা ও শিলালিপিতে ইসলামী ঐতিহ্যের বিপরীত নানা নির্দশনও পাওয়া গেছে, যা সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতার পরিচায়ক। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ জয়ের পর সে স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন তাতে এক পিঠে রয়েছে অশ্বারোহী মূর্তি হাতে রাজদন্ড নিয়ে ঘোড়া ছুটাচ্ছে। চিত্রের নিচে লিখা ছিল গৌড় বিজয়। তাও আরবীতে নয়, বরং কথিত হিন্দুয়ানী ভাষা সংস্কৃতে।[২৩] এছাড়াও আলী মর্দান খিলজীর স্বর্ণমুদ্রায় অশ্বারোহী মূর্তি; নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ ও জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের মুদ্রায় সিংহমূতি, জালালুদ্দিন ফতেহ শাহের মুদ্রায় সাতরশ্মি সংযুক্ত সূর্যের প্রতিকৃতি লক্ষনীয়।[২৪] বস্তুত প্রাণীদেহ অংকন ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। এতদ্সত্ত্বেও সুলতানগণ এদেশীয় সংস্কৃতিকে তাঁদের ঐতিহ্যসিক উপাদানে সংযোজিত করেছিলেন। মুদ্রা ও শিলালিপিতে কলিমা খোদাই, খিলাফাতের মর্যাদা ও পরিচয় প্রদান, আরবী হরফের ব্যবহার যেমন একদিকে তাদের মুসলিম পরিচয়কে প্রকাশ করে, তদ্রুপ অন্যদিকে চিত্র ও প্রতীক সহনশীলতা, সম্প্রীতির নিদর্শন হিসাবে ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

অবশ্য সুলতানী আমলের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গবেষগণ সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতা বিষয়টিই নিশ্চিত করেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সহ সকল ক্ষেত্রেই

---

[২০] রিচার্ড এম ইটন, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ (১২০৪-১৭৬০)*, অনু-হাসান শরীফ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৫৯

[২১] এ কে এম শাহনাওয়াজ, মুদ্রার ও শিলানিজিতে, প্রাগুক, পৃ-১৫৫

[২২] রিচার্ড এম ইটন, (অনু-হাসান শরীফ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[২৩] Nicholas W. Towick, ***The Horseman Type of Bengal and the Question of Commemorative Issue,*** Journal of the Numismatic Socity of India, 1973, p. 196-208

[২৪] এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানগণ মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমদেরকেও সুযোগ করে দিতেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় যার অসংখ্য প্রমাণ বিবৃত। বাংলার সুলতানদের নানা দপ্তরে অমুসলিমগণ জায়গা লাভ করেন। প্রশাসনিক কাঠামোতেও তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে একীভূত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাজা গনেশের উত্থান উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে তিনি স্বীয় পুত্র যদুকে সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ নামকরণ করেন। মুসলিম হিসাবে দেশ পরিচালনা করেন বলেও ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।[২৫] সুলতান জালাল উদ্দিন এদেশের হিন্দু মুসলিম মিলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মুদ্রায় এতদুভয় ধর্মের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। মুদ্রার একপিঠে তিনি লিখেন 'খলিফাতুল্লাহ' ও অপর পিঠে চন্ডী বা দূর্গার বাহনের প্রতিকৃতি অংকন করেন।[২৬]

বাংলা সালতানাতের স্বর্ণযুগেও অমুসলিমগণ নানা রাজকীয় কার্যে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি তারা উচ্চপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান দেহরক্ষী, টাকশালের গর্ভনর, চট্টগ্রামের গভর্নর, ব্যক্তিগত চিকিৎসক, ব্যক্তিগত সচিব (দবির-ই-খাস) সবাই ছিলেন বাঙালী হিন্দু।[২৭] সালতানাতের কাজে অমুসলিমদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, গোঁড়া সুফী মাওলানা শামস বালখি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কাছে লেখা এক পত্রে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন- "পরাজিত অবিশ্বাসীরা মাথা উঁচু করে তাদের মালিকানাধীন এলাকার প্রশাসন চালাতে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। কিন্তু ইসলামী ভূখন্ডে মুসলমানদের উপরেও তাদেরকে (নির্বাহী) কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং তারা তাদের উপর বিধি নিষেধ জারী করছে। এ ধরনের কাজ হতে দেওয়া উচিত নয়।"[২৮] চিঠির বক্তব্য যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন এটি তৎকালীন হিন্দু তথা অমুসলিমদের রাজকার্য সম্পাদনে আসীন থাকার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতাতেও সুলতানগণ ইসলামী ও স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। সুলতানী আমলে নির্মিত মসজিদ, সমাধি ও নানা স্থাপনা এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এসময় তুর্কী, পারস্য ও আরবীয় স্থাপত্যকলার সাথে দেশী ঐতিহ্য ও স্থাপত্যকলার মিশ্রণ ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। অবশ্য কোন কোন স্থানে মধ্য প্রাচ্য বা উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসরণও লক্ষ্যনীয়। অষ্টম শতকের প্রাচীন বাংলার টেরাকাটা (পোড়ামাটি) অলংকরণ রীতি, যা মূলত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মঠে দেখা যায়, সুলতানদের হাতে আবার পূর্ণজীবন লাভ করে। গ্রাম বাংলার কুঁড়ে ঘরের আদলে বাঁশের কাঠামোতে স্থাপনা নির্মাণও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মানানরই প্রকাশ।[২৯] সুলতানদের দ্বারা দেশীয় ঐতিহ্যের এই নবজাগরণ পরবর্তীতেও অক্ষুন্ন থাকে।

---

[২৫] গোলাম হুসাইন সলিম, রিয়াদুস সালাতীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[২৬] রিচার্ড এম ইটন, (অনু হাসান শরীফ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[২৭] Jadunath Sarker (ed), ***The Histgory of Bengal***, Vol-2, Mushim Period, 1200-1757, Patna: Janaki Prakashan,1977, p.151-152.

[২৮] রিচার্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অমুসলিম-মুসলিমদের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা সুলতানী আমলের প্রধানতম অবদান। ভাষা-সাহিত্যে আন্তঃধর্মীয় সংমিশ্রণের সূচনা ঘটে সুলতানী আমলেই, যার সফল বিকাশ ঘটে মোগল আমলে। বস্তুত বর্তমান বাংলা ভাষার প্রাণ-প্রাচুর্যে সুলতানী আমলের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার সুলতানদের মূলভাষা ছিল আরবী, ফাসী বা তুর্কি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাননি। বরং রাজদরবারে পারসী ভাষার প্রচলন থাকলেও বাংলাই ছিল সার্বজনীন ভাষা।[৩০]

সুলতানগণের সময়েই সংস্কৃতের দুহিতা বাংলা ভাষা রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করে। ফলে মুসলিম হিন্দু সর্বসাধারণের নিকটই এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সুলতানগণ তাদের কতৃত্বের মূল আরো বিস্তৃত করার দৃশ্যমান লক্ষ্যে চিরায়ত ভারতীয় ধ্যান-ধারনা ত্যাগ করে তাঁরা লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, জনপ্রিয় সাহিত্যগুলো সংস্কৃতির বদলে বাংলায় লিখাতেন।[৩১] বস্তুত তাদের পৃষ্টপোষকতাতেই বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগে গতিশীলতা লাভ করে। সুলতানগণ শুধু যে ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তা নয়, বরং রোমান্টিক, প্রনয়োপাখ্যান রচয়িতা কবি সাহিত্যিকগণও সুলতানদের সুনজরে ছিলেন। এমনকি হিন্দুদের ঐতিহাসিক বিবরণ, দেব-দেবীর পৌরানিক কাহিনী রচয়িতারাও এরূপ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। সুলতান হোসেন শাহের প্রশংসায় বিজয়গুপ্ত লিখেন-

"সুলতান হোসেন রাজা বিশ্বের প্রতিপালক-
যুদ্ধে তিনি অপ্রতিরোধ্যঃ প্রতিপক্ষের কাছে তিনি যম,
দানে তিনি কল্পতরু,
সৌন্দর্যে তিনি কাম (ভালবাসার দেবতা),
তার প্রজারা তার শাসনে আনন্দে থাকে।[৩২]

সুলতানগণের এ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আরবী, ফারসী ভাষার সাথে সংস্কৃত বাংলার মিলনঘটে। ফলে ভিনদেশি গ্রন্থ সাহিত্যের সৌন্দর্য অবলোকন করা সম্ভব হয়। সুলতানগণ অনুবাদ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এসময় অনুবাদ সাহিত্য জনপ্রিয় ওঠে। তুর্কী বিজয়ের একেবারেই শুরুতেই অমৃতকুন্ড নামের তান্ত্রিক যোগসাধনা সম্পর্কিত একটি পুস্তক ফারসি ও আরবীতে অনুবাদ হয়ে প্রচারিত হতে থাকে। অনূদিত পুস্তকের ভাষ্য অনুযায়ী- সংস্কৃতিতে লেখা মুল অমৃতকুন্ড লিখেছিলেন কামরূপের এক ব্রাহ্মণ যোগী। তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর পুস্তকটি লক্ষ্মৌতির প্রধান কাজ

---

[৩০] Ma Huan, Ying-Yain Sheng-lan: "The Overalll Surkey of the Ocean's Shores" trans. J.V.G Mills, Cambridge University Press, 1970, p.161

[৩১] রিচার্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[৩২] বিজয়গুপ্ত, *পদ্ম পুরান*, সম্পাদনা জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬২, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

রোকনুদ্দিন সমরকান্দিকে উপহার দিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, কাজিই পুস্তকটির প্রথম আরবি ও ফারসি অনুবাদ করেছিলেন।[৩৩]

শুধু অনুবাদ সাহিত্যই নয় আরবি, ফারসি সাহিত্যের যথার্থ বিষয়বস্তু, কাহিনী, রচনা পদ্ধতি, বিষয় বিন্যাস ইত্যাদিও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এগুলোর সার্থক প্রয়োগ করেছেন বাংলার হিন্দু মুসলিম এ দু'সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকরা। অমুসলিম কবিগণ মুসলিম কবিদের তুলনায় কোন অংশেই বৈষম্যের শিকার হতেন না। বস্তুত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সুলতানগণ ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যেমন-সুলতান রোকনুদ্দিন বারবক শাহ মালাধর বসু'র শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের রাজদরবার বিজয়দাসের মনসা মঙ্গল, বিজয় পন্ডিত ও কবিন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের বাংলা অনুবাদ ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেন।[৩৪]

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুলতানদের প্রশস্তিসূচক নানা স্তবক সেসময়কার সাহিত্যসাধনায় তাঁদের আন্তরিকতারই প্রমাণস্বরূপ। অসংখ্য কাব্য পংক্তি হতে এখানে উপমা স্বরূপ মাত্র দু'একটিই উপস্থাপন করা হলো। পরধর্ম সহিষ্ণুতার জন্য 'বাংলার আকবর' নামে খ্যাত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের প্রসঙ্গে কবিন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ লিখেন-

'নৃপতি হোসেন শাহ যে মহিমতি।
পঞ্চম গৌড়ের যার পরম সুখ্যাতি।।
অস্ত্রশাস্ত্রে সুপন্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার।।[৩৫]

পারসো-ইসলামী রোমান্টিক সাহিত্য বাংলা ভাষায় স্রেফ অনুবাদ না করে এসব কবিগণ আরো অগ্রসর হয়ে পারসো ইসলামী সভ্যতার পুরো ব্যাপ্তিকেই বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়েছেন।[৩৬] ষোড়শ শতকের সাহিত্য ভাষায় আমরা আরবী ও সংস্কৃত শব্দের বিকল্প ব্যবহারেরও প্রমাণ পাই। বিশেষ করে আল্লাহকে গোঁসাই, প্রভু, নিরঞ্জন, ঈশ্বর, জগদীশ্বর, অবতার ইত্যাদি শব্দে প্রকাশের ধারাও ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হিন্দুদের ন্যায় মুসলিম কবিসাহিত্যিকগণও সংস্কৃত বাংলা ভাষা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আজিজুর রহমান মল্লিক বলেন-"সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলার মুসলিম লেখকগণ হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে

---

[৩৩] রিচার্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
[৩৪] রিচার্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪, ৯৫
[৩৫] ড. পঞ্চনন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
[৩৬] রিচার্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। হিন্দু পুরান, তাদের আচার নীতি এবং বিশ্বাস মুসলমানদের উপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত হিন্দু মুসলিম ভাবাদর্শের এই সম্মিলনীর প্রয়াস ঊনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।"[৩৭] কবিগণ রাধাকৃষ্ণের মিলনকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাথে তুলনা করেছেন তাদের সাহিত্যে। তাছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে, বাউল ও সহজিয়া সাহিত্য, লোকগান ইত্যাদিতেও মুসলিম কবিদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এরকম ১২১ জন মুসলিম বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি ও ৬০০ শতাধিক বৈষ্ণব পদ সংখ্যার উল্লেখ করেছেন।[৩৮] ক্ষিতি মোহন সেন লিখেছেন,

> "বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমান সাধনায় কম যোগ হয় নাই। বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি তো আছেনই। তাহা ছাড়াও মহাভারত, রামায়ন প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে মুসলমান উৎসাহদাতার অভাব নাই। তাহার উপর আউল-বাউল দরবেশদিগের অপূর্ব সংগীত সাহিত্যে আগমনী প্রভৃতি গানেও গোলাম মৌলা প্রভৃতির সব অপূর্ব গান আছে। বাউলদের মধ্যে তো হিন্দু মুসলমান কোন ভেদই নাই। লালন, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেকে জাতিতে মুসলমান।[৩৯]

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহিত্য সাধনা এদের মধ্যকার সম্প্রীতিরাই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে এ অবস্থা সুলতানী আমল ছাড়িয়ে মোগল শাসনামলেও প্রচলিত ছিল। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে সাহিত্য ক্ষেত্রে এ সম্প্রীতি অনেকটা ঘোলাটে হয়ে আসে। এক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের বিভেদনীতি অনেকাংশেই দায়ী। ড. মল্লিক বলেন- "ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মুসলিম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী মতাদর্শের সুম্মখে ওহাবীরা যখন ইসলাম প্রচারে দ্রুত ভূমিকা গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই এ পরিবর্তন সূচিত হল।"[৪০]

---

[৩৭] ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৪

[৩৮] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[৩৯] ক্ষিতিমোহন সেন, *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ. ২৮

[৪০] ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় যুগ ঃ

বাংলার মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক নিরূপণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যুগবিভাগ হলো মোগল শাসনাধীন বাংলা। সুলতানী আমলের পরিসমাপ্তিতে ও উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় বাংলাতেও এক নবযুগের সূচনা ঘটে। বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে।

বাংলার মোগলদের পূর্ণাঙ্গ বিজয়কাল মোটামুটি পৌনে একশত বৎসর (১৫৩৭ হতে ১৬১২ পর্যন্ত)। যদিও ১৫৭৪ সালের ২৫শে[৪১] সেপ্টেম্বর মোগল বাহিনী বিজয়ী হিসাবে বাংলার রাজধানীতে উপনীত হয়। তথাপিও একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে- বাংলা মোগলদের পরিপুর্ণ তত্ত্বাবধানে আসে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে। বাংলার রাজনীতিতে মোগল ও পূর্ববর্তী সুলতানদের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিশেষত ষোড়শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত মোগল শাসকরা ছিলেন অভারতীয়। পরবর্তীতে ভারতীয়দের অধিপত্য বিস্তার লাভ করলেও তা ছিল মূলত উত্তর ভারতীয়দেরই দখলে। এজন্যই বাংলা সম্পর্কে মোগলদের খুব একটা ভাল ধারণা ছিল না। তাদের কাছে উত্তর ভারত ও দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বাংলা ছিল পরদেশ। এমনকি বাংলার বদ্বীপ ও আবহাওয়া তাদের জন্য উপযোগী ছিল না বলেই জানা যায়।[৪২] অনেক সময় দেখা যায় কোন কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যকে শাস্তিস্বরূপ বাংলার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হত।

তবে মোগলদের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের সাথে বাংলার যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়ার এখানে অভিবাসীদের ঢল নামে। এদের মধ্যে ছিল সৈন্য-সামন্ত, মোগল প্রশাসনের কর্মকর্তা, কর্মচারী, কেরানীবৃন্দ, সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগর সম্প্রদায় ও সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ী বণিকগণ। এর ফলে বাংলা কথিত বহিরাগতদের কলোনীতে পরিণত হয়।[৪৩] যা ছিল বাংলার দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুরোপুরি বিপরীত। বসবাসের জন্য অনুপুযুক্ত মনে করলেও মোগলদেরকে রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হয়েই বাংলায় আসতে হয়। বাংলায় মোগলদের আগমনের মূল কারণ সম্ভবত আর্থিক। সাম্রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলা আগমনকে মোগলদের দূরদর্শিতা হিসাবেই ধরা হয়। তাছাড়া ভৌগলিকভাবে নিরাপদ অবস্থানে থাকায় মোগল সম্রাটগণ বাংলাকে তাদের সীমান্ত হিসাবে ব্যবহার করার রাজনৈতিক ফায়দাটুকুও গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় মোগলদের প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেকটা সুলতানদের প্রচলিত প্রথামতই ছিল। হিন্দু মুসলিমদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে মোগলগণ সুলতানদের অপেক্ষাও বেশি উদার ছিলেন। মোগল শাসনাধীন বাংলার প্রশাসন যন্ত্রে অমুসলিমদের সংখ্যা ও প্রভাব এরই প্রমাণ দেয়। আকবরের শাসনকালে

---

[৪১] রিচর্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[৪২] Abul Fazal Allami, ***Akbarama,*** ed Abdul Rahim, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873-87, 3:401; trans by-Henry Bevridge under the title 'the Akber Nama of Abul-Fazal (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1897), 1921, 3:594

[৪৩] রিচার্ড এম. ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

'সুবাহ-ই-বাংলা' তথা বাংলার গভর্ণর বা সুবেদার ছিলেন মানসিংহ। যিনি ১৫৯৪-১৬০৬ পর্যন্ত বাংলার মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৪৪] মোগল সম্রাট শাহাজাহান ছিলেন পরধর্ম সহিষ্ণু শাসক। তাঁর প্রশাসনেও বাংলায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমান অংশগ্রহণ ছিল। তাঁর ন্যায়বিচার ও প্রজাহিতৈষী শাসন সম্পর্কে জগৎমঙ্গল কাব্যে কবি গঙ্গাধরের রচিত বেশ কিছু প্রশস্তি বাণী লক্ষ্যনীয়।[৪৫] মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু ও মুসলিমদের নিকট জিন্দাপীর নামে খ্যাত আওরঙ্গজেবকে অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ হিন্দুদের প্রতি নির্যাতনকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ মূল্যায়ন যথার্থ নয়। কেননা আওরঙ্গজেবের প্রশাসনের পাশাপাশি সৈন্যবাহিনীতেও প্রচুর অমুসলিম বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি প্রচুর জায়গা জমি দান করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৬]

বাংলার পরবর্তী শাসকের সময়েও এ ধারনা অব্যাহিত ছিল। বিশেষ করে আলীবর্দী খানের শাসনামলে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু প্রভাবই ছিল বেশি। তাঁর প্রশাসনের প্রায় সব পদগুলোই ছিল হিন্দুদের দখলে। ব্রিটিশ গবেষক রবার্ট ওরম এক তথ্যে দেখিয়েছেন যে, ১৭৫৪ সালে আলীবর্দী খানের প্রশাসনের সাতটি গুরূত্বপূর্ণ পদের (যেমন দিওয়ান, তুন-দিওয়ান, সাব-দিওয়ান ও বক্সী, রাজস্ব গ্রাহক ইত্যাদি) ছয়টিই ছিল হিন্দুদের অধিকারে। একমাত্র মুসলিম বক্সী ছিলেন মীর জাফর।[৪৭] পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনপূর্ব বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীও ছিল এদেরই নিয়ন্ত্রণে। প্রকৃতপক্ষে মোগল রাজনীতিতে বাংলার অমুসলিমদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। আর স্বভাবতই বাংলার সমাজ জীবনকেও তা প্রভাবিত করে রেখেছিল।

মোগল প্রশাসকগণ ধর্মীয় নীতিতেও ছিলেন খুবই উদার মানসিকতা সম্পন্ন। তাদের মূলনীতি ছিল অমুসলিম ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করার নীতি। তাদের মতে অমুসলিমগণও নিজ নিজ ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। বাংলায় সুলতানদের ন্যায় মোগলগণ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করতেন না।[৪৮] তাদের নিকট বাংলায় ধর্ম ও রাজনীতি ছিল পরস্পর পৃথক দুটি দিক। মোগল সুবাদার ইসলাম খান বাঙালিদের ধর্মান্তরকরকে নিরুৎসাহিত করার জন্য পরিচিত ছিলেন এবং এবং এক ঘটনায় জনৈক বাঙালি হিন্দুকে ধর্মান্তরের জন্য তিনি তার এক মুসলিম কর্মকর্তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন।[৪৯] অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও ধর্মীয় সম্প্রীতির আরো একটি নজির আমরা দেখতে পাই সে সময়কার

---

[৪৪] Lipi Ghosh, ***Hindus-Muslim Syncretism in Indian History: A study of Bengal Scenario***, Bangladesh Historical Studies Vol. XVIII, 1999-2000, p.144

[৪৫] Md. Nurur Rahman, ***Hindu Muslim Relationship in Bengal Under Mughal Rule***, Henceforth Research Transactions, Vol. I, 1996, Asiatic Society, Calcutta, p. 33

[৪৬] M. Mohiuddin, ***The Elements of Composite Culture***, in R. Khan (ed), Composite Culture in India and National Integration, Shimla, 1987, p.101.

[৪৭] Lipi Ghosh, Ibid, p.145

[৪৮] রিচার্ড এম ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

[৪৯] প্রাগুক্ত ,পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

মন্দির নির্মাণের তালিকা হতে। মোগল শাসনের সূচনালগ্নে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু সভ্যতা খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় মোগল ও হিন্দু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মন্দির নির্মিত হয়। রিচার্ড এম ইটন তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে- ১২০০ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলায় যেখানে মাত্র ১৮৮টি মসজিদ নির্মিত হয়। সেখানে ১৫৭০ সাল হতে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৯০ বৎসরে ইটের তৈরী মন্দির নির্মিত হয় ২১৯টি।[৫০] অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী মন্দিরের চিত্র এ গবেষণায় আনা হয়নি। বস্তুত মোগল সম্রাটদের ধর্মীয় ও পরধর্মসহিষ্ণুতার এরচেয়ে ভাল উদাহরণ আর হতে পারে না।

স্থানীয় অধিবাসী ও মোগলদের পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন গভীর ছিল না। কেননা বাংলার পূর্বতন সুলতানদের ন্যায় মোগলগণ এদেশীয় ছিলেন না। অতএব, স্বভাবতই তাদের চলাফেরা ছিল সীমাবদ্ধ, সমাজ সংস্কৃতি ছিল নির্দিষ্ট; ভিন্ন গন্ডীতে আবদ্ধ। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাদি ব্যতীত অন্যান্য কাজে জনসাধারণের সাথে তাদের তেমন যোগাযোগ ছিল না। ফলে দেখা যায় যে, সুলতানী আমলে বাংলার সমাজে আন্তঃধর্মীয় যে হাওয়া ও পরিবেশ চালু ছিল তা খুব একটা পরিবর্তন হয়নি মোগল আমলেও। তবে মোগলদের নানা নীতিমালা সমাজ জীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মোগলদের প্রধান নীতি ছিল বাংলায় প্রচলিত হিন্দু ও স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করা। অর্থাৎ যেরূপ সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার পরিবর্তন না ঘটানো। এক্ষেত্রে বাংলা বিজয়ের সময় আকবর কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন তিনি ও তার উত্তরসূরীরা তাদেরকে (বাঙালিদের) তাদের নিজস্ব নিয়ম ও ঐতিহ্য বহাল রাখতে দেবেন।[৫১] আকবরের এ ঘোষণা পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। গবেষক ইটন অগাস্টিয়ান সন্ন্যাসী মানরিকের একটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এ ঘটনায় দেখা যায় যে, একটি হিন্দু এলাকায় ময়ূরকে জবাই করার কারণে একজন মুসলিম শাস্তি পায়। আর এর শাস্তিদাতাও ছিলেন একজন মুসলিম।[৫২] আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সামাজিক জীবনে স্থানীয় আচার অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের মোগল নীতিকে সমর্থন করে। মোগল কর্মকর্তাদের একটি মিশ্রদলের শপথ গ্রহণের জন্য একটি কুরআন ও একটি শালগ্রাম আনা হয়। কুরআন হতে মুসলিমগণ আল্লাহর নামে শপথ করেন, আর শালগ্রাম হতে হিন্দুগণ বিষ্ণুর নামে শপথ করেন।[৫৩] বস্তুত এ দু'টি ঘটনা শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ। এরূপ আরো বহু ঘটনা মোগল সাম্রাজ্যের শাসনাধীন বাংলার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যা বাংলায় মোগলদের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতার অনুপম দৃষ্টান্তস্বরূপ।

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪ ও ২৭
[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২৪
[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনপূর্ব বাংলার মুসলিম শাসনামল ছিল মুসলিম অমুসলিমদের জন্যই প্রকৃতই এক সম্প্রীতির যুগ। রাজনৈতিক কারণে হয়তো অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম শাসকদের নির্যাতনের দু'একটি ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু সমগ্র বাংলার পরিস্থিতি এরূপ ছিল না। বরং এগুলো ছিলো ব্যতিক্রম। এসব ঘটনা বাংলার মুসলিম শাসকদের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি নয়। সুলতানদের উদারতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানা কাজে পৃষ্টপোষকতা ও সর্বোপরি আইনের শাসন ও মানবতার জয়গান ইত্যাদিই ছিল মুসলিম বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলার সূফী-দরবেশ ও বাঙালি সুলতান কেউই শিলালিপি বা মুদ্রায় নিজেদেরকে গাজী হিসাবে আখ্যায়িত করেননি। বরং বিজয়ের কয়েকশত বছর পর লিখিত জীবন কাহিনীতেই এসব দেখা যায়। কিংবা বাংলার সমসাময়িক ঘটনাবলীতে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নেই যাতে দেখা যায় যে বাংলার কোন সূফী-সাধক মন্দির ভেঙ্গে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন।[৫৪]

আর সমাজ জীবনে পল্লীর নির্ভৃত প্রান্তরে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ছিল বাস্তবিকই সুদৃঢ় ও সমুধর। এজন্যই দেখা যায় আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাড়তি কর না দেয়ার জন্য হিন্দু বনিকগণ মুসলিমদের নৌকায় তাদের পণ্য আনা-নেয়া করতেন। মুসলিমগণও হিন্দুদেরকে এ বাণিজ্য সহায়তা দিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন না।[৫৫] বস্তুত বাংলায় নবধর্ম ইসলামের অনুসারীগণ ও স্থানীয় পূর্ব ধর্মাবলম্বীগণ তাদের নিজ প্রয়োজনেই একটি মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিলেন। ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবর্তে সম্প্রীতির ছোঁয়াই ছিল বাংলার পথ প্রান্তরে। এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ বলেন-"সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সুলতানী বাংলায়। তাই এযুগের বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের হাতে গড়ে ওঠা দুই সংস্কৃতির মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল, তেমনি পারস্পরিক সহাবস্থান ও ভাবের মিশ্রণের উদাহরণও ছিল উল্লেখযোগ্য।[৫৬]

---

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২ ও ১০৬

[৫৫] Jadunath Sarker, ***History of Aurangzeb***, Calcutta, 1912, p.180-81

[৫৬] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *সুলতানী বাংলার ধর্ম চিন্তার একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, সংখ্যা ২৫-২৬, ১৪০৫-১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬৬

আধুনিক যুগঃ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আধুনিক যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সময়সীমা ১৭৫৭ হতে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রায় সোয়া দু'শ বছরের মত হলেও বাংলার সমাজ জীবনে এ যুগবিভাগ পূর্ববর্তীদের তুলনায় বেশ বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। এ যুগের শুরু হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে। যার শেষ পর্যায়ে রয়েছে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।

ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। অর্থনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্যসহ কোন দিকেই মুসলিমগণ খুব একটা ভাল অবস্থায় ছিলেন না। বিশেষত অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিমদের অধঃপতনের কারণে সার্বিকভাবেই মুসলিমগণ ছিলেন পশ্চাৎপদ এক জাতি। অবশ্য মুসলিমগণের এ অর্থনৈতিক পতনের জন্য কেবল ইংরেজগণ দায়ী নয়। এর দায় পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের উদারনীতির উপরও বর্তায়। কেননা ব্রিটিশপূর্ব বাংলার জমিদারদের বেশীরভাগই ছিল হিন্দু। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সময়ে বড় জমিদারদের মধ্যে মুসলিমগণ সংখ্যা ছিল ২০ এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৭৩; উভয়ের হার যথাক্রমে ১২% এবং ৮৯%।[৫৭] ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ লিখেন- "দশভাগের ন'ভাগ জমিদারি ছিল হিন্দুদের হাতে। আর নিম্নতম রায়তদের অধিকাংশ মুসলমান। কাননগোদের দপ্তরও প্রায় একচেটিয়া ভাবে হিন্দুদের হাতে ছিল।"[৫৮]

বস্তুত পূর্ববর্তী নবাবদের সময়ের এই অর্থনৈতিক অবস্থা ব্রিটিশ শাসনে আরো করুণ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশদের গৃহীত নানা পদক্ষেপ মুসলিমদের আর্থিক দুরবস্থার প্রধানতম কারণ ছিল। বিশেষত ১৯৭৩ সালে ব্রিটিশদের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ' নীতির ফলে মুসলিমদের জমিদারী, যাই ছিল, হাতছাড়া হয়ে যায়। ইংরেজ লেখক হান্টার তার বিশ্লেষণে লিখেন,"এ পর্যন্ত যে সব হিন্দু গোমস্থা অত্যন্ত ছোট খাটো স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার হয়ে গেল, জমির মালিকানা স্বত্বলাভ করল এবং তাদের ঘরে সেইসব ধনদৌলত জমা হতে লাগল যেগুলি পূর্বে মুসলিমগণের আমলাদারীতে তাদের ঘরেই জমায়েত হত।"[৫৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ব্রিটিশদের অন্যান্য আইন কানুনের ফলে মুসলিমগণ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৯১১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় জমিদার শ্রেণীতে হিন্দুদের প্রাধান্য। হিন্দু মুসলিম জমিদারদের সংখ্যানুপাত ছিল যথাক্রমে ৭:৩।[৬০] এছাড়াও ১৮১৮ সালের নিস্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনের ফলেও

---

[৫৭] গোলাম রসুল, *একটি ঐতিহাসিক মিথের সন্ধানে,* বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতার সংকট, সম্পাঃ সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দোপাধ্যায়, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ২৩১

[৫৮] Dr. N.K. Sinha, ***Economic History of Bangal from Plassey to the Permanent Seltlement,*** Voll-II, 1962, p. 229

[৫৯] আতাউর রহমান ও লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি*, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ. ২০-২৪

[৬০] ***Census of India*** 1411, Vol. V, Bangal, Part 1, (Resolution on the Report, dated 14 July, 1913), p.6.

বিরাট সংখ্যক মুসলিম ক্ষতিগ্রস্থ হন। ১৭৬৫ হতে ১৮২৮ সালের মধ্যে ইংরেজদের কৃত লাখেরাজ সম্পত্তি ও দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রায় সব আইনই মুসলিমদের আর্থিক দূর্দশার মূল কারণ। এধরনের আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমগণের অধিকারই শুধু খর্ব করা হয়নি বরং তাদের উপর অবিচার করা হয়।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্রিটিশ শাসনাধীন মুসলিমগণ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন। কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরেই হিন্দু মুসলিম ছাত্রের অনুপাত ছিলো ১৮:১। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে এর অনুপাত ছিলো আরো শোচণীয়। ১৮৫২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে ছাত্র সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৪৬৭৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৩৮১৪ এবং মুসলিম মাত্র ৭৯৬ জন।[৬২] আর ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭২০ জন স্নাতকদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৮ জন।[৬৩] প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা একদিনে হয়নি। বহু সময় ধরে প্রচলিত নানা সামাজিক উপাদান মুসলিমগণের এই শিক্ষা পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী। ইংরেজ শাসনকে মানতে না পারা, ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ইংরেজদের বিভেদনীতি, ইসলাম ধর্মের ভুল ও অপব্যাখ্যা ইত্যাদি নানা কারণে মুসলিমগণ এ অবস্থার শিকার হন। খোন্দকার সিরাজুল হক মুসলিমগণের এই শোচনীয় অবস্থায় ৩টি কারণ নির্দেশ করেন। তার মতে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিমদের দুরবস্থার কারণ হলো-১. মুসলিমদের সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ২. শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ; ৩. মুসলিম সমাজের একটি অংশের রক্ষণশীলতা।[৬৪] আবার কাজী আবদুল ওদুদের মতে- শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিমগণের অনগ্রসরতার কারণ মূলত দু'টি (ক) ইংরেজী শিক্ষার ফলে ধর্মনাশভয় (খ) নবরাজশক্তির প্রতি বিরূপতা।[৬৫]

---

[৬১] Syed Ameer Ali, ***A Cry from the Indian Muhammedan***, The Ninteenth Century, Vol. 11, 1882, in K.K. Aziz, Ameer Ali, His life and Works. Lahore, 1966, p.183

[৬২] ড.পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৬৪] খোন্দকার সিরাজুল হক, ***মুসলিম সাহিত্য-সমাজ; সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম***, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪. পৃ. ১৫

[৬৫] কাজী আবদুল ওদুদ, ***বাংলার মুসলমানের কথা***, কলিকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক তথা চাকরি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিমগণ ছিলেন বিপর্যস্ত। অর্থনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা স্বভাবতই প্রশাসন ও চাকরিতে মুসলিমদের উপস্থিতির নিম্নগামিতার মূল কারণ। ১৮৭১ সালে এক তথ্যে বাংলাদেশে দায়িত্বশীল পদে হিন্দু মুসলিমদের অবস্থান জানা যায়-[৬৬]

পদের নাম	হিন্দু	মুসলমান
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১১৩	৩০
আয়কর বিভাগ	৪৩	৬
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ	২৫	২
জেলা আদালতের জজ	২৫	৮
মুন্সেফ	১৭৮	৩৭
জনকল্যাণ বিভাগ (একাউন্টস)	৫৪	৬
অন্যান্য	১২৫	৪
মোট	৫৬৩	৯৩ জন

অনুরূপভাবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমগণ ছিলেন অসহায় ও করুণ অবস্থার শিকার। সমাজের এই বৈষম্য ও অসম বিকাশ কোন ক্রমেই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের সহায়ক নয়; ফলত এসময় বাংলার হিন্দু মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছেদ প্রকট হয়ে ওঠে। সুলতানী ও মোগল শাসনাধীন বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের যে সুন্দর চিত্র আমরা দেখতে পাই ইংরেজ শাসনামলে তা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। সেসময় পাশাপাশি সহাবস্থান করলেও এ দু'টি সম্প্রদায় ছিল পরস্পর বিরোধী ও হিংসাত্মক মনোভাবের অধিকারী।

বস্তুতপক্ষে মুসলিম শাসনাধীন বাংলার এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিনষ্টের মূলে ছিল ব্রিটিশদের বিভেদ নীতি। ব্রিটিশগণ ভারত উপমহাদেশকে শাসন করলেও তা বহিরাগত ভারতীয় সুলতানদের মত ছিল না। সুলতানগণ বহিরাগত হলেও তাঁরা ক্রমান্বয়ে এদেশীয় সংস্কৃতি গ্রহণ ও বিবাহের ফলে অনেকটা স্থানীয়দের মত হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়া স্থানীয় শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবর্তে তাঁরা নতুন কোন সংস্কৃতি গোটাদেশে চালু করেননি। বরঞ্চ দেশীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার বহু নজীর তাদের ইতিহাসে ভরপুর। কিন্তু ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ভারত উপমহাদেশ শাসনের পেছনে তাদের মূল স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলও ছিল অনেকটা অর্থনৈতিক স্বার্থে। এজন্য উৎপীড়ন ও নিপীড়ন করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় এদেশের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী লোকজন ব্যতীত জনসাধারণের প্রায় পুরো অংশই ছিল ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন। তন্মধ্যে ব্রিটিশদের বিরোধিতায় মুসলিমগণ ছিলেন অগ্রগণ্য। এ প্রেক্ষিতে ব্রিটিশগণ হিন্দু মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে এবং সফল হয়। ব্রিটিশগণ বুঝতে পেরেছিল যে, সম্প্রদায়গত বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারলে ইংরেজগণ সহজেই রাজ্য শাসন ও অর্থনৈতিক মুনাফা লাভ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে নানা সময়ে হিন্দু মুসলিমদের

[৬৬] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের হাত করে; আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে সুবিধা দিয়ে; কিংবা ধর্মীয় সম্প্রদায়গত চিন্তা চেতনার প্রসারতা সৃষ্টি করে এদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে সংকটের সৃষ্টি করে।

জনৈক ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তার ১৮২১ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ব্রিটিশ শাসনের এ বিভেদনীতিটি স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছিলেন-'Divide and Rule' অর্থাৎ ভাগ কর ও শাসন কর। আর এই ভাগ কর ও শাসন কর নীতির প্রয়োগের সর্বপ্রধান হাতিয়ার ছিল ধর্ম। ব্রিটিশগণ এ হাতিয়ারকে যথার্থভাবে কাজে লাগায়। শিক্ষা প্রখ্যাত সাংবাদিক আবেদ খান লিখেন–

> "এই উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাব ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কারণেই বিভক্ত হয়েছে দেশ, বিভক্ত হয়েছে মানুষ, বিষয় সম্পত্তি এবং মানুষের মন। ধর্মের অজুহাতেই মানুষের হাত রঞ্জিত হয়েছে মানুষেরই রক্তে। ধর্মকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেই এই উপমহাদেশকে পরিণত করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার চারণভূমিতে। এজন্যে যদি দোষারোপ করা হয় মুসলিমগণকে তা হলে যেমন সেটা হবে কিছুটা অপরাধ, তেমনি যদি দোষারোপ করা হয় হিন্দুদের। সেটাও হবে সত্যের অপলাপ।"[৬৭]

এম.এন রায় লিখেন–

> "But the blame for this lack of unity among the Hindus and Muslims is not to be laid entirely at the doors of the government, Whose 'divide and rule', policy could not have succeeded had there not been conflicting interests between the two communities".[68]

ইংরেজদের এই বিভেদনীতি বেশ কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকর করা হত। প্রথমত-আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে সুবিধা প্রদানের মাধমে। যেমন–বিদেশী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ সম্পত্তি আইনসহ নানা আইনের মাধ্যমে হিন্দুদেরকে সুবিধা দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত-প্রশাসন, সৈন্যবাহিনী, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পারস্পরিক মনোমালিন্য ও হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি। ব্রিটিশ সরকার প্রতিটি ভারতীয় রেজিমেন্টকে সাম্প্রদায়িক ব্যাটলিয়ানে বিভক্ত করেছিল অর্থাৎ দু'জন হিন্দু ও একজন মুসলিম; দু'জন মুসলিম ও একজন হিন্দু কিংবা একজন হিন্দু, একজন মুসলিম ও একজন শিখ–এই সমানুপাতে প্রতিটি ব্যাটেলিয়ান গড়ে তুলেছিল। সাতচল্লিশের পর যখন সামরিক বাহিনীকে বিভক্ত করা হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ও শিখরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এবং মুসলমানরা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীতে চলে আসে। মর্মান্তিক ব্যাপারটি হল এই যে, তারা ব্রিটিশ দ্বারা প্রোথিত উগ্র-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিয়েই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন।[৬৯] তৃতীয়ত- ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটানো। এ সময়ে কলকাতার মেয়র এ.কে.এম. জাকারিয়ার একটি বিবৃতি ড. পঞ্চানন

---

৬৭ আবেদ খান, *বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতা*, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি; ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৬৮ ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৬৯ আবেদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

সাহা উল্লেখ করেছেন–"পাঠ্যপুস্তকগুলি এমনিভাবে লিখিত হইল–যেগুলি পড়িয়া এক সমাজের জন্য অন্য সমাজের উপর, এক ধর্মাবলম্বীর অন্য ধর্মাবলম্বীর উপর একটা ঘৃণা ও শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং তাহারা যেন কোন দিনই একসঙ্গে মিলিত হইতে না পারে।"[৭০] চতুর্থত- নানা আন্দোলন, সভা-সমিতি কিংবা দল গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়েও ব্রিটিশগণ বিভেদনীতি বজায় রাখে। ১৮৮২ সালে পাঞ্জাবে আর্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত গো-সংরক্ষণ আন্দোলন মূলত ব্রিটিশদের পরোক্ষ সংরক্ষণেই গড়ে ওঠে।[৭১]

ব্রিটিশ বিভেদনীতির সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা ছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ। এ বছরের ১৯ শে জুলাই চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা মালদহ ও আসাম নিয়ে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৬ই অক্টোবর তা কার্যকরী করা হয়।[৭২] বাংলার এই বিভাগকে কেন্দ্র করে এদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে। এমনকি বঙ্গ বিভাগের এক বৎসর পূর্তিতে মুসলিমরা আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে, অপর পক্ষে হিন্দুরা এই দিনটিকে উদযাপন করে শোক দিবস হিসাবে।[৭৩] পরবর্তীতে এ বঙ্গ বিভাগ বাতিলের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশরাজ ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গ বিভাগ রহিত করে। আবুল কাসেম বলেন, "ডেসপাচে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, সকল ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হিন্দু সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্টিই বঙ্গ বিভাগ রদ করার একমাত্র কারণ।"[৭৪] ব্রিটিশরাজ বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে যে কুটিল চক্রান্ত ও রাজনৈতিক চাল পরিচালনা করে তা এদেশের সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে স্পষ্ট করে তোলে। ড. পঞ্চানন সাহা মনে করেন–বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যেমন সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করিছেল তেমনি এ আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটায়। আর হিন্দু মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করে।[৭৫]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিতে ভারতীয় হিন্দু সমাজও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে ড. পঞ্চানন সাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি তুলে ধরেন।
রবীঠাকুর বলছেন, "আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র নয়। আমরা বিরুদ্ধে।[৭৬]

---

[৭০] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
[৭২] প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৩৯।
[৭৩] মোঃ আবুল কাসেম, *ভারতীয় মুসলিমগণের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার উত্থান ও ক্রমবিকাশ*, দি চিটাগাং ইউনির্ভাসিটি জার্নাল অব সোসাল সায়েন্স, ইতিহাস সংখ্যা, ১ম খন্ড, ১৯৯৯, পৃ. ৬০।
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
[৭৫] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।
[৭৬] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবিকই হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্য ও মুসলিম বিরোধিতা শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিভেদনীতিরই ফল ছিল না, বরঞ্চ হিন্দু ধ্যান ধারণা, ধর্মবিশ্বাসও ছিল এ জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ব্রিটিশ বিভেদনীতির কারণেই হোক, কিংবা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাথে মিশ্রণের কারণেই হোক ব্রিটিশ শাসনে হিন্দু জাগরণ ছিল আন্ত-সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতার মূল বাধা। এসময় হিন্দুদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম বিরোধী উগ্রপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন (Hindu Revivalism Movement), শুদ্ধি আন্দোলন, সংগঠন আন্দোলন, বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী আন্দোলন, ১৯০২ সালের বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন সমিতি'র সংস্কার কার্য, পাঞ্জাবের গো-রক্ষা আন্দোলন ইত্যাদি হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পথই উন্মুক্ত করেছে মাত্র। এজন্য বাংলার প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরাও অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। আসহাবুর রহমান লিখেছেন,"বাংলাদেশে হিন্দুধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পিছনে বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এঁদের কেউই সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথও যৌবনে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন।"[৭৭]

অন্যদিকে অসাম্প্রাদায়িক চেতনার দাবীকারী কংগ্রেসও হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনামুক্ত ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কংগ্রেসের অধিবেশনের চিত্র ও সদস্যবৃন্দের তালিকা হতে। ১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের ৭৫৬ জন ডেলিগেটের মধ্যে মুসলিম ছিলেন মাত্র ১৭ জন। আর ১৯৩৬ সালের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৪৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন ছিলেন মুসলিম।[৭৮] কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ প্রসঙ্গে Wall Bank বলেন– "In theory a truly national and secular party, the Congress was actually much more a Hindu organisation in its memberships."[79]

বস্তত বিংশ শতকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ ব্যাপকাকার ধারণ করলে এদেশের শতাব্দীকাল ব্যাপী প্রচলিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙ্গে পড়ে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, দাঙ্গা ও হিংসাত্মক মনোভাব এসময়কার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

হিন্দুদের পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি মুসলিম পুনর্জাগরণও এদেশীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অবশ্য গবেষকগণ মনে করেন- মুসলিম পুনর্জাগরণ ছিল মূলত ব্রিটিশ অনাচার-অত্যাচার ও হিন্দুবাদের উত্থানের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। এ দু'টি কারণে বাঙালি মুসলমান নিজ ধর্মীয় গোঁড়া সত্তাকে প্রকাশ করে যা এতদিন লুকায়িত ছিল। ইসলাম ধর্মের সম্প্রীতির

---

৭৭ আসহাবুর রহমান, *পরিচয়*, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ৭৫

৭৮ Ram Gopal, **Indian Muslims (1859-1947)**, Bombay, Asia Publishing House, 1964, p. 245

৭৯ Wall Bank T. Walter (ed), ***The Partition of India: Cavils and Responsibilities***, Boston D.C, Health and Co. 1966, Introduction, p. ix

Dhaka University Institutional Repository

বাণীকে মুসলিমগণ এসময় একরকম উপেক্ষা করে ধর্মীয় গোঁড়া চেতনাকে আঁকড়ে ধরে। মুসলিমদের এই নবজাগরণের কারণ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–

> "একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশী হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।[৮০]

এসময় মুসলিমগণ মধ্যযুগীয় সব চিন্তা-চেতনা বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চায় ব্রতী হল। স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ত্যাগ করে খাঁটি আরবীয়, ফারসি সংস্কৃতি গ্রহণে উদ্যত হয়। ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ, তাবলীগ ও তানজীম আন্দোলন, মুসলিম লীগ ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশদের বিভেদনীতি, হিন্দু মুসলিম পুনর্জাগরণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তৎকালীন সময়ে ভারত জুড়েই নানা সাম্প্রায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট মতে ১৯২২ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে সারা ভারতে ১২২টি বড় ধরনের দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়।[৮১] সেপ্টেম্বর ১৯২৪ এর গোহাট দাঙ্গা, এপ্রিল-জুলাই ১৯২৬ এর কলকাতার দাঙ্গা, ১৯২৬ এর ঢাকার দাঙ্গা, ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৫ আগষ্ট ১৯৪৩ এর "গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং", ইত্যাদি ছিল বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এর দায়ভার তৎকালীন রাজনীতির সাথে যুক্ত কোন ব্যক্তিই এড়াতে পারেন না।

ভারতবর্ষের এ উত্তাল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে ও ব্যক্তিপর্যায়েও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নানা চেষ্টা করা হয়। ক্ষুদ্র পর্যায়ে এসব উদ্যোগ সফলতা লাভ করলেও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঠেকাতে পারেনি। তবে এসব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। আবেদ খান বলেন,

> "৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূচনার পর থেকে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও মুসলিমগণের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলছিল; কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলতে যেটা বোঝায়, সেটা ঠিক সেভাবে অন্তত এই বাংলায় দেখা যায়নি। খুব ছোটখাট যেটুকু হয়েছে তাও বিচ্ছিন্ন এবং গোষ্ঠীগত পর্যায়ে। আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভেতরে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রমাণ তখনকার সমাজ জীবন হতে পাওয়া যায় না।"[৮২]

সংঘাত সম্প্রীতি যাই থাকুক তৎকালীন রাজনীতিকগণ একটি বিষয়ে সফল হয়েছিলেন। তা ছিল এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা। কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলিম লীগ গঠন, অত:পর ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা

---

৮০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, শতবার্ষিকী সংস্করণ, এয়োদশ খন্ড, পৃ. ১৮২-৮৩

৮১ ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৮২ আবেদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের রাজত্বের শেষ পর্যায় শুরু হয়। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, ভারতছাড় আন্দোলন, মুসলিম লীগের খেলাফাত আন্দোলন ইত্যাদি জনপ্রিয়তা লাভ করলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের দফায় দফায় সভা-সমিতি ও বৈঠকের মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন গতি লাভ করে। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক লাহোর অধিবেশনে ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগের প্রস্তাব গুরুত্ব পায়। মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' (Two nation theory) প্রাথমিক আপত্তি ও অসন্তোষ সত্ত্বেও কংগ্রেস মেনে নেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।" আবেদ খান বলেন, "সাতচল্লিশের দেশবিভাগ পৃথিবীতে সম্ভবত একটি অনন্য দৃষ্টান্ত এই কারণে যে, কেবলমাত্র ধর্মের ছুরি দিয়ে একটি বিশাল ভুখন্ডকে ভাগ করা হয়েছিল; এবং ধর্ম ও জাতিকে এক করে দেখিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক একটি বায়বীয় দর্শন প্রচার করে এই বিভক্তি সম্পন্ন করা হয়েছিল।"[৮৩] দেশবিভাগের ফলে হিন্দুদের দেশ হিসাবে ভারত এবং মুসলিম দেশ হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিক্রিয়াতে বিশাল বাংলা অঞ্চলও দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম প্রধান পূর্ব বঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে। যা বর্তমান বাংলাদেশ নামে পরিচিত। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় পূর্ববঙ্গ হতে বেশ সংখ্যক হিন্দু যেমন পশ্চিমবঙ্গে চলে যায় তেমনি পূর্ববঙ্গেও নতুন মুসলিমদের নতুন বসতি গড়ে ওঠে। মূলত এটা ছিল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল। অবশ্য মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও সংখ্যা কম ছিল না। বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের অমুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে এর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এর কারণ সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলায় স্থানীয় সংস্কৃতি ও লোকজনের মনমানসিকতার উদারতা ও সহনশীলতা।

মূলত ধর্মভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তান নামে বাংলার পূর্বাংশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হলেও দেশবিভাগের মূল কারণ ধর্ম ছিল না। বরং অর্থনৈতিক কারণই ছিল দেশবিভাগের নেপথ্য শক্তি। হাসান ফেরদৌস বলেন, "ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার কারণে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার বহিরাবরণটি ধর্মীয়। কিন্তু মজা হচ্ছে, ধর্মীয় শুদ্ধতা অর্জন বা প্রতিষ্ঠা এই সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য নয়, বরং ধর্মীয়ভাবে স্বতন্ত্র অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই কার লক্ষ্য।"[৮৪] আত্মজীবনী 'Days to Remenber' গ্রন্থের বরাতে হাসান ফেরদৌস বিচারপতি মুনীরের একটি বক্তব্য এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। মুনীর বলেন-

> "লাহোর অমুসলমানেরা সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলেছিলো, তা ছিলো সেখানকার মুসলিমগণ শ্রম ও ঘামে গড়া। এই অসাম্য দূর করার লক্ষ্যেই মুসলমানেরা পাকিস্তানের দাবী করেছিলো যেখানে হিন্দু আধিপত্য ছাড়া তার অর্থনৈতিক ভাগ্য গঠনে সে সক্ষম হবে। ধর্মীয় অনুশাসন মতে

---

৮৩ আবেদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৮৪ হাসান ফেরদৌস, *সাম্প্রদায়িকতা; বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি; ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাপনের জন্য পাকিস্তান দাবী করা হয় বলে যে কথা এখন বলা হয়, সে সময় তা কারো মাথাতেই ছিল না।"[৮৫]

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের আচরণ এসত্যেরই প্রকাশ ছিল। কেননা যদি ধর্মই পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য হতো তবে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমান অধিকারই ভোগ করতেন; কোনরূপ বৈষম্যের শিকার হতেন না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং ধর্মের নামে অধর্মের প্রচলনই ছিল বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম অমুসলিম সকলেই ছিলেন সমান। তাছাড়া ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন দিক তথা ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের ছিল বিস্তর ফারাক। ভৌগোলিক হাজার মাইলের দূরত্বের ন্যায় এ দূরত্ব পরিমাপ করা যায়নি সত্য, তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এ সত্যটি ইতিহাসের পাতায় প্রমাণ করে দিয়েছে। বাঙালির এই সত্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের 'ভাষা আন্দোলনের' মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির দুহিতা হিন্দু ভাষা বলে পরিচিত বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি মুসলিমদের আত্মত্যাগ ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচায়ক। যদিও বাঙালি মুসলিমগণ বাংলাকে নিজ ভাষা ও এদেশীয় সংস্কৃতিকে আপন হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনের ধাপ বেয়ে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সংঘটিত হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম অমুসলিম সম্প্রদায় বাংলার মানুষের স্বাধীকার ও স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষেই একত্রিত হয়েছিল। এসময়ে বাংলার আন্তধর্মীয় ঐক্যও ছিল দেখার মতো। অত:পর ১৯৭১ এর ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয় যা একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুত ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত মাত্র ২৩ বৎসরের পূর্ব পাকিস্তানের সময়কালটা ছিল রাজনৈতিক উত্তেজনায় ভরপুর। এদেশের আন্তধর্মীয় সম্পর্ক তখন ব্রিটিশ শাসনকালীন সম্পর্ক অপেক্ষা ছিল অনেক মধুর। স্বাধীনতা আদায়ে এদেশের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ ছিল মুসলিম-অমুসলিম সুসম্পর্কের বার্তাবাহক। ইতিহাসের পাতায় এসময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া যায় না। বস্তুত বাঙালির নিজস্ব কালচার পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় গড়ে ওঠে দেশ বিভাগের সুযোগে। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন-

"বাঙ্গালী মুসলমানরা ধর্ম ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ও সামগ্রিক উদার ও উন্নত কালচার গড়িয়া তুলিয়াছিল। সে কালচার শুধু মুসলিমগণ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই অমুসলমান বাংগালীর মধ্যেও পরিব্যপ্ত হয়েছিল। ফলে তা পাইয়াছিল একটা জাতীয় সত্তা ও সার্বজনীন রূপ। যুগের দাবীতে দেশজ পরিবেশে জাগরণের প্রেরণায় সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাগিদে ন্যাচারাল গ্রোথের মতই সে কালচার ধীরে সুস্থে গড়িয়া করিয়াছিল। এজন্যই তা পাইয়াছিল জাতীয় রূপ।"[৮৬]

---

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০।

[৮৬] আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের বর্তমান চিত্র

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম-অমুসলিমগণের সংঘাত ও সম্প্রীতির স্বরূপ উদঘাটনে আলোচ্য গবেষণায় এদেশের মানুষের সার্বিক জীবনাচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে নিগূঢ়ভাবে। অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করে সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া সমসমায়িক বিভিন্ন গ্রন্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রামাণ্যতা অন্বেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোয় একথা সুস্পষ্টই অনুমিত হয় যে, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিই এখানকার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সংঘাতমূলক পরিচয় বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচায়ক নয়। ড. আবদুল মমিন চৌধুরীর ভাষায়-

> "এ চিরন্তন রূপকে ধরে নিয়েই আমি বর্তমান গ্রামীণ বাংলার জনজীবনে একটা মুখ্য বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেব। গ্রামীণ জনজীবনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িক বিভেদ আাধুনিক রাজনীতির-হাতিয়ার, নিঃসন্দেহে নগরবাসী উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে গ্রাম-বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ কখনও পরিদৃষ্ট হয়েছে বলে জানা নেই। আজও গ্রাম-বাংলায় হিন্দু মুসলিমরা সহযোগিতা ও সম্প্রীতিতে বসবাস করছে"।[৮৭]

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ চিত্র এ অতীতেরই প্রতিচ্ছবি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার যে পরিচয় যুগে যুগে প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত উদার নৈতিক মানসিকতারই জয়গান। যদিও ব্রিটিশ শাসনামলে প্রোথিত সাম্প্রদায়িকতার বীজ এখনো মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃপক্ষে এগুলো বিচ্ছিন্ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঘটনা মাত্র, যা ধর্মের আবরণ দিয়ে নিজেদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা মাত্র। বাস্তব গবেষণায় এ সত্যটি ফুটে উঠেছে বারবার।

কোন সমাজের আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম ঐ সমাজের প্রভাববিস্তারকারী উপাদান ও নীতিমালাসমূহের বিশ্লেষণ জরূরী। বিশেষত বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বায়নের প্রভাবে সমস্ত রাষ্ট্রই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মানবাধিকারের রক্ষায় বিশ্ব বিবেক উচ্চাকিত ও সচেতন মহল আজ বিচকিত। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনায় ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় যথাযথ আদর্শের অনুপস্থিতি গোটা বিশ্বেই একটি রাষ্ট্রকে ব্যর্থ, অকার্যকর ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে

---

[৮৭] ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের প্রভাবক উপাদানগুলির বিশ্লেষণ এদেশের আন্তধর্মীয় সম্পর্কের স্বরূপ ও মাত্রা নির্ধারণে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আইনগত দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান নীতিমালা হলো এ দেশের 'সংবিধান'। ১৯৭২ সালের ১৬ইং ডিসেম্বর হতে কার্যকর হওয়া এ সংবিধান এ দেশের সর্বোচ্চ দলীল। আন্তধর্মীয় ও ধর্মীয় বৈষম্যের দিক নির্দেশনায় এতে রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের ধর্ম ইসলাম প্রসঙ্গে সংবিধানে বেশ ইতিবাচক বর্ণনা দেখা যায়। এরূপ বিধিগুলো হলো-

১। সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরূতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সংযোজন।[৮৮]

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।[৮৯]

৩। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।[৯০]

৪। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ নং-১২) টি বিলুপ্ত-[৯১]

৫। ৩৮ নং অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত-[৯২]

সংবিধানের এসব অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দ্বার উন্মুক্ত করে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু সার্বিক বিশ্লেষণে এরূপ মনে হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলার সব রাজবংশই রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে কোন না কোন ধর্মকে (হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম) গ্রহণ করেছে। পরবর্তী সুলতানী আমলেও ইসলাম ছিল রাষ্ট্রধর্ম। বাংলার ইতিহাসে রাষ্ট্রধর্মের ঘোষণা বাঙালি বহুদিনের ঐতিহ্যেরই প্রতিচ্ছবি।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা কিংবা সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সংযুক্তকরণ দ্বারা এদেশের ৯০ শতাংশ জনগণের ধর্মচেতনার প্রতি সম্মান জানানো হয়। যা পূর্ববর্তী সভ্য জাতিসমূহের ইতিহাসে বিরল নয়।

তৃতীয়ত, সংবিধানের এই ধারাগুলোর সবগুলিই সংশোধনী আকারে গৃহীত হয়েছে। বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রামের পর মাত্র ৯ মাসের মধ্যে এতবড় একটি রাষ্ট্রীয় দলিল নির্মাণে জনমতের প্রতিফলন নাও থাকতে পারে। পরবর্তীতে সম্ভবত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের প্রত্যাশার কারণে এ সংশোধনী করা হয়। যার প্রতিক্রিয়ার তৎকালীন কোনরূপ প্রতিবাদের খবর জানা যায় না।

---

[৮৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, প্রস্তাবনা, পৃ. ১

[৮৯] প্রাগুক্ত, প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রধর্ম, অনুচ্ছেদ ২ক, পৃ. ২

[৯০] প্রাগুক্ত দ্বিতীয়ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মূলনীতিসমূহ, অনুচ্ছেদ ১ক, পৃ. ৪

[৯১] প্রাগুক্ত, দ্বিতীয়ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণতন্ত্র ও মানবিধকার, অনুচ্ছেদ ১২, পৃ. ৪

[৯২] প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক মানবাধিকার, সংগঠনের স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৩৮, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত, অনেক গবেষক মনে করেন যে-সংবিধানের এসব সংশোধনী অনুচ্ছেদগুলো সংযোজন ছিল রাজনৈতিক স্বার্থে, ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্য এতে ক্রিয়াশীল ছিল না। বিপন্ন সময় বইতে বদরূদ্দীন উমরের লিখিত একটি বক্তব্য কাজল বন্দোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। বদরূদ্দীন উমর বলেছেন, এদেশের রাষ্ট্রধর্ম আইনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণার উদ্দেশ্য মোটেই ধর্মীয় নয়। এ ঘোষণার সঙ্গে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের কোনই সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের জীবনে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের জীবনেও কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি।[৯৩]

পঞ্চমত, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মস্বাধীনতার পরিবর্তে বিলুপ্তকরণ ও তৎপরিবর্তে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে আল্লাহর উপর আস্থা। বিষয়টির সংযোজনও মূলত তান্ত্রিক। জাতীয় জীবনে এর কোন ব্যবহারিক প্রভাব নেই। তাছাড়া সংবিধান রচনাকালে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মহীনতা বুঝানো হয়নি। তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানতম নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের বক্তব্যে ঐ সত্যই প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ৭ই জুন এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন-

> "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মের অনুপস্থিতি নয়। আপনি একজন মুসলমান। আপনি আপনার ধর্ম পালন করুন। বাংলাদেশের মাটিতে অধার্মিকতার স্থান নেই; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এ ধর্ম-নিরপেক্ষতার একটা অর্থ আছে এবং সে অর্থ হচ্ছে-ধর্মের নামে কেউ শোষণ করতে পারবে না; আলবদর-রাজাকারের ন্যায় ফ্যাসিষ্ট সংগঠন দাড়াতে পারবে না। এদেশে কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অনুমোদন করা হবে না"।[৯৪]

বস্তুত শেখ মুজিবের এ ভাষণ হতেই বাংলাদেশের তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। ধর্মহীনতার পরিবর্তে যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতার আজ্ঞাবহ সে মর্ম সংশোধিত সংবিধানেরও দাবী। যা পরিস্ফুট হয়েছে ২-ক অনুচ্ছেদে- 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্টধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।'

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় বৈষম্য বা নির্যাতনের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং এ সম্পর্কে সংবিধানে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে যে-'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'।[৯৫] সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। এ মূলনীতি অনুসারে বাংলাদেশে প্রচলিত সব আইনে বাংলাদেশের সকল ধর্মের নাগরিকদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। বিশেষ করে প্রচলিত ফৌজদারী আদালতের মামলায় ধর্ম-বর্ণ-গোত্র

---

[৯৩] কাজল বন্দোপাধ্যায়, *স্বাধীন বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি, সঙ্কটের ছবি*, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি: ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১

[৯৪] সরকারী পুস্তিকা, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক প্রকাশনা ডিভিশন প্রকাশিত পুস্তিকা, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ১৬-১৭

[৯৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, অনুচ্ছেদ ২৭, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে সকলেই সমান মর্যাদা ভোগ করবেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সৃষ্ট ধর্মের মূলনীতি অনুযায়ী বিশেষ আইনের সুবিধা ভোগ করবেন। মুসলিমদের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি মুসলিম আইন ১৯০৮ ও মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর অন্তর্ভূক্ত হবে তা হলো বিবাহ, তালাক, ওয়াকফ, মীরাস, অভিভাবকত্ব, উইল, হেবা, শুফ'আ ইত্যাদি। আর হিন্দুদের বিশেষ ধর্মীয় আইন হিন্দু আইন ১৯০৮ মোতাবেক যে সব বিষয় বাংলাদেশের আদালতে বিচারাধীন হবে সেগুলো হলো-উত্তরাধিকার, বিবাহ, ভরণপোষণ, দত্তক গ্রহণ, বিধবা সম্পত্তি, উইল, নারী সম্পত্তি, প্রত্যার্পণ সম্পত্তি, দায়ভার আইন ইত্যাদি। বিধবা পুনঃবিবাহ আইন ১৫, ১৮৫৬; হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত আইন এ্যাক্ট ১৮, ১৯৩৭ (পরবর্তীতে সংশোধিত ১৯৩৮) ইত্যাদি ও বিশেষ ধর্মীয় আইন হিসাবে বাংলাদেশে প্রচলিত।[৯৬]

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত হয়েছে রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[৯৭] আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসাবে গৃহীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অন্য স্থানে বলা হয়েছে, "কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না"।[৯৮]

বস্তুত সংবিধান বর্ণিত এসব নীতিমালার উপরেই বাংলাদেশের শিক্ষানীতি নির্ভরশীল। আজ পর্যন্ত প্রণীত শিক্ষানীতির কোনটিতেই-ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ শিক্ষার দ্বারা নিজ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে ও উন্নততর নৈতিকতার চর্চা করবে-এটাই মূলত এ আইনের উদ্দেশ্য। অবশ্য বাংলাদেশে ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী বা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এবং তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য এ ব্যবস্থা নেই। এর প্রধান কারণ হলো মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যতা ও ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্রে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা। অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে এ আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা নেই তা না বললেও একথা বলা চলে যে তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে এগুলি স্বতন্ত্র শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে বেসরকারী উদ্যোগে এরূপ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বাংলাদেশে রয়েছে।

---

[৯৬] মোঃ আব্দুল হালিম, *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা*. ঢাকা, সি সি বি ফাউন্ডেশন, ২০০৫, পৃ. ২৫-৪০.

[৯৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১৭ক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, পৃ.৫-৬

[৯৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪১ (২), পৃ-১২.

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যের আরো একটি দিক অমুসলিমদের সাথে আলোচনায় বেরিয়ে এসেছে। আর তা হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম শিক্ষক হিসাবে মুসলিমদের নিয়োগ দান। যিনি শুধু ইসলাম ধর্ম পাঠ দিয়ে থাকেন। হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মের পাঠদানে এ ধর্মাবলম্বী অন্য শিক্ষক দ্বারা পড়ানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থার জন্য ধর্মীয় বৈষম্য দায়ী নয়। বরং সরকারের আর্থিক অসংগতির কারণে প্রতিটি ধর্মের জন্য আলাদা শিক্ষকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের স্বল্পতা ও অমুসলিমদের জন্য পৃথম ধর্মীয় শিক্ষক না রাখার প্রধান কারণ। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে ৫-১০ জন ছাত্রের জন্য পৃথক শিক্ষকের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। তবে যেসব স্কুলে অমুসলিম প্রধান সে সব স্কুলে পৃথক ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থাও বিরল নয়।

মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যকার সম্প্রীতির ছোঁয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয়। বিশেষত পেশাগত ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোনরূপ বৈষম্য নেই। সংবিধানে বলা আছে-

> "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে"।[৯৯]

এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন চাক্‌রির নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১ তে চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের ২৯ নং অনুচ্ছেদের ৩ উপঅনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে এই বিধিমালার সিডিউল-২ এর বিধান মোতাবেক চাক্‌রিতে নিয়োগ হইবে।[১০০] উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১। প্রজাতন্ত্রের কার্য নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

২। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরূষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩। এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-

ক) নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে;

---

[৯৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪০, পৃ. ১২

[১০০] মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, *চাকরির বিধানাবলী*, ঢাকা, রোদ্দুর প্রকাশনী, ২৬ তম সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে;

গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[১০১]

এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে উপজাতীয়দের জন্য সরকারী বিধিমালার ০৫ (পাঁচ শতাংশ কোটা পদ্ধতিরও বিধান বর্তমান।[১০২] এছাড়া চাকরিকালীন ছুটি ভোগ, উৎসব ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অমুসলিমগণ মুসলিমদের সমান অধিকার ভোগ করে থাকেন।[১০৩]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানের ঘোষণা হলো ঃ

ক) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।[১০৪]

খ) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে-

(i) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(ii) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।[১০৫]

মূলত বাংলাদেশে স্বাধীন ধর্ম পালন, উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজন, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ও প্রচার আনুষ্ঠানিক রচনা ইত্যাদি বেশ ভালভাবেই গৃহীত হয়। আইনগতভাবেতো নয়ই, ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় দেখা যায় না। বরং আন্তঃধর্মীয় সাহায্য-সহযোগিতার চিত্রও এদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে সুখ্যাত। স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা দেয়া হয়নি। এরূপ সম্প্রীতির নজির পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে দাবীকারী ভারতেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এছাড়াও মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের আইনগত সমতা বিদ্যমান। কোন সম্প্রদায়কেই এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়নি। জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভ, চলাফেরা-সভাসমাবেশের স্বাধীনতা, চিন্তা বিবেক ও বাক স্বাধীনতা, সম্পত্তি-গৃহ ও

---

[১০১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ ২৯, পৃ. ৮-৯

[১০২] মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩.

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭ ও ২১১.

[১০৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, প্রথমভাগ, প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রধর্ম, অনুচ্ছেদ ২(ক), পৃ. ২

[১০৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪১ (১), পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের কোনটিতেই ধর্মীয় বৈষম্যের সুযোগ নেই।[১০৬] উপরন্তু সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে-

১. কোন ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

৩. কোন ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনরূপ অক্ষমতা বাধ্যবাধকতা, বাঁধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪. নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[১০৭]

বাংলাদেশে প্রচলিত আন্তধর্মীয় সম্পর্কের ভিত্তি মূলত এগুলোই। কোনরূপ বৈষম্যের অনুপস্থিতি এ নীতিমালাকে করেছে সর্বজনীন। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনায় যত সংঘর্ষ, দাঙ্গা কিংবা সংঘাতের ঘটনা দেখা যায় কার্ল মার্কসের মতে তা মূলত শ্রেণী সংঘাতের ইতিহাস। আর এর জন্ম হয় বৈষম্য থেকেই। সুতরাং বৈষম্যের অনুপস্থিতি ও সমান সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসেও তা-ই লক্ষণীয়। বর্ণপ্রথার কারণে প্রাচীন বাংলায় যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল তা এদেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফলে ইসলামের সাম্য ও সমতার বাণী খুব সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠে। সমাজিক অশান্তির পরিবর্তে সূচিত হয় শান্তির যুগ। এ হিসাবে বাংলাদেশে ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সমতা ও সাম্যের আইনগত ভিত্তি এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার অন্যতম নির্দশন। বৈষম্যের বিপরীতে পারস্পরিক সুমধুর ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক মূলত এদেশের বিধানগত সফলতাই প্রকাশ করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে সাথে এদেশে ধর্মীয় রাজনীতিরও অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত ধর্মকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের রেওয়াজ এ অঞ্চলে সুপ্রাচীন। অবশ্য রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব থাকার মূল কারণ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ধর্ম হলো ইসলাম। সুতরাং স্বভাবতই রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হবে স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনা বলা হলেও সে সময় ও স্বার্থের কারণে ধর্মের ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর থেকে প্রভাবিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালার কুরআন তেলাওয়াত অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাছাড়া এ বেতার কেন্দ্র

[১০৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮-১২

[১০৭] প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ-২৮, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, পৃ. ০৮

Dhaka University Institutional Repository

হতেই বাংলাদেশের মুসলিমদের প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠা ও পাকিস্তানীদের বিরূদ্ধে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে ইসলামসম্মত তা প্রয়োগ করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করা হতো।[১০৮]

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব ব্যাখ্যা করে হাসান মোহাম্মদ বলেন, বর্তমানে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টও (এরশাদ) এর ব্যতিক্রম নন। জনগণের ধর্মানুভূতিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে তিনি জিয়াউর রহমানের চেয়ে বেশি সচেষ্ট। আসলে মুজিব জিয়া-এরশাদ প্রত্যেকেই ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম।[১০৯] বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের এ প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাইতো বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধারক বাহক আওয়ামী লীগ সরকারও ধর্মকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে। নির্বাচনের পূর্বে মাজার হতে প্রচারণা শুরু করা, টুপী-তসবিহ এর ব্যবহার, ইনশাআল্লাহ, বিসমিল্লাহ, খোদা হাফিজ ইত্যাদির ব্যবহার যতটা না ধর্মীয় কারণে তারচাইতে অনেক বেশি ভোটের রাজনীতির জন্য। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ও ব্যবহার সম্পর্কে আরো বেশ কিছু উদাহরণ হাসান মোহাম্মদ তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।[১১০]

অন্যদিকে ডানপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দল বি.এন.পি-তেও ধর্মের ব্যবহার রাজনৈতিক কারণেই। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান নানাভাবে এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করেন। যদিও তিনি নিজ দলকে বাংলাদেশি জাতিয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করেন। সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন, মূলনীতিতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ইত্যাদি সংযোজন তার সময়েরই প্রতিচ্ছবি। জিয়া পরবর্তী শাসক এরশাদও রাজনীতি হতে ধর্মের প্রভাবক মুক্ত করতে পারেননি। বরং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছিলেন। হাসান মোহাম্মদ বলেন-

> "১৯৭২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সব কটি সরকারই ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে-প্রায় একই নীতি অনুসরণ করেছিল। শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ক্ষমতায় টিকে থাকা ও জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্য যেমন বামপন্থী শক্তির বিরোধীতা করেছেন তেমনি ধর্মীয় শাসনকামী রাজনৈতিক দলগুলিকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করেছেন" [১১১]

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্বও বাংলাদেশে বিদ্যমান। এগুলোর সংখ্যা বলতে গেলে অসংখ্য। তন্মধ্যে বড় দল হলো জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশ। ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য হলেও এ দলটি সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। বরং ধর্মের অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত এ দলটির প্রভাব বাংলার সমাজ জীবনে নেই বললেই চলে। ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সংখ্যাধিক্য এদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি

---

[১০৮] সৈয়দ আলী আহসান, *মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে;* দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৬ মাচ, ১৯৮৬

[১০৯] হাসান মোহাম্মদ, *ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-১৯৮৬)*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, কলা অনুষদ, ৩য় খন্ড, জুন-১৯৮৭, পৃ. ৫৮

[১১০] হাসান মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১১১] হাসান মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ও স্বার্থলোভী ব্যক্তিদের লালসারই বহিঃপ্রকাশ। যা তাদের নানা রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাবও এদেশে কম নয়। তাঁরা এদেশে আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফলের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে বা আসনে অমুসলিম সম্প্রদায় ও উপজাতীয়দের বসবাস বেশি সেসব অঞ্চলে ডানপন্থী দলগুলোর তুলনায় বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাফল্যের হারও বেশি। ফলে নির্বাচনের সময় এসব ভোটার বেশ গুরূত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন।

বস্তুত ধর্মের প্রভাব সারা বিশ্বের রাজনীতিতেই রয়েছে। এটা ততক্ষন পর্যন্ত ক্ষতিকর নয়, যতক্ষণ না কোনরূপ দাঙ্গা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে। বাংলার রাজনীতির ধারা ব্যাখ্যা করলে এদেশের মানুষের মানসিকতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ মানসিকতার প্রকাশে হাসান মোহাম্মদ যথার্থই বলেছেন-

> "বৃটিশ শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রাধান্য বিস্তারকারী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রায় সব ক'টিই ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে মাধ্যম পন্থা অনুসরণ করেছে। ধর্মীয় মৌলবাদ অথবা ইহজাগতিকতাবাদী ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল এ ভূখন্ডের জনগণের অধিকাংশের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি। বাংলাদেশের জনগণের মানসিকতা বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম নয়। ধর্মীয় মৌলবাদী ও ইহজাগতিকবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের আবেদন শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছাত্র যুবকের মাঝেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। এ বাস্তবতা থেকেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক দলসমূহ এখন ধর্মীয় মৌলবাদের চেয়ে জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের সংগ্রাম বেশি সোচ্চার"।[১১২]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আড়ালে বাংলাদেশে সম্প্রদায়িক নির্যাতন যে হয়ই না, তা কিন্তু নয়। বরং স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত এধরণের বেশ কিছু উদাহরণ লক্ষ্যণীয়। বিশেষত নির্বাচনোত্তর সময়ে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ইত্যাদি খবর বেশি গোচরীভূত হয়। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকায় এ ধরনের সংবাদগুলো গোপন থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। তথাপি বাংলাদেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো। এমতাবস্থায় সম্প্রদায়িক নির্যাতনের যেসব খবর প্রকাশিত হয় তার সবগুলোই সর্বাংশে মিথ্যা তা বলার কোনই অবকাশ নেই। বরং বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি রক্ষায় এ বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া উচিত। এদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে গুলোর স্বরূপ ও কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে নির্যাতনের মূল কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নয়। বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

---

[১১২] হাসান মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

আর এক্ষেত্রে যেসব স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ ও নির্যাতিত ব্যক্তি অমুসলিম হন সেগুলোকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরিয়ে ফায়দা লুটার চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিত লোক যে-ই হোক বা যে কারণেই নির্যাতিত হোক কোনটিই ইসলামে সমর্থিত নয়। কোন প্রকৃত মুসলিম এ কাজ কখনোই করতে পারে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ কথা আরো সত্য। কেননা ধর্মপ্রাণতার পাশাপাশি উদারতা ও সহনশীলতার মানসিকতা বাঙালি সমাজের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ধর্মের পোষাক গায়ে দিয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নির্যাতন বা উৎপীড়ন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, চাদাবাজি, হুমকি ধামকি প্রদান কোনটির জন্যই ধর্ম দায়ী হতে পারে না।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের পেছনের কারণ অনুসন্ধানে বৈষম্যের শিকার-বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় গ্রন্থটি বেশ মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। হাসান ফেরদৌস বলেন বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য' শীর্ষক দু'খন্ডের তালিকায় এ কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বৈষম্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রসমূহ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর পেছনে প্রচ্ছন্ন প্রশাসনিক সমর্থন যে রয়েছে তা বোঝাও কষ্টকর নয়।[১১৩] সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ অনুসন্ধানে তুষার রায় লিখেন- "Apart from the political gain, those miscreants are making personal gains by taking forceful and illegal possessional of the properties belong to Hindus".[১১৪]

সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও দাঙ্গার বিষয়টি নিয়ে অপপ্রচারও চালানো হয়। উপমা হিসাবে ২০০২ সালের 'ফার ইস্টার্ন ইকোনামিক রিভিউ এর Beware of Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক Bertil Lintner এ রিপোর্টে বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ ও উগ্র মৌলবাদীদের স্বর্গভূমি, মৌলবাদীদের জন্য হয় সরকারের উদাসীনতা, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলসমূহের ধর্মপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট পেশ করে।[১১৫] এ রিপোর্টের ভিত্তিহীনতার স্বীকারোক্তিও দেন একজন বিদেশী সাংবাদিক। আমেরিকান প্রথিতযশা সাংবাদিক আরনল্ড জেটলিন "The Direction of News reporting and professionalism in News Media' শীর্ষক সেমিনার উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। তার এ আগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন-বাংলাদেশে আসার আগে ফার ইস্টার্ন ইকোনমিকস রিভিউ'র বহুল আলোচিত সেই রিপোর্টার বার্টিল লিন্টনারের সাথে ঘটনাচক্রে আমার দেখা ও কথা হয়। আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে এখানে আসতে নিষেধ করে বলেন, যেওনা, বাংলাদেশে গেলেই তুমি বিপদে পড়বে। বাংলাদেশে এসে তো কোনও সমস্যা দেখছিনা। দেখছিনা

[১১৩] জালাল ফেরদৌস, প্রাক্তক্ত, পৃ. ২৭২

[১১৪] Tusher Roy, ***Father of the (Hindu) Minorities in Bangladesh***, Dhaka,2009, p. 2

[১১৫] Bretil Linter, ***Bangladesh: A cocoon Of Ierror***, Far Eastern Economic Reviews. Hong kong, April 7,02

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মান্ধদের কোন উৎপাতও। গণতন্ত্র চর্চায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।[১১৬] তিনি আরো বলেন "এদেশের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অপপ্রচার এ দেশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম হওয়ার পরও হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ অন্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তিতে বসবাস করছে। এ সম্প্রীতির নজির বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোতে নেই"।[১১৭]

বস্তুত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণই বেশি দেখা যায়। এখানে সাম্প্রদায়িক শক্তি উগ্র মৌলবাদ, কিংবা ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদের কোনরূপ স্থান নেই। বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স বলেন, "বাংলাদেশকে কোনভাবেই কট্টর জঙ্গি মুসলমানদের আখড়া বলা যায় না"। তাঁর মতে- বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের দৃঢ় সমর্থক।[১১৮] আরেক সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারী কে টমাস বলেন-"People of various faiths are liking in Bangladesh maintaining communal harmony and mutual respect – Bangladesh is a democratic country and its communal harmony is appreciable".[১১৯]

এদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পূজা উন্নয়ন পরিষদ এর উপদেষ্টা মেজর জেনারেল সি আর দত্ত বীরউত্তম বলেন, "দূর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামন্ডপের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নতিরই প্রমাণ"। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০০৭ সালে বাংলাদেশে মোট ২২০০০ পূজামন্ডপ (এর মধ্যে ১৩৬টি ঢাকা শহরে) দেখে এ মন্তব্য করেন।[১২০] বাংলাদেশের বাস্তবতা এটাই। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের যেসব খবর প্রচারিত হয় তা ধর্মীয় কারণে নয় মোটেও। মাহবুব উল্লাহ লিখেন– "দেশের কোথাও নির্বাচনোত্তর পরিবেশে রাজনৈতিক বিরোধ ও অতীতের স্বার্থ সংঘাতকে কেন্দ্র করে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত যদি ঘটনাচক্রে দুই ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের মাঝে ঘটে থাকে, তাহলে সে সব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িকরূপ না দিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। আমাদের পরম দূর্ভাগ্য যে রাজনৈতিক সংঘাতের বিছিন্ন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত হিসাবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চলছে"।[১২১] বাংলাদেশের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা শ্রী সুনীল গুপ্ত ও এসব ঘটনার কারণ পর্যবেক্ষণে বলেন–এসব ঘটনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই।[১২২]

---

[১১৬] আরনল্ড জেটলিন, *ইকোনমিক রিভিউ'র 'বিঅয়্যার অব বাংলাদেশ' রিপোর্টটি তথ্য প্রমাণহীন এক অপচর্চা*, দৈনিক মানবজমিন, ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃ. ১ ও ১১

[১১৭] আরনল্ড জেটলিন, *'অপপ্রচার বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিবে'*, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩, পৃ. ৮

[১১৮] মেরি এন পিটার্স, *বাংলাদেশ কোনভাবেই জঙ্গি মুসলমানদের আখড়া নয়*, দৈনিক প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর, ২০০২

[১১৯] H.K. Thomas, ***Communal Harmony,*** United News of Bangladesh, September 3, 2003

[১২০] ***Religious harmony improves in Bangladesh: Hindu Leader***, http:// news hopper.sulekha.com.

[১২১] মাহবুব উল্লাহ, *যে কথা বলতে চেয়েছি সরাসরি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৯

[১২২] মাহবুব উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ:. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক চিত্র তুলে ধরতে আলোচ্য স্থানে কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো। যা দ্বারা এদেশে সম্প্রদায়িক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

□ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, "পারস্পরিক আদান প্রদানের এই প্রক্রিয়ার প্রভাব এমন গভীর যে, আজও মুসলমানদের মসজিদ বা পীর বাবার দরগাকে হিন্দুরা দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের পবিত্র স্থানের মর্যাদা দেয় এবং সেইসব স্থানে তীর্থযাত্রায় যায়। একইভাবে মুসলমানরাও নির্দ্বিধায় হিন্দুদের পূজার্চনায় বা সামাজিক উৎসবে যোগদান করে"।[১২৩]

□ ইবনে আজাদ লিখেন,

"বাংলার বহুত্ববাদী সমাজের বিশেষত্ব ছিল বাঙ্গালি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মসম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য ও বিভক্তি সত্ত্বেও তাদের এথনিক অভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল বাঙলা ভূখন্ডের জৈব পরিবেশ ব্যবস্থা (ecosystem) হতে উদ্ভুত সংস্কৃতির ভিত্তিশিলার সমসত্তামূলক চরিত্র থেকে। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের ভাষা, রন্ধনপ্রণালী, খাদ্যাভ্যাস, হাঁড়ি পাতিল, বাস ভবন, নির্মাণশৈলী, পোশাক-পরিচ্ছেদ, প্রবাদ-প্রবচন, গীত, ছড়া-পালা, বিনোদন, আত্মীয় সম্পর্ক ও পরিবার ব্যবস্থা অভিন্ন। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের বেলায় বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের মধ্যে সুগভীর পার্থক্য আছে। কিন্তু এ পার্থক্য বাঙ্গালি কৃষক সমাজকে দুটি অনতিক্রম্য স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক কুঠুরীতে দ্বিখন্ডিত করে রাখেনি। বাঙলার কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ ধান চাষ ও মাছ-ভাত খাওয়ার সংস্কৃতির মূল ভিত্তিটি হিন্দু ও মুসলিমের ধর্ম বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যের ওপরে সর্বদাই আধিপত্যশীল ছিল এবং এখনও তাই আছে"। [১২৪]

□ সৈয়দ আমীরুল ইসলামের ভাষায় বাংলাদেশের মুসলিম-অমুসলিমদের সম্পর্কের স্বরূপ নিম্নরূপ-

"আমরা, মুসলমান হিসাবে পরিচিতরা, জলকে পানি বলতাম, এখনো বলি, আর হিন্দু বলে পরিচিতরা পানিকে জল বলতো, এখনো বলে-অন্ততঃ আমি আশেপাশে যতজনকে দেখেছি, তাদের বেলায় মোটামুটি একথা সত্য। অবশ্য হাল আমলে বহু অমুসলিম কেবল হিন্দু নয়, জলকে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে পানি বলে, আস্সালামো আলাইকুম দেয়,অগ্রজতুল্য কর্তাকে ভাই বা আপা বলে, কিন্তু গৃহে বা সমধর্মীদের সঙ্গে হয়ত জল, নমস্কার, দাদা-দিদি বলে, যেমনটা আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, আমরা বা আমাদের পূর্বসূরিরা অমুসলিমদের আদাব দিতাম, দাদা-দিদি বলতাম"।[১২৫]

□ ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেন,"বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি বহুমাত্রিকতার দেশ যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর বসবাস এ মাটিতে সু-প্রাচীনকাল থেকেই। আমরা পারস্পরিক সুখে-দুঃখে, এবং আনন্দ বেদনায় একে অপরের সঙ্গে অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে আসছি"।[১২৬]

---

১২৩ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*, আলিগড় জাতীয়-মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (১৯২৩) উপলক্ষে অভিভাষণ, *মুসলিম সমাজ এবং এই সময় দ্বিতীয় খন্ড*, সম্পাদনা মঈনুল হাসান, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ২০০৫, পৃ. ১৯

১২৪ ইবনে আজাদ, *বাংলাদেশে সেকুলার বুদ্ধিজীবিদের সমস্যা*, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম-সাম্প্রদায়িক সঙ্কট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

১২৫ সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

১২৬ অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা এবং কতিপয় সুপারিশ*, Inter Faith Relation National & Regional Perspective, Dhaka, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 2008, p.70-71.

Dhaka University Institutional Repository

□ ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও এর ভাষায়-"বাংলাদেশের ধর্মাপরায়নতা ও অসাম্প্রদায়িকতার রূপ হলো-অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস এবং নিজ নিজ ধর্মচর্চা; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসাম্প্রদায়িক ও সহনশীল মনোভাব। তিনি অবশ্য আরো একটি রূপ তুলে ধরেছেন যথা-এক শ্রেণীর লোকের ধর্মান্ধতা ও কট্টরবাদিতা; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও অসহনশীলতা"।[১২৭]

□ সৈয়দ আশরাফ আলীর ভাষায় বাংলাদেশের মুসলিমদের মনমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে-

> "In spite of the serious provocation displayed on television in our neighbouring country where a historic mosque was razed to the grounds inch by inch, there was no repercussion worth mentioning in this part of the subcontinent. Even when Muslim men and women in thousands were slaughtered and the rape of thousands of Muslim ladies video-taped with unimaginable impurity, the shocked and aggrieved people in Bangladesh remained calm and restrained. Not a single Hindu temple was descrated or demolished, not a single Hindu lady was raped or molested. Even in the recent past when highly objectionalbe cartoons maligning the holy prophet Muhammad (pbuh) were published in Denmark and other European Countries, the Bangladeshi again restrained themselves and did not resort to violence against the christian community".[128]

নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক এরূপই পরমত সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা, সুখে-দুঃখে একাত্ম ও সর্বোপরি বন্ধসুলভ আচরণ দ্বারাই আবর্তিত হয়। যার প্রেক্ষিতে দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কোন ঘটনা ঘটেনি। ছোট খাট বিচ্ছিন্ন যে সব সংঘাত ও নির্যাতন তা নিতান্তই ব্যতিক্রম। যা এদেশীয় মানুষের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। এককথায়, জনসংখ্যার এত আধিক্য ও অর্থনৈতিক নিরাপ্তাতহীনতা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে পরিবেশ এখানে বিরাজমান তা সত্যিই বিস্ময়কর।

---

[১২৭] ড. ফাদার তপন ডি. রোজারিও, *বাংলাদেশে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তধর্মীয় শিক্ষা এবং সংলাপ: প্রেক্ষপট-খ্রিষ্টধর্ম;* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[১২৮] Syed Ashraf Ali, ***A Look Back at Interfaith Community Relations since The Emergence of Bangladesh,*** Ibid, p .59.

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানে জরিপ পদ্ধতির বিশ্লেষণ

আলোচ্য পরিচ্ছেদে সামাজিক গবেষণার অন্যতম জরিপ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩৮০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নমুনা ধরে তাদের নিকট হতে প্রশ্নমালার সাহায্যে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ২৫টি প্রশ্নকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আর তা হলো ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপ, উত্তরদাতাদের নিজ এলাকার ধর্মীয় চিত্র ও বাংলাদেশের সার্বিক ধর্মীয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে উত্তর দাতাদের ধারণা ও মতামত।

জরিপ পদ্ধতির নমুনা সংগ্রহে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে যেন বাংলাদেশের প্রধান চারটি ধর্ম তথা ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহে যেন ১৮ বছরের উর্দ্ধে সকল বয়সী নাগরিক এবং সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী জনগণের চিন্তাধারার প্রতিফলন পাওয়া যায় সে প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। নিম্নের সারণিগুলোতে উত্তর দাতাদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-০৭

উত্তরপ্রদানকারীদের ধর্ম ও লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ :

	অমুসলিম								মুসলিম		সর্বমোট	
	হিন্দু		বৌদ্ধ		খ্রিস্টান		মোট					
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
পুরুষ	৮৫	৭০.৮	৩৪	৬৮.০	২১	৬৬.৭	১৪০	৭০.০	২	৬২.২	২৫২	৬৬.৩
মহিলা	৩৫	২৯.২	১৬	৩২.০	০৯	৩৩.৩	৬০	৩০	৬৮	৩৭.৭	১২৮	৩৩.৭
সর্বমোট	১২০	১০০%	৫০	১০০	৩০	১০০	২০০	১০০	১৮০	১০০	৩৮০	১০০%

জরিপ পরিচালনায় উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা এ দু'ভাগে মোট ৩৮০ টি নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য সারণিতে এসব নমুনার লিঙ্গ ভেদে কোন ধর্মের কতজন অনুসারী মতামত প্রদান করেছেন তা দেখানো হয়েছে। ১২০ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নারী পুরুষের হার ২৯.২ ও ৭০.৮ শতাংশ। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৩২.০ ও ৬৮.০ এবং ৩৩.৩ ও ৬৬.৭ শতাংশ। দেখা যায়, প্রায় এক তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা মহিলা; নারীদের উত্তর দানের এ হার মুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রায় সমান। বাকী প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা পুরুষ। বাংলাদেশের নারী-পুরুষ জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান। তথাপিও এ জরিপে নারীদের উপস্থিতি কম হওয়ার মূল কারণ হলো নারীদের উত্তরদানে অনীহা, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের অসুবিধা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-০৮

উত্তরদাতাদের ধর্ম ও বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

বিভাগ	অমুসলিম				মুসলিম	সর্বমোট
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট		
ঢাকা	২৫	১০	৩	৩৮	৪২	৮০
চট্টগ্রাম	২৫	১০	১২	৪৭	৩০	৭৭
রাজশাহী	১২	৬	৪	২২	২০	৪২
খুলনা	১২	৭	৫	২৪	২০	৪৪
সিলেট	১৬	৮	-	২৪	২৮	৫২
বরিশাল	১৭	৩	৬	২৬	১৮	৪৪
রংপুর	১৩	৬	-	১৯	২২	৪১
মোট	১২০	৫০	৩০	২০০	১৮০	৩৮০

আলোচ্য সারণিতে বিভাগ ওয়ারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য বিন্যস্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি নমুনা নেয়া হয়েছে ঢাকা বিভাগ হতে (মোট ৮০ জন)। আর সবচেয়ে কম নমুনা নেয়া হয়েছে রংপুর বিভাগ হতে (মাত্র ৪১ জন)। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ২৫ জন করে এবং বাকী বিভাগগুলোতে ১২ থেকে ১৭ জন পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম হতে বেশি নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। আর খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে চট্রগ্রাম বিভাগ হতে সর্বাধিক ১২ জন নমুনার অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেট ও রংপুর বিভাগ হতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কোনরূপ অভিমত সংগ্রহ করা যায়নি। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও ঢাকা বিভাগে সর্বাধিক ৪৩ জন উত্তরদাতা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাকী বিভাগগুলোতে এ সংখ্যা ১৮ হতে ৩০ পর্যন্ত নানা সংখ্যায় গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের আয়তন, জনসংখ্যা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থানের অনুপাত ইত্যাদি কারণে সচেতন ভাবেই এসব নমুনা নির্বাচন করে অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-০৯

মতামত প্রদানকারীদের বয়স ভিত্তিক তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ

বয়স	অমুসলিম				মুসলিম	সর্বমোট
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট		
১৮-২৫	৪৭	৮	-	৫৫	৫৭	১১২
২৬-৩৫	৩৭	১৮	১০	৬৫	৫০	১১৫
৩৫-৫০	১৬	১৫	১২	৪৩	৪৩	৮৬
৫০+	২০	৯	৮	৩৭	৩০	৬৭
মোট	১২০	৫০	৩০	২০০	১৮০	৩৮০

তথ্য সংগ্রহে সববয়সের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে নমুনা গুলোকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৮ বছরের নীচে কাউকে এ জরিপে উত্তরদাতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। ১৮ হতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর উত্তরদাতা মূলত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতেই বাছাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী শ্রেণীগুলো ২৬ হতে ৩৫ বছর পর্যন্ত, ৩৬ হতে ৫০ বছর পর্যন্ত এবং সর্বশেষ শ্রেণী ৫০ বছরের উর্দ্ধের সকল উত্তরদাতাদের সম্বয়ে গঠিত। উল্লেখ্য যে, জরিপ কার্যে সর্বোচ্চ ৮০ বচর বয়সী নমুনার অভিমতও নেয়া হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন প্রজন্মের নানা বয়সীদের নিকট ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মনমানসিকতা, অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের আশা আকাক্ষার স্বরূপ অনুসন্ধানই এরূপ শ্রেণীকরণের মূখ্য উদ্দেশ্য।

উত্তরদাতাদের বিভিন্ন তথ্য প্রসঙ্গে এগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক বলে ধরে নেয়া যায়। আলোচ্য পর্যায়ে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতগুলোর বিন্যাস ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো--

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১০

উত্তর প্রদানকারীদের নিজ ধর্মজ্ঞানের মাত্রা (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ভাল	৩৬.৬	৩৬	৪০	৩৭.০	৩০.০
মোটামুটি	৪৩.৩	৫২	৫৩.৩	৪৭.০	৫৬.৭
অল্প	১৬.৬	১২	৬৬	১৪.৫	১৩.৩
মোটেই না	০৫	-	-	১.৫	-

আলোচ্য সারণিতে জরিপকার্যে মতামত প্রদানকারীদের নিজ ধর্ম প্রসঙ্গে জ্ঞানের মাত্রা উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অমুসলিমগণের মোট ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে তারা নিজ ধর্ম সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের হার যথাক্রমে ৩৬.৬, ৩৬ এবং ৪০ শতাংশ। আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে এ হার মোট উত্তরদাতার ৩০ ভাগ।

অপরদিকে ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানের অধিকারী জনগণের পরিমাণই বেশি দেখা যায়। মোট ৪৭ শতাংশ অমুসলিম ও ৫৬.৭ শতাংশ মুসলিম নিজ ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন বলে উত্তর প্রদান করেছেন। আর স্বীয় ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে অল্প জানাশুনার বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ১৩.৩ শতাংশ মুসলিম ও ১৪.৫ শতাংশ অমুসলিম উত্তরদাতা। নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞানই রাখেন না এরূপ জবাব পাওয়া গেছে মাত্র ৫ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিকট হতে। মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সকলেই এ উত্তরে ধর্মজ্ঞান প্রসঙ্গে ইতিবাচক মন্তব্যই প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১১

অন্য ধর্ম প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের জ্ঞানের পরিমাণ (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ভাল	১৬.৭	৬	৬.৭	১২.৫	৫.৫
মোটামুটি	৩৭.৫	৫০	৫০	৪১.৫	৩০.০
অল্প	৪০	৪৩.৩	৪৩.৩	৪২.৫	৫৬.৭
মোটেই না	৫.৯	-	-	৩.৫	৭.৭

উপরোক্ত সারণিতে নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার পাশাপাশি অন্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ও জানা-শোনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। যাতে দেখা যায় যে ৪১.৫ শতাংশ অমুসলিম অন্য ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন। তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের হার যথাক্রমে ৩৭.৫, ৪৬.০, ৫০.০। আর অন্য ধর্ম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন অমুসলিম ১৬.৭ শতাংশ। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ অন্য ধর্ম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন মাত্র ৫.৫ শতাংশ। আর মোটমুটি জ্ঞান রাখেন ৪১.৫ শতাংশ।

উপরোক্ত সারণিতে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, অপর ধর্ম সম্পর্কে সামান্যই জ্ঞান রাখেন এরকম মানুষের সংখ্যাই বেশি। যার হার যথাক্রমে মুসলিম ৫৬.৭ শতাংশ এবং অমুসলিম ৪২.৫ শতাংশ। জরিপে দেখা যায় যে, অপর ধর্ম সম্পর্কে জানা শোনার দিক থেকে মুসলিমদের চাইতে অমুসলিমগণই এগিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১২

নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য যে ধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের জ্ঞান রয়েছে তার বিবরণ

(শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ইসলাম	৫৪.১	২৪	২৬.৭	৪২.৫	২.২
হিন্দু	৭.৫	৪০	৫০.০	২২.০	৫৬.৭
বৌদ্ধ	-	৬	৬.৭	২.৫	১.১
খ্রিস্টান	৫	২৪	২০	১২.০	৬.৭
অন্যান্য	৩৩.৩	৬	-	২১.৫	৩২.২

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম অমুসলিমের মধ্যকার পারস্পরিক ধর্ম সম্পর্কে জানাতে বিষয়টি উল্লেখিত-চার্টে দেখানো হয়েছে। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ার কারণেই হয়তো ৫৪.১ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মতামত দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন। আর এক্ষেত্রে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তারা বেশি জ্ঞান রাখেন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে। যার হার যথাক্রমে ৫০.০ ও ৪০ শতাংশ। ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুগণ বেশি জ্ঞান রাখলেও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানান।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় হলো অপর ধর্ম সম্পর্কে জানার পরিধি বিষয়ে মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে অভিন্নতা রয়েছে। হিন্দুগণ যেমন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানেন, ঠিক মুসলিমগণও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন। যার শতকরা হার হলো ৫৬.৭। অমুসলিমদের শতকরা ৩৩.৩ভাগ ও মুসলিমদের ৩২.২ ভাগ মতামত প্রদানকারী একাধিক উত্তর প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৩

অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের অভিমতের বিবরণ (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
প্রায়ই করি	২৭.৫	২৪	৪৬.৭	২৯.৫	১৬.৭
মাঝে মাঝে	৫৭.৫	৭৬	৫৩.৩	৬১.৫	৬০.০
অংশগ্রহণ করি না	১৫	-	-	৯.০	২৩৩

উপরোল্লিখিত সারণিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অপর ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করা/না করার বিষয়টি জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে দেখানো হয়েছে যে, ৬১.৫ শতাংশ অমুসলিমই মাঝে মধ্যে অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের হার যথাক্রমে ৫৩.৩, ৭৬ ও ৫৭.৫ শতাংশ। প্রায়ই অংশগ্রহণ করেন এরকম অমুসলিমের হারও কম না। এক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা এগিয়ে। তাদের অংশগ্রহণের হার হলো ৪৬.৭ শতাংশ। আর বৌদ্ধ ও হিন্দু যথাক্রমে ২৪ ও ২৭.৫ শতাংশ। ১৫ শতাংশ হিন্দু অপর ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন না বলে মতামত দিয়েছেন।

অপর দিকে ২৩.৩ শতাংশ মুসলিম অপর ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ না করলেও অধিকাংশ মুসলিমই অপর ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রায়ই অংশ গ্রহণ করেন ১৬.৭ এবং মাঝে মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ৬০.০ শতাংশ। উপরোক্ত চার্টের প্রাপ্ত ফলাফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে একটি বিষয়ে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়; আর তা হল–মুসলিম-অমুসলিমের অধিকাংশই, প্রায়ই হোক আর মাঝে মধ্যে হোক, অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৪

নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত মতামতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
প্রায়ই করি	৫০.০	১২	৫৬.৭	৪১.৫	২২.২
মাঝে মধ্যে	৪০.৯	৮৮	৪৩.৩	৫৩.০	৬১.১
অংশগ্রহণ করি না	৯.১	-	-	৫.৫	১৬.৭

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তথা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের পারস্পরিক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান তথা বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের বিষয়ে জরিপে প্রাপ্ত ফল দেখানো হয়েছে উপরোক্ত চার্টটিতে। ১২০ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, ৫০.০ শতাংশ হিন্দু অপর ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রায়ই অংশগ্রহণ করেন, আর মাঝে মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন এরকম হিন্দুর সংখ্যা ৪০.৯ শতাংশ। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের শতভাগ প্রায়ই কিংবা মাঝে মধ্যে অন্য ধর্মের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ১৬.৭ শতাংশ মুসলিম অন্য ধর্মের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ না করলেও অধিকাংশ মুসলিমই প্রায়ই কিংবা মাঝে মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উপরোক্ত সারণিতে একটি বিষয় লক্ষণীয় হলো বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল ধর্মের অধিকাংশ লোকই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক আচার অনুষ্টান (বিয়ে, জন্মদিন) ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন, যা এদেশের মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রমাণ স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৫

প্রতিবেশী হিসেবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মতামতের বর্ণনা (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ভাল ভাবেই	৬৭.৫	৫৪	৪৭.৭	৬১.০	৫৬.৭
গ্রহণীয় না	৫.৮	-	১০	৫.০	৩৮.৯
অসুবিধা নেই	২৫.০	৪০	৩৬.৭	৩০.৫	৪.৪
জানি না	১.৭	৬	৬.৬	৩.৫	-

প্রতিবেশী মুসলিম আর অমুসলিম যাই হোক না কেন এর গুরুত্ব প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে। আর তাই ধর্মের ভিন্নতা প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা কিনা এ বিষয়টির উপর চালিত জরিপের ফলাফল উল্লেখিত চার্টটিতে তুলে ধরা হয়েছে। ২০০ জন অমুসলিমের (হিন্দু ৯০, খ্রিস্টান ৩০, বৌদ্ধ ৫০) উপর চালিত জরিপে দেখা যায় যে, ৬১ শতাংশ অমুসলিম মতামত প্রদান করেছেন অন্য ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীরা তাদের নিকট ভালভাবেই গ্রহণীয়; আর ৩০.০৫ শতাংশ অমুসলিম মনে করেন প্রতিবেশী হিসাবে তাদেরকে গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। মোট কথা প্রায় ৯২.০ শতাংশ অমুসলিমই ধর্মীয় ভিন্নতাকে প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক মনে করেন না। অপরদিকে ১৮০ জন মুসলিমের উপর চালিত জরিপের ফলাফলে দেখানো হয়েছে যে, ৫৬.৭ শতাংশ মুসলিমই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ভালো ভাবেই প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ৩৮.৯ শতাংশ মুসলিম এ ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই বলে মতামত দিয়েছেন। মাত্র অল্প সংখ্যক মুসলিম-অমুসলিম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণীয় নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক অমুসলিম (৩.৫ শতাংশ) উত্তর দেননি বা কিছু জানি না বলে মত দিয়েছেন। বাংলাদেশের সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণে এ তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৬

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে উপহার আদান-প্রদান সংক্রান্ত প্রাপ্ত মতামতের বিবরণ (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
প্রায়ই হয়	৪৬.৭	২৪	৪০	৪০.০	২৭.৮
মাঝে মধ্যে	৪৭.৫	৭৬	৬০	৫৬.৫	৬৮.৯
হয় না	৫.৯	-	-	৩.৫	০৩.৩

উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্কোন্নয়ন সাধিত হয়। আর তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যে এ সুন্দরতম অভ্যাসটির চর্চা হয় কিনা এরকম একটি প্রশ্নের অবতারণা করে ১৮০ জন মুসলিম ও ২০০ জন অমুসলিমের উপর চালিত জরিপের ফলাফল উপরোক্ত সারণিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ৪০.০ শতাংশ ও ৫৬.৫ শতাংশ অমুসলিম মতামত দিয়েছেন যে, তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর মাঝে প্রায়ই এবং মাঝে মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করেন। অপরদিকে প্রায় ৮৭.০ শতাংশ মুসলিম ও একই মতামত উপস্থাপন করেছেন। আর এরকম মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণ এগিয়ে। তাদের সকলেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু ও প্রতিবেশীর মাঝে উপহার আদান-প্রদান করেন। অবশ্য ১৩.৩ শতাংশ মুসলিম ও ৫.৯ শতাংশ হিন্দু ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, তাদের এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন উপহার আদান-প্রদান হয় না। এক্ষেত্রে সমাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রায় ৯৭.০ শতাংশ অমুসলিম এবং ৮৭.০ শতাংশ মুসলিমের মতে, তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধু ও প্রতিবেশীদের মাঝে উপহার আদান-প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৭

বন্ধু নির্বাচনে ধর্মের শর্তারোপ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
করি	৯.১	-	১০	৭.০	৩.৩
করি না	৮৯.২	১০০	৮৩.৩	৯১.০	৯৪.৪
অন্যান্য	১.৭	-	৬.৭	২.০	২.২

বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অভিন্নতা কোন শর্ত কিনা আর এ ব্যাপারে ৩৮০ জন ব্যক্তির উপর পরিচালিত জরিপের ফলাফলই বা কি- এ বিষয়টিই অবতারিত হয়েছে উপরোক্ত সারণিতে।

সারণিতে দেখা যায় যে, ৯১.০ শতাংশ অমুসলিম, যার মধ্যে হিন্দু ৮৯.২ শতাংশ, বৌদ্ধ ১০০ শতাংশ এবং ৮০.০ শতাংশ খ্রিস্টান, এবং ৯৪.৪ শতাংশ মুসলিম অভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। তারা বলেন যে, তারা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ধর্মের শর্তারোপ করেন না। অপর দিকে খুব অল্প সংখ্যক মুসলিম (৩.৩ শতাংশ) ও অমুসলিম (৯.১ শতাংশ) বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ধর্মকে শর্তারোপ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আবার ১২০ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ১.৭ শতাংশ, ৫০ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর ৬.৭ শতাংশ ব্যক্তি কোন উত্তর দেননি কিংবা ভিন্নমত উপস্থাপন করেছেন। একই সাথে ১৮০ জন মুসলিমের উপর পরিচালিত জরিপের ২.২ শতাংশ ব্যক্তিও অনুরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন। উপরোক্ত সারণিতে একটি বিষয় লক্ষণীয় হলো যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মকে শর্তারোপ করেন না। যা এদেশের আন্তঃধর্মীয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৮

স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে ধর্মের ভূমিকা সংক্রান্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
করি	৬৬.৭	৪৮	৫৩.৩	৬০.০	৬৬.৭
করি না	৩২.৫	৪০	৪০.০	৩৫.৫	৩১.১
উত্তর দেয়নি	০.৮	১২	৬.৭	৪.৫	২.২

জৈবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবার গঠন ও বংশ বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। আর এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই ধর্মীয় অভিন্নতার কথা বলেছেন। এ বিষয়টিকে একটি প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করে পরিচালিত জরিপের ফলাফলই ফুটে উঠেছে আলোচ্য সারণিতে।

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলিম (৬৬.৭ শতাংশ) এবং অমুসলিম (৬০.০ শতাংশ) স্ব-ধর্মের হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন। আবার এর বিপরীতে মতামত প্রকাশ করেছেন এরকম ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। ৩৫.০ শতাংশ অমুসলিম (যার মধ্যে ৩২.৫ শতাংশ হিন্দু, ৪০.০ শতাংশ বৌদ্ধ ও ৪০.০ শতাংশ খ্রিস্টান) এবং ৩১.১ শতাংশ মুসলিম স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মকে শর্তারোপ করেননি। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে এ সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য হলেও বাস্তবিকপক্ষে এ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। ভাবার বিষয় হলো, এতে বৈবাহিক ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের চিন্তার পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় যা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপ নিতে পারে। আরেকটি বিষয় হলো, ৪.৫ শতাংশ অমুসলিম ও ২.২ শতাংশ মুসলিম সরাসরি কোন উত্তর দিতে চাননি কিংবা অন্যান্য শর্তারোপ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ১৯

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা বাণিজ্যের মাত্রা সংক্রান্ত উত্তরের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ভাল	৫৮.৩	৪২	৪০	৫১.৫	৪৪.৫
সামান্য	২৯.১	৫২	৫৬.৭	৩৯.০	৩০.০
নেই	১২.৫	৬	৩.৩	৯.৫	২৫.৫

ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ উদার মনোভাব প্রকাশ করলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ কেমন এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে উপরোক্ত চার্টটিতে।

চার্টটিতে দেখা যাচ্ছে যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর্থিক লেন-দেন অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের মাত্রা ১২০ জন হিন্দুর উপর পরিচালিত জরিপে ৫৮.৩ শতাংশই ভাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৪.৪, ৪২ ও ৪০ শতাংশ। ১৮০ জন মুসলিম উত্তরদাতার ৪৪.৪% অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল বলে উত্তর প্রদান করেছেন। সাথে সাথে ৩০.০% মুসলিম ও ৩৯% অমুসলিম আর্থিক লেন-দেন ও ব্যসা-বাণিজ্য সামান্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ প্রায় ৯১% অমুসলিম এবং ৭৫% মুসলিম সামান্য হোক আর বেশি হোক অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে আর্থিক লেন-দেন করেন বলে জানিয়েছেন। আর্থিক লেন-দেন করেন না এমন মুসলিম উত্তর দাতা হলেন ২৫.৫% আর অমুসলিম হলেন ৯.৫%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২০

ভোটদানের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা সংক্রান্ত উত্তরের বিবরণ (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
অবশ্যই	৭.৫	০৬.০	১৩.৩	৭.৫	-
কখনো কখনো	১৬.৭	২২.০	১৬.৭	১৮.০	২০.০
কখনোই না	৭৫.৯	৬৬.০	৬০.০	৭১.৫	৬৪.৫
জানি না	-	৬.০	১০.০	৩.০	১৫.৫

ভোটের রাজনীতিতে মুসলিম-অমুসলিম কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন?, তারা কি স্ব-ধর্মের লোক বিবেচনায় এনে ভোট প্রদান করেন, নাকি প্রার্থীর যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা রেখে ভোট প্রদান করেন এমন একটি প্রশ্নের জবাবে ৭১.৫% অমুসলিম এবং ৬৪.৫% মুসলিম একমত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তারা ধর্ম বিবেচনায় আনেন না। অবশ্য একথার স্ব-পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি। অনেক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম প্রার্থীর তুলনায় হিন্দু প্রার্থী অধিক ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। ভোট দানের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ধর্ম বিবেচনায় আনেন এরকম মুসলিম-অমুসলিমের শতকরা হার হলো ২০.০ ও ১৮.০ জন।

ভোট দানের ক্ষেত্রে ধর্ম বিবেচনায় আনা প্রসঙ্গে কোন মুসলিম এরকম উত্তর না দিলেও শতকরা ৭.৫ জন অমুসলিম জানিয়েছেন, তারা অবশ্যই ভোট দানের ক্ষেত্রে ধর্ম বিবেচনায় আনেন। তবে খ্রিস্টান উত্তরদাতাদের হার এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। তাদের প্রায় ১৪% লোক ভোট দানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ধর্ম বিবেচনায় আনেন বলে জানিয়েছেন। উপরোক্ত চার্টে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় হলো ১৫.৫% মুসলিম এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২১

ধর্ম পালনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
প্রায়ই হই	১৬.৭	০৬.০	৬.৭	১২.৫	১.১
হইনি	৩৯.২	৫৪.০	৫০.০	৪৪.৫	৫৩.৩
মাঝে মধ্যে	৩৭.৫	৩৪.০	৩৩.৩	৩৬.০	২.২১
কখনোই না	৬.৭	৬.০	১০.০	৭.০	৪৩.৩

সকল ধর্মে এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংবিধানে ধর্মীয় সহাবস্থানের কথা বলা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিজ ধর্ম পালনে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা এ প্রশ্নটির জবাব সম্বলিত উপরোক্ত চার্টটিতে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মুসলিম অমুসলিম (শতকরা ৫৩.৩ ও ৪৪.৫ জন) বাধাপ্রাপ্ত হননি বলে জানালেও প্রায়ই বাধা প্রাপ্ত হন কিংবা মাঝে মধ্যে বাঁধাপ্রাপ্ত হন এরকম উত্তর দাতার সংখ্যাও কম নয়। এক্ষেত্রে প্রায় ৪৯% অমুসলিম জানিয়েছেন তারা প্রায়ই কিংবা মাঝে মধ্যে ধর্ম পালনে অন্য ধর্মাবলম্বীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে মুসলিম উত্তরদাতার খুব সামান্য সংখ্যকই (শতকরা ৩.৩ জন) ধর্ম পালনে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বিষয়টি উদ্বেগের ও দুঃখজনক। স্বীয় ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে এবং সে জ্ঞানের আলোকে নিজকে আলোকিত করলে অবশ্যই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। তাই ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি আরো বেশি সতর্ক ও সচেতন হওয়া জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২২

নিজ এলাকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের অভিমত বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
হয়েছে	৩০.০	৪২.০	৪৩.৩	৩৫.০	৫.৫
হয়নি	৩৬.৭	৫৪.০	৫০.০	৪৩.০	৫৫.৫
কখনোই না	৬.৬	-	-	৪.০	১১.২
জানি না	২৫.৭	৬.০	৬.৭	১৮.৫	২৭.৮

১২০ জন হিন্দু, ৫০ জন বৌদ্ধ, ৩০ জন খৃস্টান এবং ১৮০ জন মুসলিমকে বাছাই করে তাদের উপর জরিপ চালিয়ে বাংলাদেশের গ্রাম/পাড়া/মহল্লায় কখনো সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে তা সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সারণিতে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০ জন অমুসলিমের মাত্র ৩৫.০% জন অমুসলিম এবং ৫.৫% মুসলিমের মতে তাদের এলাকার সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা হয়েছে। এটা তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছেন।

আর ৪৩.০% অমুসলিম (যার মধ্যে ৩৬.৭% হিন্দু, ৫৪.০% বৌদ্ধ ও ৫০.০% খৃস্টান) এবং ৫৫.৫% মুসলিম উত্তরদাতার মতে তাদের এলাকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বা দাঙ্গা হয়নি। কখনোই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা হয়নি এমন জবাব দিয়েছেন ৬.০% হিন্দু এবং ১১.২% মুসলিম উত্তরদাতা। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানেন না এমন উত্তর প্রদান করেছেন ২৫.৭% হিন্দু, ৬.০% বৌদ্ধ এবং ৬.৭% খৃস্টান এবং ২৭.৮% মুসলিম উত্তরদাতা। মোটকথা-হয়েছে কিংবা হয়নি বিষয়টি যদি মুসলিম অমুসলিমদের শতকরা হার দেখাতে হয় তাহলে নিম্নরূপ দেখানো যেতে পারে- ৩৫.০% অমুসলিম এবং ৫.৫% মুসলিমের মতে তাদের এলাকায় সম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রায় ৯৪.০% মুসলিম এবং ৬৪.০% অমুসলিম উত্তরদাতার মতে, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা হয়নি, কখনো হয়নি কিংবা তারা এরকমটি জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৩

নিজ এলাকায় জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের বাস্তবতা সম্পর্কে মতামত প্রদানকারীদের উত্তরের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
হয়েছে	১৬.৭	-	৩.৩	১০.৫	২.২
হয়নি	৫০.০	৭৬.০	৭০.০	৫৯.৫	৫০.০
কখনোই না	৬.৭	-	১০.০	৫.৫	২১.১
জানি না	২৬.৬	২৪.০	১৬.৭	২৩.৫	২৬.৬

জোরপূর্বক কাউকে ধর্মান্তরিত করার নীতি কোন ধর্মই অনুমোদন করেনি। তথাপিও ধর্মীয় অনুরাগী হয়ে এ কাজটির প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়টি বাংলাদেশে কি অবস্থা বিরাজ করছে এটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জরিপ কার্য চালিয়ে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা তুলে ধরা হয়েছে উপরোক্ত চার্টটিতে।

উপরোক্ত চার্টটিতে দেখা যাচ্ছে যে, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হয়নি বা কখনো হয়নি এমন মতামত দিয়েছেন ৭১.১% মুসলিম এবং প্রায় ৬৫% অমুসলিম। আবার এ রকম বিষয়/ঘটনা জানেন না বলে মত দিয়েছেন প্রায় এক চতুর্থাংশ মুসলিম ও অমুসলিম। যা কখনো গোপনে না ঘটাটাই স্বাভাবিক। তাই বলা যায় প্রায় শতকরা ৯০ জন অমুসলিম এবং ৯৫ জন মুসলিম জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হয়নি বা এ বিষয়ে জানেন না বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ১২০ জন হিন্দুর প্রায় ১৭% লোক জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হয় বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৪

বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে নিজ এলাকার দায়িত্বশীল লোকদের ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবস্থা সংক্রান্ত উত্তরের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
হ্যাঁ	৪৬.৭	৭৮.০	৩৩.৩	৫২.৫	২২.২
না	৪৩.৩	২২.০	৬৬.৭	৪১.৫	৭৭.৮
উত্তর দেয়নি	১০.৭	-	-	৬.০	-

প্রতিটি এলাকার (গ্রাম/পাড়া/মহল্ল া) স্থানীয় প্রশাসন, মাতব্বর/চেয়ারম্যানগণ বিচারকার্য বা বিবাদ মীমাংসার কার্য পরিচালনা করে থাকেন। এক্ষেত্রে মাতব্বর/চেয়ারম্যানগণ কোন ধর্মের লোকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট কিনা এ বিষয়টি ৩৮০ জন মুসলিম অমুসলিমদের মাঝে জরিপ পরিচালনা করে তাদের মতামতের আলোকে হ্যাঁ/না জবাব সম্বলিত দুটি উপায়ে উপরোক্ত সারণিটি তৈরী করা হয়েছে।

সারণিতে দেখা যায় যে, ৫২.৫% অমুসলিম (৪৬.৭% হিন্দু, ৭৮.০% বৌদ্ধ এবং ৩৩.৩% খৃস্টান) এবং শতকরা ২২.২% জন মুসলিম উত্তর দাতার মতে, চেয়ারম্যান বা মাতব্বরগণ বিচার কার্য বা বিবাদ মীমাংসায় বিশেষ কোন ধর্মের লোকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে ৪১.৫% অমুসলিম (৪৩.৩ হিন্দু, ২২.০% বৌদ্ধ ও ৬৬.৭% খৃস্টান) এবং ৭৭.৮% মুসলিম উত্তর দাতার মতে, স্থানীয় প্রশাসনে মাতব্বর বা চেয়ারম্যানগণ বিচারকার্য বা বিবাদ মীমাংসায় কোন ধর্মের লোকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়। সারণিতে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, ১২০ জন হিন্দু উত্তর দাতার মধ্যে ১০.৭% জন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৫

দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যে ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ইসলাম	৭৮.৫	৫৩.৯	৭০.০	৬৮.৫৭	১০০
হিন্দু	১৯.৭	২৩.১	২০.০	২০.৯	--
বৌদ্ধ	১.৮	১৫.৩	১০.০	৭.৭	--
খ্রিস্টান	--	৭.৭	--	২.৮	--

এই সারণিটিও পূর্বোক্ত প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত। পূর্বের প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন মুসলিম ৪০ জন, হিন্দু ৫৬ জন, বৌদ্ধ ৩৯ জন ও খ্রিস্টান ১০ জন। ৩৮০ জন উত্তর দাতার মধ্যে পূর্বের প্রশ্নের হ্যাঁ জবাব দানকারী এমন ১৪৫ জনকে নিয়েই উপরোক্ত সারণিটি তৈরী করা হয়েছে।

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫৬ জন হিন্দু উত্তর দাতার মধ্যে ৭৮.৫% এর মতে, স্থানীয় মাতব্বর বা চেয়ারম্যানগণ বিশেষত ইসলাম ধর্মের লোকদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হন। ৫৩.৯% বৌদ্ধ এবং ৭০.০% খ্রিস্টানও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। শতভাগ মুসলিমই বলেছেন যে, স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন বিচারকার্য পরিচালনা কিংবা বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের লোকদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হন। ১৯.৭% হিন্দু, ২৩.১% বৌদ্ধ এবং ২০.০% খ্রিস্টান অবশ্য মনে করেন যে, এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন হিন্দু ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হন। আবার ১৮% হিন্দু, ১৫.৬% বৌদ্ধ এবং ১০০% খ্রিস্টান উত্তর দাতার মতে স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের লোকদের পক্ষপাত দুষ্ট হন। ৭.৭% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উত্তরদাতা অবশ্য এক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মের লোকদের পক্ষপাত দুষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। বস্তুত নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও নিজ এলাকার অবস্থা বিবেচনায় এ বাস্তবতা ফুটে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ প্রশ্নটি ছিল Open Ended Question অর্থ্যাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে মতামত প্রদানকারীদের উন্মুক্ত ও চিন্তাশীল জবাব প্রার্থিত ছিল। গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা যায় উত্তরগুলো মোটামুটি কয়েকটি মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যথা- চমৎকার, ভাল, সন্তোষজনক, মোটামুটি, ভাল নয় আবার খারাপও নয়, ভাল তবে আরো উন্নতি দরকার, খারাপ ইত্যাদি। অন্যরকম উত্তরও লক্ষ্য করা গেছে তবে এগুলোর সংখ্যা খুবই কম। এগুলো হলো সম্পীতিপূর্ণ, মিলেমিশে থাকি, কোন কোন স্থানে খারাপ, স্থান-কাল সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য তবে ভাল ইত্যাদি। নিচের সারণিতে এ বিষয়টি বিন্যস্ত করা হলো-

সারণি- ২৬

বাংলাদেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের অবস্থা প্রসঙ্গে প্রাপ্ত মতামতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

মতামত	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
ভাল চমৎকার	৩১.৭	৩০.০	৪০.০	৩২.৫	৬৩.৩
মোটামুটি	৪১.৭	৪২.০	৩৬.৭	৪১.০	২৩.৩
ভাল, তবে উন্নতি আবশ্যক	৮.৩	--	১০.০	৬.৫	৮.৮
খারাপ	১০	৮.০	৩.৪	৮.৫	৪.৪
অন্যান্য	৬.৭	১২.০	১০.০	৮.৫	--
উত্তর দেয়নি	১.৭	০৮.০	--	৩.০	--

বাংলাদেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের সার্বিক অবস্থা নিরূপণে এই প্রশ্নটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রশ্নের উত্তরদানে মাত্র ৩ শতাংশ অমুসলিম নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন। ২০০ জনের মধ্যে যার সংখ্যা মাত্র ৬ জন। বাকী ১৯৪ জন অমুসলিম এবং ১৮০ জন মুসলিম বাংলাদেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের মূল্যায়ন করেছেন নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে। এক্ষেত্রে এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির অবস্থা খারাপ, বা ভাল নয়। সন্তোষজনক নয়, শোচনীয় ইত্যাদি মন্তব্য করেছেন মাত্র ৮.৫ শতাংশ অমুসলিম ও ৪.৪ ভাগ মুসলিম উত্তর দাতা। বাকী সবাই মূলত ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করেছেন। মুসলিমদের ৬৩.৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থানের চিত্র চমৎকার। আর অমুসলিমদের ৩২.৫ শতাংশ ও ৪১.০ শতাংশ লোক মনে করেন এদেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অবস্থা ভাল অথবা মোটামুটি মানের, খারাপ নয়। উত্তরদাতাদের ৮.৫ শতাংশ অমুসলিম নিজেদের চিন্তাচেতনা প্রকাশে অন্যরূপ মন্তব্য করেছেন। যেমন- এদেশের ধর্মীয় সহাবস্থানের চিত্র আপেক্ষিক, স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে ভাল-খারাপ, কিংবা রাজনৈতিক শাসনামলের পরিবর্তনে এর সার্বিক অবস্থাও পরিবর্তিত হয় ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৭

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
রাজনীতি	৩৩.৩	৩৬.০	৩৩.৩	৩৪.০	৫৮.৮
ধর্ম	২৬.৭	৮.০	৪৬.৭	৩৫.০	১৪.৪
ব্যক্তিগত আক্রোশ	১১.৭	৪.০	১৩.৩	১০.০	১৪.৪
অন্যান্য	-	-	-	-	৫.৫
অর্থনৈতিক	২০.০	১২.০	৬.৭	১৬.০	৫.৫
উত্তর দেয়নি	৮.৩	-	-	৫.০	১.১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গা-এর উৎপত্তির কারণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ভিন্নতা না ব্যক্তিগত আক্রোশ এটি জানার লক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিমের মধ্যে পরিচালিত জরিপে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা উপরোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৪% অমুসলিম ও প্রায় ৫৮% মুসলিম অভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন, রাজনৈতিক কারণেই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন / দাঙ্গা সংগঠিত হয়। যার নজির আমরা দেখতে পাই জাতীয় নির্বাচনোত্তর সময়ের চিত্রে। আবার ৩৫% অমুসলিম এবং ১৪.৪% মুসলিম বলেছেন, ধর্মীয় কারণেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে থাকে। শতকরা ১০ জন অমুসলিম এবং ১৪.৪ মুসলিমের মতে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও দাঙ্গা হয়ে থাকে। শতকরা ১৬ জন অমুসলিম অর্থনৈতিক কারণকেই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন/দাঙ্গার কারণ বলে উল্লেখ করেন। ৮.৩% হিন্দু উত্তরদাতা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৮

বাংলাদেশে চাকরি ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
পুরোটাই	২০.৯	০৪.০	৬.৭	১৪.৫	৪.৪
অনেকটা	৫৬.৭	৭২.০	২৬.৭	৫৬	২৩.৩
সামান্য	১০.৯	১৮.০	৫০.০	১৮.৫	৩২.২
নেই	৮.৩	৬.০	১০.০	৮.০	৪০.০
উত্তর দেয়নি	৩.৩	-	৬.৭	৩.০	-

বাংলাদেশের চাকরি পাবার ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান বলে বিবেচিত হবে ।তবে মুসলিম প্রধান দেশ হওয়াতে ধর্মীয় কারণে কোন বৈষম্য হয় কিনা এ ব্যাপারে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের একটি ফলাফল তুলে ধরে হয়েছে উপরোক্ত সারণিতে ।

প্রায় ২১% হিন্দুসহ প্রায় ১৫% অমুসলিম মনে করেন চাকরি পাবার ক্ষেত্রে পুরোটাই বৈষম্য হয় । আর অনেকটা বৈষম্য হয় বলে মনে করেন ৫৬% অমুসলিম ও ২৩.৩% মুসলিম । এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ১২০ জন হিন্দু উত্তর দাতার শতকরা ৮৬ জনের মতে পুরোটাই, অনেকটা কিংবা সামান্য যে পরিমাণেই হোক বৈষম্য হয় । আবার ৯৪% বৌদ্ধ ও ৮৩% খ্রিস্টান এবং ৫৬% মুসলিম একই মত প্রকাশ করেছেন । অবশ্য ৪০% মুসলিম উত্তরদাতার মতে চাকরির ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে কোন বৈষম্য হয়না । এ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন ৩৩% হিন্দু ও ৬.৭% খ্রিস্টান উত্তরদাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ২৯

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
পুরোটাই	১৫.৯	০৬.০	--	১১.০	--
অনেকটা	৪০.০	২২.০	৩০.০	৩৪.০	১৭.৮
সামান্য	২৯.১	৭২.০	৬৬.৭	৫৫.৫	৪২.২
নেই	১৩.৩	--	৩.৩	৮.৫	৪০.০
উত্তর দেয়নি	১.৭	--	--	১.০	--

প্রচলিত আইনে ধর্মীয় বৈষম্য আছে কিনা, আর থাকলেই বা তার পরিমাণ কতটুকু- এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ধারণা জরিপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে উপরোক্ত সারণিতে।

সারণিতে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্মীয় বৈষম্য পুরোটাই-এরকম মত দিয়েছেন ১৫.৯% হিন্দু ও ৬.০% বৌদ্ধ উত্তরদাতা। আর অনেকটা বৈষম্য রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন ৩৪% অমুসলিম (প্রায় ৪০% হিন্দু, ২২% বৌদ্ধ ও ৩০% খ্রিস্টান)। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন প্রায় শতকরা ১৮ জন মুসলিম। আর সামান্যই বৈষম্য রয়েছে এমনটা বলেছেন অধিকাংশ মুসলিম (৪২.২%) ও অমসুলিম (৫৫.৫%), যার মধ্যে রয়েছে হিন্দু ২৯.১%, বৌদ্ধ ৭২.০% এবং খ্রিস্টান ৬৬.৭% উত্তরদাতা। ১৮০ জন মুসলিম উত্তরদাতার শতকরা ৪৪ জনই মনে করেন বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্মীয় কোন বৈষম্য নেই। উল্লেখ্য যে ১২০ জন হিন্দু উত্তরদাতার ১.৭% নমুনা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৩০

বাংলাদেশে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
পুরোটাই	৫.৯	১২.০	১৩.৩	১৩.৫	১০.০
অনেকটা	৫৮.৩	৫২.০	৩৬.৭	৫৩.৫	৩৮.৮
সামান্য	১৬.৭	৩০.০	৫০.০	২৫.০	৩৩.৩
নেই	১০.৭	৬.০	-	৭.০	১৭.৮
উত্তর দেয়নি	৮.৬	-	-	১.০	

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব কতটুকু? এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামত জানার জন্যে পরিচালিত জরিপে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান উত্তরদাতাদের মতামত এসেছে উপরোক্ত সারণিতে।

সারণির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব পুরোটাই এমন মত প্রকাশ করেছেন ৫.৯% হিন্দু ১২.০% বৌদ্ধ, ১৩.৩% খৃস্টান ও ১০.০% মুসলিম। আবার রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনেকটাই এরকম উত্তরদাতার সংখ্যাই বেশি। যেমন ৫৩.৩% অমুসলিম (যার মধ্যে ৫৮.৩% হিন্দু, ৫২.০% বৌদ্ধ ও ৩৬.৭% খ্রিস্টান) এবং ৩৮.৮% মুসলিম উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সামান্য এরকম উত্তরদাতার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। ২৫.০% অমুসলিমের মধ্যে হিন্দু ১৬.৭% বৌদ্ধ ৬০.০% ও খ্রিস্টান ৫০.০% জন উত্তরদাতা সামান্যই প্রভাব রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১৮০ জন মুসলিমের মধ্যে ৩৩.৩% মুসলিম উত্তর দাতাও উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব নেই এমন উত্তরদাতার সংখ্যা মুসলিম ১৭.৮% এবং অমুসলিম ৭.০% জন। এ প্রশ্নের উত্তর দেননি এমন হলেন ৮.৬% হিন্দু। চার্টে একটি বিষয় লক্ষণীয় হলো যে, প্রায় ৮০% হিন্দু, ৯০% বৌদ্ধ, ১০০% খ্রিস্টান ও প্রায় ৮৩% মুসলিম জনসাধারণের মতে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব রয়েছে, তা পুরোটাই হোক, অনেকটাই হোক আর সামান্য যে মাত্রায়ই হোক না কেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৩১

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাব প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
পুরোটাই	৩.৯	০৬.০	--	৪.০	৪.৪
অনেকটা	৪১.৭	২২.০	২৩.৩	৩৪.০	২৭.৮
সামান্য	৪৫.৯	৫৪.০	৫০.০	৪৮.৫	৫৪.৪
নেই	৬.৭	১৮.০	২৩.৩	১২.০	১৩.৩
উত্তর দেয়নি	১.৭	--	৩.৩	১.৫	--

উল্লিখিত চার্টটিতে মুসলিম প্রধান দেশ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

৪৮.৫% অমুসলিম (৪৫.৯ হিন্দু, ৫৪.০% বৌদ্ধ ও ৫০% খ্রিস্টান) ও ৫৪.৪% মুসলিমের মতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাব সামান্যই রয়েছে। অনেকটা প্রভাব রয়েছে এমন মতামত দিয়েছেন শতকরা ৩৪ জন হিন্দু ও ২৭.৮ জন মুসলিম। জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব নেই এমন মত দিয়েছেন মুসলিম শতকরা ১০.৩ জন এবং অমুসলিম ১২.০ জন।এই চার্টটিতেও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় আর তা হলো পুরোটাই, অনেকটা কিংবা সামান্য যাই হোক না কেন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন ৮৭% হিন্দু, ৮২.০% বৌদ্ধ, ৭৩.০% খ্রিস্টান এবং প্রায় ৮৬.০% মুসলিম উত্তরদাতা। উল্লেখ্য যে, ১.৭% হিন্দু এবং ৩.৩% খৃস্টান উত্তরদাতা এ প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৩২

বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
পুরোটাই	৪.১	-	-	২.৫	৩.৩
অনেকটা	৩৩.৩	১২.০	২৬.৭	২৭.০	১৬.৭
সামান্য	৪৫.৯	৬৪.০	৬৬.৭	৫৩.৫	৩২.২
নেই	১৬.৭	২৪.০	৬.৭	১৭.০	৪৭.৮

শিক্ষা সংবিধান প্রদত্ত মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে কোন বৈষম্য হয় কিনা, আর হলে তার মাত্রা কিরূপ- এরকম একটি প্রশ্নের জবাব খোঁজতেই ৩৮০ জন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সহযোগিতায়–তাদের উত্তরের/মতামতের আলোকে উপরোক্ত সারণিটি তৈরী করা হয়েছে–সারণিতে তাকালে দেখা যায় যে, মাত্র ৪.১% হিন্দু এবং ৩.৩% মুসলিমের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা পুরোটাই। ২৭.০% অমুসলিম (হিন্দু ৩৩.৩%, বৌদ্ধ ১২.০%, খ্রিস্টান ২৬.৭%) এবং ১৬.৭% মুসলিম উত্তরদাতার মতে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা অনেকটাই। আবার বৈষম্যের মাত্রা সামান্যই বলেছেন ৫৩.৫% অমুসলিম এবং ৩২.২% মুসলিম। কোন বৈষম্য নেই এমনটি বলেছেন প্রায় ৪৭.০% মুসলিম এবং ১৭.০% অমুসলিম উত্তরদাতা। ১.১% মুসলিম উত্তরদাতা এ প্রশ্নটির উত্তর এড়িয়ে যান। সারণিতে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, ১২০ জন হিন্দু উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় ৮৪.০% হিন্দু, ৭৭.০% বৌদ্ধ, প্রায় ৮৪.০% খ্রিস্টান এবং ৫৪.০% মুসলিম উত্তরদাতা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছেন, তা পুরোমাত্রা, অনেকটা কিংবা সামান্য মাত্রায়ই হোক না কেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৩৩

বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অভিমতের বিন্যাস (শতকরা হিসাবে)

	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
সরকার ও রাজনীতিবিদ	২৫.৯	৩৪.০	৩৩.০	৮.৫	২২.২
ধর্মীয় নেতাগণ	৯.১	-	২০.০	৩৭.৫	১৩.৩
ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ	৩৮.৩	৩৬.০	৩৬.৭	১৬.০	৫০.০
সমাজপতি ও স্থানীয় প্রশাসন	১১.৭	৩০.০	১০.০	-	১০.০
অন্যান্য	১৫.০		-	৯.০	৪.৪

বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন এ প্রসঙ্গে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করতে দিয়ে ১২০ জন হিন্দু ৫০ জন বৌদ্ধ ৩০ জন খ্রিস্টান ও ১৮০ জন মুসলিমের উপর জরিপ চালিয়ে যে মতামত পাওয়া গেছে তার আলোকে উপরোক্ত সারণিটি তৈরী করা হয়েছে।

সারণিতে দেখা যায় যে, অমুসলিম ২০০ জনের প্রায় ৩৮.০% জন এবং ১৮০ জন মুসলিমের ৫০.০% জনসাধারণ ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন। আবার ২৯.০% অমুসলিম ও ২২.২% মুসলিম উত্তরদাতা সরকার ও রাজনীতিকগণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। ৯.১% হিন্দু, ২০.০% খ্রিস্টান ও ১৩.৩% মুসলিম উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাগণের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ১৬.০% অমুসলিম এবং ১০.০% মুসলিম উত্তরদাতা এক্ষেত্রে সমাজপতি ও স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্বের কথা বলেছেন। ১২০ জন হিন্দু উত্তরদাতার ১৫.০% এবং ১৮০ জন মুসলিম উত্তরদাতার ৪.৪% উল্লিখিত চারটি শ্রেণী ছাড়াও সমাজের অপরাপর সদস্য তথা সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালার সর্বশেষ প্রার্থিত বিষয়টি ছিল বাংলাদেশের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উত্তরদাতাদের সুপারিশ। এক্ষেত্রে নানারূপ অভিমত দেখা গেলেও মোটামুটি সকল পরামর্শের মর্মার্থ কয়েকটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ। নিম্মোক্ত সারণিতে এ বিষয়গুলি বিন্যস্ত করা হলো-

সারণি- ৩৪

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে মতামত প্রদানকারীদের প্রদত্ত সুপারিশের বিবরণ (শতকরা হিসাবে)

সুপারিশকৃত বিষয়	অমুসলিম				মুসলিম
	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	মোট	
নিরপেক্ষতা	২৮.৩	৬	-	১২.৫	৭.৭
ঐক্যবদ্ধতা	১০.২	০৮	৬.৬	১১	১৭.৭
মানবতা	১৬.৭	৫৪	২০.০	২৬.৫	১৭.০
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা	২৬.৭	১০	২৩.৩	২২	১৮.৭
ধর্মজ্ঞান ও শিক্ষা	-	-	৬.৬	০১	১৬.৭
সহনশীলতা	৩.৩	-	৩.৩	২.৫	-
অন্যান্য	৮.৩	১২	২৩.৩	১৫.০	১৭.৭
উত্তর দেয়নি	৬.১	১০	১৬.৭	১১.৫	৫.০

আলোচ্য সারণিতে দেখা যায় যে ঐক্যবদ্ধতা, মানবতা, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বীই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের ৬৪ শতাংশ মানবতাবোধের প্রসারকেই সম্প্রীতি বৃদ্ধির প্রধানতম উপায় বলে মনে করেন। যা অমুসলিমগণের ২৬.৫ শতাংশের মতামতের প্রতিফলন। এছাড়া উত্তরদাতাদের নানারূপ মতামত প্রদানের ফলে দেখা যায় যে অন্যান্য অর্থ্যাৎ আরো নানারূপ পরামর্শও সমষ্টিগতভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদের মধ্যে রয়েছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতি, দেশপ্রেম, বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তার এরূপ ধরনের নানা মন্তব্য। মূলত বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় উন্নয়নে সবগুলো সুপারিশই বাস্তবধর্মী ও যৌক্তিক। নিম্নে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত কতিপয় সুপারিশ হুবহু উল্লেখ করছি-

- প্রত্যেককে নিজের অবস্থান থেকে সবাইকে সমান ভাবতে হবে। বড় কথা নিজেকে বদলাতে হবে সবার আগে।
- অন্যধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি না করে নিজ ধর্মপালন করা উচিত।
- নিজ ধর্মকে জানুন এবং অন্যদের ধর্ম পালনে বাধার সৃষ্টি করবেন না।
- অহিংসাপরায়ণ হওয়া।
- মানুষ মানুষকে ভালবাসবে এটাই আমার সুপারিশ।
- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ইত্যাদি মনের মধ্যে আনয়ন করা।
- স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা ও অন্যায় না করা।
- সকলকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে দিতে হবে।
- ছোটবেলা থেকেই শিশুদের নিজ ধর্মের সাথে সাথে অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া উচিত।
- প্রাথমিক পর্যায় থেকে বাংলাদেশের বিদ্যামান সকল ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে পাঠ্যপুস্তকে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
- সকলকে আরো ভালভাবে শিক্ষিত করে সকলের মধ্যে কোন ধর্মীয় বিভেদ না রাখা।
- মানুষের ধর্ম বিবেচনায় না এনে তাকে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ কার্যের প্রাপ্ত অভিমতের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে এদেশে ধর্মীয় সহনশীলতা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির অনুশীলন বর্তমান। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নামে দাঙ্গা হাঙ্গামা, সংঘাত ও নির্যাতন খুব একটা নেই। তবে উত্তরদাতাদের অভিমত ব্যক্তিগত চিন্তাধারণার প্রেক্ষিতে হওয়ায় এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তে পৌছান প্রায় অসম্ভব। বরং প্রত্যেক নমুনা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের ও মানসিকতার প্রতিনিধি। এ হিসাবে সামষ্টিক ফলাফল এদেশের সামগ্রিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে ধরে নেয়া যায়। কেননা জাতি ধর্ম বর্ণ, পেশা, বয়স, চিহ্ন ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের ব্যক্তিত্বই এ জরিপকার্যে মতামত প্রদান করেছেন। কেননা জরিপের মতামত প্রদানকালে নানা বিষয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, সমসাময়িক পরিবেশ, শিক্ষা, সমাজকে প্রভাবিতকারী উপাদান সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উত্তর প্রদান করেছেন।

তবে সম্পর্ক ধারণাটি যেহেতু অস্পষ্ট একটি প্রত্যয়, সেহেতু এর সুনির্দিষ্ট স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব নয়। তাছাড়া মানব মনের ন্যায় সম্পর্কও প্রতিনিয়ত গতিশীল থাকায় এর প্রকৃতি অনুসন্ধান জটিলতর বিষয়। তথাপিও মানুষের চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা ও মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে সারা বিশ্বে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ভিত্তি

সামাজিক জীব হিসাবে জীবনে চলার পথে মানুষকে নানা বর্ণ, গোত্র, পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে মিলেমিশে চলতে হয় । আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় সামাজিক প্রথা, আচার, বিচার ও অলিখিত নীতিমালাই মূলত একটি সমাজের সম্পর্ক নিরূপণ করে থাকে । এগুলো ব্যতীত ইচ্ছামত সামাজিক আচরণ কোন মতবাদ বা ধর্মেই গ্রহণযোগ্য নয় । বরঞ্চ মানবতাবোধ ও সম্প্রীতি রক্ষাকল্পে যে ধরনের আচরণ কাম্য সেটিই সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের মানুষের মেনে চলা উচিত । সমাজের এইসব আচরণ কিছুটা প্রথাভিত্তিক, কিছুটা মানব অভিজ্ঞতার ফসল, কতকটা আবার নানা ধর্মের অনুশাসন, আবার অনেকটাই নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলোকে নির্ধারিত । এজন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে আচরণ ও সম্পর্কগত ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। মুসলিম সমাজে প্রচলিত সম্পর্ক রক্ষার নীতিমালা অন্য ধর্মেরে অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত নয়। তেমনি হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণদের সামাজিক আচরণ ও সম্পর্ক শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রমুখ বর্ণের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এখানে বণবিশ্বাস মানুষকে তার সামাজিক ও সার্বিক সম্পর্ক রক্ষার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। আবার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে আইন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদিরও অবদান লক্ষ্য করা যায়। মূলত পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকৃতি এমনি এমনিই গড়ে উঠেনি। বরং হাজার বছরের চিন্তা-চেতনা মননশীলতা ও সমাজের প্রভাব উপাদান সমূহ মিলে গড়ে তোলা হয়েছে এর ভিত্তিমূল ।

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গেও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ নির্দেশনা ঐশী ও সার্বিকভাবে মানব জাতির জন্য কল্যাণকর । ইসলামের এ নির্দেশনার ভিত্তি মূলত এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে । এ লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সম্প্রদায় বর্ণ ও গোত্রগত ভেদাভেদ মানুষকে কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে কুরআন ও হাদীসের নানা বাণী তার ইঙ্গিত বহন করছে। ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হেদায়াত তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সকল ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত বিধানাবলীর পূর্ণ প্রয়োগ করা । আর এ উদ্দেশ্য পূরণে ইসলামের প্রধানতম পদ্ধতি হলো 'দাওয়াত' বা ইসলামের প্রতি আহ্বান । অমুসলিমগণের সাথে মুসলিমগণের সম্পর্ক তৈরী হওয়াটা ইসলামেরই দাবী। ইসলামই এ বিষয়ে মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে। দাওয়াত তথা ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী -"তোমারই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কর । অসৎকর্মের নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর" ।[১]

---

[১] আল কুরআন, ৩ঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

আর এটা মানবীয় সহজাত প্রবৃত্তি যে মানুষ কেবলমাত্র তার শুভাকাঙ্খী, মঙ্গলকামী ও বন্ধুদের পরামর্শ উপদেশই গ্রহণ করে। নিদেনপক্ষে পারস্পরিক ভাল সম্পর্কের কারণে অন্য ব্যক্তির কথা-প্রচারণা শোনার আগ্রহ বোধ করে। শত্রু কিংবা খারাপ আচরণকারীর পরামর্শ শোনা কিংবা প্রচার-প্রচারণা গ্রহণ করা মানব চরিত্র বিরোধী। এমনকি এটাও অস্বাভাবিক যে মানুষ তার শত্রু কিংবা নিপীড়কদের ভাল কথা গ্রহণ করেছে। কেননা পারস্পরিক আচরণ ও সম্পর্কের অবনতি প্রথমেই মানুষকে নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে একমুখী করে তোলে, নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেওয়ায় ভাল কথাও গ্রহনীয় হয় না। স্বভাব ধর্ম ইসলাম মানবজাতির এই স্বভাব বা প্রকৃতির বিরোধিতা করেনি । বরঞ্চ ইসলাম প্রচার তথা দাওয়াতের স্বার্থে এ বিষয়কে কাজে লাগিয়েছে যথাযথভাবে। ইসলাম ধর্মপ্রচারের স্বার্থে অমুসলিমদের সাথে উন্নত আচরণের নির্দেশ দিয়েছে, দিয়েছে মানুষ হিসাবে সকলের সমমর্যাদা । এজন্যই ইসলামের দাওয়াতের এত দ্রুত প্রসারতা। ইসলামের বাণী শুনার সাথে সাথে অমুলিমদের প্রতি মুসলমানদের চরিত্রগত মাধুর্য মানুষকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে সহজেই । মহানবী (স) এর জীবন হতে নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ হাজারো উদাহরণ বিদ্যমান । এমনকি অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের পূর্বেই শুধু উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা দেখে ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে এ অবস্থা কিছুটা কমে আসলেও একেবারে বিরল ছিল না। বিশেষত এই উপমহাদেশে তথা বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উন্নত চরিত্র, মানবিকতার আদর্শ ও সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির প্রভাব কোন অংশেই কম ছিল না । অমুসলিম মনীষীদের নানা বাণীতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এম. এন. রায় লিখেন-

> "ইসলামের অভূতপূর্ব বিজয় যতোটা তলোয়ারের জোরে। তার থেকে অনেক বেশি ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও মৈত্রীয় নীতিতে। যা সে সময়ে শ্রেণী ও জাতিভেদে জর্জরিত রোমান, বাইজেনটাইন, পারস্য এবং পরে ভারতবর্ষের সমাজ যে দমনমূলক আইন কানুনে শাসিত হতো তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। ইসলাম দেখা দিল জীর্ণ প্রায় প্রাচীন সভ্যতা থেকে বিদায় নেয়া সমাজ ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে। মুক্তি ও সাম্যের বাণীই ইসলামের অভিনব অভ্যুত্থান প্রসারের শক্তির মূল উৎস" ।[২]

ঐতিহাসিক টমাস আর্ণল্ড বলেন- "আমরা যখন প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টানদের প্রতি মুসলিমদের এমন বিস্ময়কর ন্যায় বিচার, সততা ও ধর্মীয় উদারতা দেখতে পাই, তখন দিনের আলোর মত একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তরকাবির জোরে ইসলামের প্রচার প্রসার সম্পর্কে যে প্রচারণা চালানো হয় তা আদৌ বিশ্বাস, এমনকি ভ্রূক্ষেপ করার যোগ্যতাও রাখে না"। [৩] প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ডোজি বলেন- "অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের উদারতা ও উন্নত আচরণ তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তারা ইসলামের মধ্যে এমন সরলতা ও উদারতা দেখতে পেয়েছে, যা তারা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে কোনদিনই দেখতে পায়নি"। [৪]

---

[২] মানবেন্দ্রনাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*, ঢাকা, প্যাপীরাস প্রকাশনী, তাঃ বিঃ, পৃ.৩৮

[৩] তাওফিক সুলতান, *তারীখু আহলিয যিম্মাহ ফিল ইরাক*, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪০৩ হি, পৃ. ৭০ (ডোজির নজরাত ফি তারিখিল ইসলাম সূত্রে বর্নিত)

[৪] টমাস আর্ণল্ড, *দ্য প্রিচিং অব ইসলাম*, (অনু : আদ দাওয়াতু ইলাল ইসলাম), মিসর : মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৭০, পৃ-৮১.

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনে পুর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী শান্তি আনয়ন ইসলামের অন্যতম মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । এ শান্তি শুধুমাত্র পার্থিব বা সামাজিক নয়, বরং মৃত্যু পরবর্তী অসীম জীবনের শান্তিও এর আওতাভুক্ত । আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। ইসলামে পরকালীন শান্তির মর্ম হলো আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্নসমর্পন করে শান্তি স্থাপন করা । অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে পরকালীন চিরশান্তির জান্নাত লাভ করা। আর ইহকালীন শান্তির মর্ম হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য মৈত্রীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে । শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করে কেউ কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হবে না। বস্তুত ইসলামের অনুশাসনগুলোর প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ সত্যই পরিস্ফুটিত হয়। পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি-ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলাম যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। এসকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য মানুষের আচরণগত সীমানা নির্ধারণ, যা দ্বারা মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শান্তি স্থাপনে ইসলাম আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে । এজন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করাও ইসলামে বৈধ। তবে ইসলামে শান্তির ধারণা এতই গভীর যে যুদ্ধাবস্থায়ও অন্যায়ভাবে কারো শান্তি নষ্ট করা যাবে না; যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সাধু সন্ন্যাসী, বেসামরিক লোক যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি ইত্যাদি কারো প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এমনকি, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় আচরণ এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার মুসলিমদের উপর আবশ্যক। শান্তির প্রতি ইসলামের এ আকুলতা অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে উন্নত ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষাই দেয়। কেননা সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ, নির্যাতন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ, তর্ক-বিতর্ক, সমালোচনা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাধা। সুতরাং এগুলো হতে বিরত থাকা এবং এর প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামের অনুশাসন ও প্রকৃত মুসলিমগণের দৃষ্টান্ত শান্তি স্থাপনে ইসলামের সফলতাই বর্ণনা করে যুগে যুগে। এম. এন. রায় বলেন- "ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কেবল বেহেশতের প্রেরণাই দেখায়নি, পার্থিব জগতের বিজয়ের জন্যও তাদের অনুপ্রেরণা দিল। প্রকৃত পক্ষে এই জগতে কিভাবে আসল সুখ শান্তি পাওয়া যায় তারই ইংগিত দিয়েছে আরবের নবী"।[৫] আমেরিকান লেখক পিটারসেন বলেন- "ইসলামের নামে কঠোরতা প্রদর্শনের কোন স্থান প্রকৃত ইসলামে তো নেই, বরং তা শান্তির পতাকাবাহী ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত"।[৬]

---

[৫] মানবেন্দ্র নাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৬] ডি ফিন্ডলী, *লা সুকূতা বা'দাল ইয়াওমি*, বৈরূত: শারিকাতুল মাতবুআত, ২০০১, পৃ.৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের অনুশাসন, উত্তম নৈতিকতা ও মানবতাবোধের আদর্শ মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম। ঐশী নির্দেশনা হিসাবে এগুলোর অনুসরণ মানুষের পরকালীন জীবনের শান্তি ও মুক্তির ও অমূল্য পাথেয় । সুতরাং বলা চলে উদ্দেশ্যগত বিচারে ইসলাম শান্তি ও দাওয়াতের স্বার্থে হলেও উত্তম নৈতিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের সর্বোচ্চ মহানুভবতায় বিশ্বাসী। প্রকৃত মুসলিমগণ বাস্তব জীবনে এরই অনুসরণ করতে সচেষ্ট ।

মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সব বিষয়কে মূলভিত্তি হিসাবে গণ্য করে তার সবগুলোই কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা আল কুরআন ও আল হাদীস ইসলামী বিধিবিধানের প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এতদুভয় উৎস হতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও আচরণগত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য যে সব বিষয়কে ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপঃ

প্রথমত, নির্ভেজাল তাওহীদবাদী ধর্ম হিসাবে ইসলাম সম্পর্ক রক্ষার প্রথম ভিত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়েছে একত্ববাদকেই। বস্তুত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ সকল ধর্মের নিকটই গ্রহণযোগ্য সত্য । যদিও পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলো পরবর্তীতে তাদের মূল শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে তাওহীদকে বর্জন করেছে তথাপি এটা অস্বীকার করার কোন জো নেই যে বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা একজন । তাঁরই একক নিয়ন্ত্রণে গোটা পৃথিবী চলমান, তিনি সর্বশক্তিমান উপাস্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুর'আনে এ সত্যেরই ঘোষণা করে বলেছেন- "তুমি বল, ওহ কিতাবীগণ। আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করি"। [৭] একত্ববাদ সম্পর্কে অমুসলিমদের ধারণা প্রসঙ্গে আল কুরআনে আরো বেশ কিছু আয়াত পরিদৃষ্ট হয়।[৮] এগুলো তাওহীদ বা একত্ববাদ সূত্রে মুসলিম অমুসলিমদের সমতা ঘোষণা করে । সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে তাওহীদ হলো প্রধান ভিত্তি । অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় কোন মুসলিমেরই তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করা সমীচীন নয়, কেননা তাওহীদই ইসলামের মূল । আর তাওহীদ ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, নবী রাসূলদের প্রতি ইসলামী ধারণা আন্ত-সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইসলাম পৃথিবীতে আগত সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে। তাঁদের আনীত শিক্ষা ও কিতাবের ঐশী হওয়াকে স্বীকার করে। এক্ষেত্রে ইহুদী খ্রিস্টানদের নবী হযরত মূসা, ঈসা (আ)ও মুসলিমদের নিকট সমান ভাবেই সম্মানিত। কেননা তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সকল নবীই আল্লাহর পরিচয় প্রদান করেছেন; মানুষকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছেন । আল্লাহর বাণী "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দ্বীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ

[৭] আল কুরআন, ০৩ : ৬৪
[৮] আল কুরআন, ১৪: ১০; ৫২: ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দিয়াছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না" ।[৯] অন্য আয়াতে এসেছে-

> "তোমরা বল! আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাহদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা এবং আমরা তাহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী" ।[১০]

তৃতীয়ত, মানুষের সত্তাগত মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম মূলনীতি। ইসলাম সত্ত্বাগতভাবে প্রত্যেক মানুষকেই মর্যাদাবান মনে করে। আর এ মর্যাদা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা । এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোন জাতি-ধর্ম বর্ণ-গোত্র কিংবা সম্প্রদায়গত পার্থক্য করেননি। বরঞ্চ পৃথিবীর সকল মানুষই তাঁর নিকট সম্মানিত । আল কুরআনের ভাষায় "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থল ও সমুদ্রে তাহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি, উহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি" ।[১১] আল্লাহ প্রদত্ত এ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মূলরূপ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসাবে মানুষের আবির্ভাব ।[১২] তাছাড়া সৃষ্টি জগতের সবকিছুকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা ; সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের অধীনস্থ করে দেয়া ইত্যাদিও মানুষের সত্তাগত মর্যাদার পরিচায়ক ।[১৩] সুতরাং মানুষ হিসাবে সমস্ত ব্যক্তিই মর্যাদা ও সম্মান লাভের অধিকারী, চাই তা মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ এরূপই।

চতুর্থত, সৃষ্টিগত ভাবে মানুষের সমতা ইসলামী সাম্যনীতির প্রধান ভিত্তি । ইসলামই প্রথম ধর্ম যেখানে মানুষের জন্মকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে বিশদ ভাবে । এর পূর্বে কোন ধর্মেই এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি । এ বিশ্লেষণে সমস্ত মানুষের সৃষ্টিগত সাম্য স্পষ্টতই ধরা পড়ে । আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন "হে মানুষ। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার" ।[১৪] বস্তুত আদি পিতা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ) এর মাধ্যমে গোটা মানবজাতির জন্ম।[১৫] এ হিসাবে সৃষ্টিগত উত্তরাধিকারী হিসাবে সবাই একই জাতি। আবার মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ার বর্ণনায় ও মানুষের সমতার বিধান লক্ষ্যণীয়। প্রথমে জমাট রক্ত, অতঃপর মাংসপিন্ড ইত্যাদি স্তরায়ণের মাধ্যমেই সকল মানব শিশুর জন্ম ।[১৬] কেউই আল্লাহর সৃষ্টিনীতির বাইরে জন্ম নেয়নি । সুতরাং মানুষকে

---

[৯] আল কুরআন, ৪২: ১৩
[১০] আল কুরআন, ২: ১৩৬; ২: ২৮৫
[১১] আল কুরআন, ১৭: ৭০
[১২] আল কুরআন, ২:৩০
[১৩] আল কুরআন, ২:২৯
[১৪] আল কুরআন, ৪৯: ১৩, ০৪: ০১
[১৫] আল কুরআন, ০৩: ০৬
[১৬] আল কুরআন, ২৩:১৪

Dhaka University Institutional Repository

ধনী দরিদ্র, সাদা-কালো, মুসলিম-অমুসলিম ইত্যাদি ভাবে বিবেচনা না করে আচার আচরণে উত্তম আদর্শ অনুসরণ করাই উচিত । এছাড়াও ধর্মগত দিক হতেও মানব শিশু একক সমতার অধিকারী ।[১৭] সকলেই আল্লাহ প্রদর্শিত সহজাত ধর্মের উপর জন্ম নেয় । এমনকি শিশু কালে মৃত্যুবরণকারীর পরকালীন ঠিকানাও এক জায়গাতেই । আল্লাহ তায়ালা এরূপ ক্ষেত্রেও মানব জাতির সাম্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন ।

পঞ্চমত, ইসলাম ধর্মমতে শুধুমাত্র মানুষই নয় বরং গোটা সৃষ্টি জগতই আল্লাহর পরিবার তুল্য ।[১৮] সুতরাং এক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে মানুষের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবেনা । বরং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি যে যতটা পরোপকারী, সৎকর্মশীল তার উপরই মূলত নির্ভর করছে আল্লাহর প্রিয় হওয়া বা না হওয়া । সুতরাং আচরণগত দিক নির্ধারণে এ বিষয়টিও বিবেচনায় থাকা মুসলিমদের জন্য একান্ত আবশ্যক ।

ষষ্ঠত, ইসলাম ধর্মের বহুত্ববাদিতায় বিশ্বাসী । অর্থ্যাৎ ইসলাম নিজস্ব অস্তিত্বের পাশাপাশি অন্য ধর্মের অস্তিত্বও স্বীকার করে । যদিও ইসলামের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম, তথাপি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও ইসলাম সম্মানের চোখে দেখে । কেননা পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারিত ধর্মগুলোও খোদায়ী ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত । তাঁদের প্রচারিত ধর্মগুলোও ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রচারক । কালক্রমে এগুলো তাওহীদের শিক্ষা হতে দূরে সরে যাওয়ায় ধর্মের পরিপূর্ণতার জন্যই ইসলামের আগমন । সুতরাং ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণেও ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে । আল কুরআনে সুরা কাফিরূনে এ প্রসঙ্গে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে । আল্লাহ বলেছেন

> "বল হে কাফিররা ! আমি তাহার ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর । এবং তোমরাও তাহার ইবাদাতকারী না যাঁহার ইবাদাত আমি করি । এবং আমি ইবাদাতকারী নহি তাহার যাহার ইবাদাত তোমরা করিয়া আসিতেছ । এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদাতকারী নহ যাহার ইবাদাত আমি করি । তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার" ।[১৯]

বস্তুত ধর্মসমূহের এই বহুমাত্রিকতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছাকৃত বাস্তবতা । এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে-"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনিত, তবে কি তুমি মুমিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে"?[২০] বহু ধর্মের উৎপত্তি ও বিদ্যমানতা ইসলাম এভাবে ভালভাবেই গ্রহণ করে । সুতরাং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার বিষয়টিও স্বভাবতই কাম্য ।

---

[১৭] আল কুরআন, ৪৯;১৩
[১৮] আল কুরআন, ২:১৭৭
[১৯] আল কুরআন, ১০৯:১-৬
[২০] আল কুরআন, ১০:৯৯, ৫:৪৮, ১১:১১৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমত, ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশ্বাস করে। পার্থিব জীবনে সকল ব্যক্তিরই, মুসলিম অমুসলিম, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। বরঞ্চ মানুষের পার্থিব স্বাধীনতা আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বিবেক ও জ্ঞান দিয়েই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন । সাথে সাথে ভাল মন্দের নির্দেশক হিসাবে নবী রাসূল, আসমানী কিতাব ইত্যাদিও অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার নিজ ইচ্ছার উপর অবকাশ দিয়েছেন । জোর করে মুমিন বানানো আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। এজন্যই তিনি ঘোষণা করেছেন "এ ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই"।[২১] মানুষের উচিত সর্বপ্রকার জ্ঞান বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা সত্য ও সুন্দরের অনুশীলন করা । অবশ্য কেহ যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ভুলপথে পা বাড়ায়। কিংবা নবী রাসূলদের শিক্ষা ত্যাগ করে ইচ্ছাধীন জীবন পরিচালনা করে তার জন্য দায়ী সে নিজেই । পরকালীন জীবনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ইহকালীন জীবনে মানুষের এ ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না । ধর্ম, বর্ণ, অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়েই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

উপরোক্ত মূলনীতিগুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন রক্ষা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। আন্তঃসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ ভিত্তিগুলো বিবেচনা করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। ইসলামের নীতিমালা এটাই। অবশ্য আরো একটি বিষয় সর্বাবস্থাতেই বিবেচ্য হবে। আর তা হলো ইসলামের মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য ও শরী'আতের বিরোধিতা না করা। অর্থ্যাৎ আন্তধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কোন আচরণ করা যাবে না যা ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী । ইসলামের ক্ষতি হতে পারে এমন সম্পর্কও ইসলামে গ্রহণীয় নয়। ইসলামের গন্ডীবদ্ধ থেকে সর্বোত্তম ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী শরী'আতেরই নির্দেশ । এক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্লেষণ করে ইসলামী নীতিমালার আলোকে অমুসলিমদের সাথে মোট ৪ প্রকারের সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন । এগুলো হলো-- [২২]

ক) আল মুওয়ালাত বা মুওয়াদ্দা: অর্থ্যাৎ কারো প্রতি গভীর ভালবাসা, ঘনিষ্ঠতা ও একেবারে নিজের করে নেয়া। এ প্রকারের সম্পর্ক একমাত্র মুসলিমদের প্রতিই প্রযোজ্য হবে।

খ) আল মুদারাত: অর্থ্যাৎ বাহ্যিকভাবে বন্ধুসুলভ আচরণ এবং ভালবাসার প্রকাশ করা । এবং আন্তরিকভাবে কারো কর্ম বা বিশ্বাসকে ভাল না বাসা। তবে এক্ষেত্রে তা প্রকাশ করা যাবে না। বরং বন্ধুর ন্যায় ভালাবাসা, উত্তম ব্যবহার ও সম্প্রীতি রক্ষা করা আবশ্যক । অমুসলিমদের সাথে এরূপ আচরণ করা বৈধ।

---

[২১] আল কুরআন, ২:২৫৬

[২২] Muhammad Ibn Adam, ***The Fiqh of Muslim Non-Muslim interaction Detailed Explana***, Leicester: Darul Ifta, 2009, http://www.central-mosque.com

Dhaka University Institutional Repository

গ) আল মুওয়াসাত: এটি মূলত কর্মসংক্রান্ত ব্যবহার । কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করা, তা আর্থিক হোক বা অন্য কোন উপায়ে হোক ; দু:খ-কষ্ট দূর করা ; সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়া, দান-খয়রাত করা ইত্যাদি এ প্রকারে অন্তর্ভূক্ত। অমুসলিমদের সাথে এধরনের আচরণও ইসলামী বিধানের অন্তর্ভূক্ত । তবে যে সব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার বৈধ নয়।

ঘ) মুয়ামালাত: অর্থ সংক্রান্ত ব্যবহার বিধি। কারো সাথে লেনদেন করা, বাণিজ্য করা, ধার কর্জ বিনিময় ইত্যাদি আর্থিক কার্যকলাপ করা এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত । অমুসলিমগণ এ ধরনের ব্যবহারও মুসলিমগণের নিকট হতে লাভ করেন । তবে অর্থ সংক্রান্ত কোন কাজ যদি ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হয় তাহলে বৈধ হবে না।

বস্তুত ইসলামে মানবজাতির জন্য সম্পর্ক নির্ধারণের যে চারটি স্তরের কথা বলেছে তন্মধ্যে মাত্র একটিই শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য বিশেষায়িত করে রাখা আছে। বাকী তিনটি পর্যায়ে অমুসলিমগণও মুসলিমদের ন্যায়ই আচরণ লাভের অধিকারী। ইসলামী আদর্শের এই মহানুভবতা মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের যথার্থ রূপের প্রতিফলন স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

জনসংখ্যার দিক হতে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ভাবেই সুন্দর ও সহনশীল। এদেশের মুসলিম জনগণ যেমনিভাবে অমুসলিমদের সাথে সম্প্রীতি ও সহনশীল পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট তেমনি অমুসলিমগণও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ১৯৭১ সালে এদেশের স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত কোনরূপ সম্প্রদায়িক সংঘাত ও দাঙ্গা না হওয়াই এ দেশের উন্নত সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ধর্মের নামে ছোট খাট সংঘাত, নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচারও যে হচ্ছে না তাও নয়। বস্তুত ধর্মের ছদ্মাবরণে এগুলো পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির নমুনা মাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহের আলোচনায় যা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্প্রীতি আর সংঘাত যাই হোক না কেন ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে বেশ সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। মানবতাবাদী ও বাস্তবসম্মত ভিত্তিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এসব বিধিবিধান প্রত্যেক মুসলিম মাত্রেরই মেনে চলা উচিত। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণও এ বিধানের বাইরে নন। নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা, সম্পর্ক স্থাপন, সম্প্রীতি-সংঘাত পরিচালনা, কিংবা পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষায় ঐতিহ্যের অনুসরণ কোনটিই ইসলামে কাম্য নয়। তবে হ্যাঁ, যদি এগুলো ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা অবশ্যই গ্রহণীয়। বস্তুত আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম কঠোরতা ও উদারতা কোনটিরই সমর্থক নয়। বরং কোমল-কঠিনের সংমিশ্রণে একটি কল্যাণকর বিধানই ইসলামের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছে। অমুসলিম কারো প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ইত্যাদি যেমন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; তেমনি অতি উদারতা দেখিয়ে অমুসলিমদের ঐতিহ্য প্রথাকে গ্রহণ করে ইসলামী শরী'আতের সীমালংঘনও ইসলাম বৈধ মনে করে না। বরং উভয়ের সমন্বয়ে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। অতএব পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা পর্যালোচনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় জনগোষ্ঠীর যে সম্পর্ক আমরা পাই এ ইসলামী নীতিমালার আলোকে এ সম্পর্কের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিদ্যমান এ সম্পর্ক ইসলামের আলোকে কতটুকু গ্রহণীয় ও বর্জনীয়-তারই বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক একটি দিক নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণের পূর্বে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের এক বিরাট অংশ, মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, স্বীয় ধর্ম প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন না। অথচ ইসলামের অন্যতম নির্দেশিত বিষয় হলো জ্ঞান সাধনা। ইসলামে এ জ্ঞান সাধনাকে ফরয বা অবশ্য করণীয় ঘোষণা করেছে। জ্ঞান অণ্বেষণের ক্ষেত্রে নানা ফযীলত ও পুরস্কারের ঘোষণা করে মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি আল আল কুরআনের প্রথম বাণীও ছিল 'পড়'।[২৩] এছাড়া কুরআনের আরো বহু আয়াতে জ্ঞান সাধনার অনুপ্রেরণা দান লক্ষ্যনীয়।[২৪] মহানবী (স) বলেন- "ইলম (জ্ঞান) অণ্বেষণ প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয"।[২৫]

বস্তুত দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের মূল লক্ষ্য। আর পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের জ্ঞান লাভকারীই সর্বাপেক্ষা সফল ও সার্থক। মহানবী (স) বলেন-"আল্লাহ য়ার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দান করেন। বস্তুত আমি বণ্টনকারী এবং দাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ।"[২৬] মূলত ধর্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ ধর্মের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য এর বিকল্প কোন পথ নেই।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের একটি অন্যতম দিক হলো বন্ধুত্ব। পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভালবাসার দ্বারা এ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাধারণত সমবয়সীদের মধ্যেই বন্ধুত্ব হলেও মানব সমাজে অসম বয়সী বন্ধুত্বের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ইসলাম ধর্মে মানুষের ব্যক্তিগত এ পছন্দের বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে। প্রাথমিক যুগের শরী'আ আইনবিদদের মতানুযায়ী অমুসলিমদের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েজ নয়। তাঁদের মতের সমর্থনে তাঁরা দলীল পেশ করেন নিয়োক্ত আয়াত-

> "হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিরে সে তাহাদেরই একজন হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[২৭]

এছাড়া আল কুরআনের আরো একটি আয়াতে এ নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ আছে।[২৮] পরবর্তীকালের ইসলামী আইনবিদগণ মনে করেন-ইসলামে ঢালাওভাবে বন্ধুত্ব নিষেধ করা হয়নি। বরং বন্ধুত্বের সম্পর্কের মাত্রাকে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব করলে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা বিদ্যমান শুধুমাত্র সেসব ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব করা হারাম। আর উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমার উদ্দেশ্যে এরূপই। তাছাড়া সূরা মায়িদার পঞ্চম আয়াতের শানে নুযুল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি একটি

---

[২৩] মুসলিম,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[২৪] আল কুরআন, ৯৬:১
[২৫] আল কুরআন, ৩৯:৯; ৫৮:১১; ২:২৬৯; ৩:১৬৪
[২৬] সাইয়্যেদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ:৩৬৫
[২৭] আল কুরআন, ৫:৫১
[২৮] আল কুরআন, ৩:২৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।[২৯] সুতরাং সর্বাবস্থায় একে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বন্ধুত্বের ন্যায় গভীর ও মানবিক আবেগপূর্ণ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা যায় না। উপরোক্ত আয়াতে 'ওলী' শব্দটির ব্যাখ্যায়ও নানা ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। সাধারণত 'ওলী' শব্দটি বন্ধু, সাথী, সঙ্গী, সহকর্মী, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, স্থলাভিত্তিক ইত্যাদি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে (আল কুরআন, ৫:৫) ওলী শব্দটি বন্ধু না বুঝিয়ে বরং অভিভাবক বা পথনির্দেশক বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩০] কেননা অন্য আয়াতেও ওলী শব্দের এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৩১] অভিভাবক হিসাবে ওলী অর্থের ব্যবহার ইসলামী শরী'আর উভয় প্রকার আইনবিদদের মতামত সমন্বয় করে। উভয়ের দৃষ্টিতেই এরূপ বন্ধুত্ব, যা মুসলিমগণকে অমুসলিমদের নির্দেশ শুনতে বাধ্য করে, অবশ্যই হারাম ও অবৈধ।

অন্য দিকে সাধারণভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পরিচালনার জন্য মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র উৎসাহই প্রদান করা হয়নি বরং নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত ইসলামের কোনরূপ ক্ষতির সাথে জড়িত নয় যেসব অমুসলিম, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও বন্ধুসুলভ সাহায্য সহযোগিতা করা মুসলিমদের অন্যতম কর্তব্যও বটে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

> "দ্বীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।
>
> আল্লাহ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং তোমাদের বহিষ্কারনে সাহায্য করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো যালিম।"[৩২]

এরূপ নির্দেশনা সম্বলিত সরাসরি আয়াত না থাকলেও পবিত্র কুরআনে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের গ্রহণ করার ব্যাপারে আরো বেশ কিছু ইঙ্গিতবহ আয়াত লক্ষ্যণীয়।[৩৩] শরী'আর বিজ্ঞ আইনবিদগণ এগুলোকেও বন্ধুত্বের দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। গবেষণায় বাংলাদেশে বন্ধুত্বের যে চিত্র পাওয়া যায় ইসলামী আইনানুসারে সন্তোষজনকই বলা চলে। কেননা বাংলাদেশের অমুসলিমগণ সাধারণভাবে ইসলামের ক্ষতিসাধনে তৎপর নয়। এক্ষেত্রে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও বন্ধুসুলভ আচরণ করা ইসলামেরই দাবী।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের আরো গভীরতম অবস্থা হলো বিবাহ। বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে দু'জন মানুষের মধ্যকার সর্ববিধ বাধা অপসারিত হয়। আল-কুরআনে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্থাপিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পরস্পরের পোষাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা এ সম্পর্কের সর্বোচ্চ ঘনিষ্টতার কথা প্রমাণ

---

[২৯] মুফতী মু: শফী, *তাফসীর মাআরিফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৫-৩৩৬

[৩০] Dr. Muzammil Siddiqi/http://islamonline.com/friendshiptonon-muslim/html

[৩১] আল কুরআন, ২:২৫৭

[৩২] আল কুরআন, ৬০: ৮-৯

[৩৩] আল কুরআন, ৫:৫; ৪৯:১৫; ৩:৭৫; ৩:১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

করে।[৩৪] বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিমদের বিবাহ করা জায়েজ বলে বিধান প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হলো- অমুসলিমদের আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী বা খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত- তারা নাস্তিক বা মুশরিক তথা একাধিক স্রষ্টায় বিশ্বাসী হতে পারবে না। তৃতীয়ত মুসলিম পুরুষের সাথে আহলে কিতাব নারীর বিয়ে হতে হবে। মুসলিম নারী এক্ষেত্রে আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না। চতুর্থত-এ বিবাহ দারুল ইসলাম বা ইসলাম ও মুসলিমের জন্য নিরাপদ রাষ্ট্রে হতে হবে।[৩৫] মুসলিম-অমুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে আল কুরআনের বাণী-

> "আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হইল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্য দ্রব্য তাহাদের জন্য বৈধ; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মাহর প্রদান কর-বিবাহের জন্য; প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নহে। কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিস্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।" [৩৬]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন-

> ".....Social intercourse, intermarriage is permitted with the people of the book. A Muslim man may marry a woman from their ranks on the same terms as he would marry a Muslim woman, he must give her an economic and moral status, and must not be actuated merely by motives of lust or physical desire."[৩৭]

অবশ্য বর্তমানকালের মুফতীদের মতে আহলে কিতাব মেয়েগণ যদি পূর্ণভাবে তাওরাত বা ইঞ্জিলের অনুসারী হয় তবে বর্তমানেও তাঁদের বিবাহ করা বৈধ। তবে যদি তাওহীদের বিপরীত শিরকযুক্ত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হয় এবং আসমানী কিতাবের বিকৃত রূপের অনুসারী হয় তবে তাদেরকে বিবাহ করা হতে বিরত থাকাই কাম্য হবে।[৩৮] বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম অমুসলিমদের বিয়ে খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে। এ হিসাবে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান পালিত হচ্ছে-একথা বলা চলে নির্দ্বিধায়। তবে ধর্মান্তর করে ইসলাম গ্রহণ করার পর বিয়ের ঘটনা বিরল নয়। সেক্ষেত্রে ইসলামের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, কেননা দু'জন মুসলিমের পারস্পরিক বিবাহ নাজায়েজ হবার কোনরূপ

---

[৩৪] আল কুরআন, ২: ১৮৭

[৩৫] Maulana Mohammad Yousuf Ludhianri, ***Marriage between Muslim and Non Muslims***, http://www.jannah.org/sisters/intermarriage.html

[৩৬] আল কুরআন, ৫:৫

[৩৭] Allama Yousuf Ali, ***The Holy Quran***, Maryland: Amane corp, p. 241

[৩৮] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩
আশরাফ আলী থানবী, *তাফসীরে বয়ানুল কুরআন*, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বিধান ইসলামে নেই। বরং এটি বৈধ ও কল্যাণকর বলেই ইসলামী আইনবিদগণ মনে করেন। ইসলাম গ্রহণের পর বিয়ে করার বৈধতা প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

> "মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করিও না। মুশরিক নারী তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না।"[৩৯]

আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য তা হলো প্রতিবেশী হিসাবে মুসলিম অমুসলিমদের পারস্পরিক আচরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থান বেশ চমৎকার। প্রতিবেশী, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, এদেশের মুসলিমগণ সকলের সাথেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষা করেই চলে। আর এটাই ইসলামের বিধান। আল কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

> "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করিবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দুর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।[৪০]

নিকট প্রতিবেশী, দুর প্রতিবেশী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সদ্ব্যবহার করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশনা। মহানবী (স) নানাভাবে মুসলমানদেরকে এ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়;"[৪১] আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে রাসূলুল্লাহ! কে সেই ব্যক্তি? জবাবে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তাঁর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না"।[৪২] ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।[৪৩] প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও ইসলাম অর্পিত দায়িত্বের মাত্রা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন জিবরাইল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে (এত বেশি) তাকিদ দিচ্ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।[৪৪]

বস্তুত বাংলাদেশের মুসলিমগণ ভালভাবেই প্রতিবেশীকে গ্রহণ করেছেন। তবে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। তবে যারা প্রতিবেশী হিসাবে অমুসলিমদেরকে গ্রহণীয় মনে করেন না কিংবা তাদের সাথে অশোভন আচরণ করে থাকেন তারা

---

[৩৯] আল কুরআন, ২: ২২১
[৪০] আল কুরআন, ৪: ৩৬
[৪১] মিশকাত সুত্রে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬ ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস্ সাহীহ*, বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭
[৪৩] ইমাম বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, মক্কা: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪, পৃ.২৬৫
[৪৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস্ সাহীহ*, বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭, ৩য় খন্ড, পৃ.১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রকৃত অনুসারী নয়। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদেরকেই সচেষ্ট হতে হবে।

অমুসলিম মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও ব্যবহারিক নীতিমালা ইসলামী বিধানের পূর্ণাঙ্গতা ঘোষণা করে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ জন্ম ও বংশগতভাবে মুসলিম সেহেতু মাতা পিতা ও আত্মীয়-পরিজনের মুসলিম হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এদেশে যারা অন্য ধর্ম হতে ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের এ বিধানটি প্রযোজ্য। সাধারণত এদেশে এরূপাবস্থায় মাতাপিতা ও আত্মীয়-পরিজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতেই বেশি দেখা যায়। আবার নবদীক্ষিত মুসলিম সম্পর্ক রাখতে চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিম পরিবার হতে বাঁধার সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত অবস্থাদ্বয়ের কোনটিই কাম্য নয়। বরং ইসলাম গ্রহণের পরও মাতাপিতার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখাই ইসলামের বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলাও আল কুরআনে নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৪৫] মহানবী (স) এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীতেও এ ধরনের উত্তম ব্যবহারের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেন,

> "হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তাঁর অমুসলিম মাতা সাহায্য প্রার্থনা হয়ে মদীনায় তাঁর কাছে আগমন করেন। অমুসলিম মায়ের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে। সে সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলুল্লাহুল্লাহ (স) এর কাছে আসলে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে মা যে-ই হন না কেন? তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।"[৪৬]

নিম্নোক্ত ঘটনাতেও অমুসলিম মায়ের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) এর মা ছিলেন মুশরিক। একদা তিনি বিরক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স) কে গালিগালাজ শুরু করলে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) ব্যথিত হয়ে কেঁদে ফেলেন ও সাথে সাথে মহানবী (স) এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন- হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স)! আমার মা আপনার শানে বেয়াদবী করতে শুরু করেছেন। আপনি তার প্রতি দোয়া করুন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) হাত তুলে দোয়া করলেন- হে আমার রব! আবু হুরায়রাহর (রা) মাতাকে হেদায়েত করুন। হযরত আবু হুরায়রাহ তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরলেন, ঘরের বন্ধ দরজায় খা দিলেন। কিছুক্ষণ পর দরজা খুললে দেখলেন তাঁর মা গোসল করে কাপড় পড়ে আছেন ও তাঁকে বললেন যে আমি স্বাক্ষর দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স) তাঁরই রাসূল।"[৪৭] এই ঘটনায় দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলুল্লাহকে গালিগালাজ করার পরও আবু হুরায়রাহ কর্তৃক মাকে কিছু না বলা এবং তার জন্য রাসূলের নিকট দোয়া চাওয়া। আর অপরটি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক সহনশীল আচরণ ও দোয়া করা। বস্তুত এটাই ইসলামের সুমহান আদর্শ।

---

[৪৫] আল কুরআন, ১৭: ২৩-২৪; ১৭: ২৬; ২:১৭৭

[৪৬] মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *আস্ সাহীহ*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৪

[৪৭] ইমাম বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে অতিথিপরায়ণ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই অতিথি হিসাবে আদর-আপ্যায়ন ও সমাদর করার সংস্কৃতি এদেশের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, পরিচিতজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের মাঝেই পারস্পরিক যাতায়াত বিদ্যমান থাকায় আতিথিয়তা বাংলার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এর ভূমিকাও অপরিসীম। ইসলাম ধর্মে আতিথিয়তার গুণকে প্রশংসা করা হয়েছে নানাভাবে। রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় জীবনে এর বাস্তবায়ন করে মুসলিমদের জন্য এক অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে তিনি কখনোই ধর্ম বিবেচনায় আনেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ (স) বিধর্মী অতিথির মলমূত্র স্বহস্তে ধৌত করেছেন, ইসলামের অতি বড় শত্রুর অন্তোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন, ইহুদী-খ্রিস্টানদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তাঁর মধুর ব্যবহারে বিধর্মীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৪৮]

হযরত আবু যর গিফারী (রা) বর্ণনা করেন, "ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স) এর মেহমান হয়েছিলাম। মহানবী (স) এর ঘরে যে কয়টি বকরী ছিল সব কয়টির দুধই আমি পান করে ফেললাম। ফলে সে রাতে মহানবী (স) এর পরিবার পরিজন অভুক্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন। তথাপিও তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হননি।"[৪৯] এরূপ আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একবার এক কাফির নবী (স) এর ঘরে এসে মেহমান হল। নবী (স) একটি ছাগল দোহন করে এনে তাকে খেতে দিলেন। সে এক চুমুকেই সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলল। তারপর আর একটি ছাগল দোহন করে আনা হল। এভাবে পর্যায়ক্রমে সে সাতটি ছাগলের দুধ পান করার পরও তৃপ্ত হলো না। কিন্তু নবী (স) অম্লান বদনে তাকে দুধ পান করাতে থাকলেন।[৫০]

শুধ তা-ই নয়, যুদ্ধবন্দীদের প্রতিও রাসূলুল্লাহ (স) আতিথিয়তার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে এর নজীর আর দ্বিতীয়টি নেই। বদর যুদ্ধে ৭০ জন অমুসলিম বন্দী হলে রাসূলুল্লাহ (স) বন্দীদেরকে সাহাবীদের দায়িত্বে দিয়ে আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (স) এর আদেশে সাহাবীগণ উত্তম চরিত্রের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁরা নিজেরা খেজুর খেয়ে অর্ধ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাতেন, অথচ বন্দীদের খেতে দিতেন যবের রুটি; নিজেরা পায়ে হেঁটে পথ চলতেন আর বন্দীরা উটের পিঠে সওয়ার হতেন।[৫১] আধুনিক সভ্যতা আর মানবতার জয়গানে মুখরিত এই বিশ্বে এরকম ব্যবহারের কল্পনাও কেউ করতে পারে না।

আতিথিয়েতার পাশাপাশি উপহার আদান-প্রদানেও মুসলিমদের উদারনৈতিক মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) হাদিয়া তথা উপহার দেয়া নেয়াকে সম্প্রীতি রক্ষা ও সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে হিসাবে

---

[৪৮] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৩, পৃ. ৩

[৪৯] আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন্নবী (স)*, অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন, ১৯১০ হিঃ, পৃ. ৫০২

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯

[৫১] ইবন জারীর আত তাবারী, *তারিখুল উমাম আল মূলক*, দামেশক: দারুল কলম, ১৯৮১, পৃ. ১৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন "তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া দিবে, হাদিয়া অন্তরের কলুষ দূর করে। এক পড়শি অপর পড়শিকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন সামান্য মনে না করে যদিও তা এক টুকরা বকরীর ক্ষুরও হয়।"[৫২] তিনি আরো বলেন- "যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে কিছু পানি অতিরিক্ত দিবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিবে।[৫৩] শুধুমাত্র হাদিয়া প্রদানই নয় হাদিয়া গ্রহণও ইসলামে জায়েজ।[৫৪] আর হাদিয়া আদান-প্রদানে জাতি-ধর্ম-গোত্রের কোনরূপ বৈষম্য ইসলামে করা হয়নি। হযরত আবু হুরায়রাহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- "যারা সুগন্ধি দান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা এটি হালকা জিনিস অথচ সুগন্ধযুক্ত।"[৫৫] রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যক্তিগত জীবনেও অমুসলিমদের সাথে হাদিয়া আদান-প্রদান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৬]

ধর্মপালনের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি বর্তমান বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত অন্যকে ধর্মপালনে বাধা না দেয়া, জোর জবরদস্তির মাধ্যমে নিজ ধর্মের প্রচারণা না চালানো, অন্য ধর্মের উপাসনালয় বা ধর্মীয় স্থানকে সম্মান দেখানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ইসলামের উদার ও সহনশীল আর্দশের প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মমত গ্রহণে ইসলামের প্রধানতম দিক নির্দেশনা হলো যে ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছায় যে কোন ধর্ম পালন করতে পারবে। জোর করে কোন ধর্মমত কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ-

> "দীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নাই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহ ঈমান আনিবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"[৫৭]

মুসলিমদের দায়িত্ব শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।[৫৮] রাসূলুল্লাহ (স) ইয়ামানে নিযুক্ত শাসনকর্তা হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে বলেছিলেন-"ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কাউকে তার ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে না।"[৫৯] জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ যেমন ইসলামে বৈধ নয়, তেমনি অমুসলিমদের ধর্মপালনের ক্ষেত্রে বাধা দানও ইসলাম স্বীকৃত নয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে স্বতন্ত্র একটি সূরাও নাযিল করা হয়েছে।[৬০]

---

[৫২] মিশকাত সূত্রে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬
[৫৩] ইমাম মুসলিম, মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫
[৫৪] ইউসুফ কারযাভী, *আল হালাল ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম*, বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৮, পৃ. ৩৩২-৩৩
[৫৫] মিশকাত সূত্রে দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬
[৫৬] ইমাম নাসাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
[৫৭] আল কুরআন, ২: ২৫৬
[৫৮] আল কুরআন, ১৬:৩৫
[৫৯] আবু দাউদ সূত্রে মাওলানা রুহুল আমিন খান, *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহানবী (স) এর আদর্শ এবং ইসলামী সমাজ তার প্রতিফলন*, ঈদে মিলাদুন্নবী (স) স্মরণিকা, ১৪২৮ হিঃ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৫৮
[৬০] আল কুরআন, ১০৯:১-৬

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ দেয়াও আল্লাহর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন করার সমতুল্য।[৬১] এ প্রসঙ্গে নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে মহানবী (স) এর কৃত আচরণটি উল্লেখযোগ্য। নাজরানের অধিবাসীদের পক্ষ হতে ৬০জন পাদ্রী পুরোহিতের এক বিশাল দল মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। যখন তাঁরা মদীনায় আগমন করেন তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। খ্রিস্টানগণ এসময় তাদের প্রার্থনার অনুমতি চাইলেন। মাগরিবের নামাযের সময় বলে সাহাবীদের অনেকে আপত্তি তুললেন। কিন্তু বিশ্বনবী (স) সে আপত্তি কানে না তুলে মসজিদে নববনীতেই তাদেরকে প্রার্থনা করার অনুমতি প্রদান করলেন। একই মসজিদে কাবার দিকে মুখ করে মুসলমানগণ ও বিপরীত দিকে খ্রিস্টানগণ একই সময়ে উপাসনা করলেন।[৬২] বিশ্বের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিক এমন নজীর আর দ্বিতীয়টি নেই।

শুধুমাত্র মৌখিক ভাবেই নয় বরং ইসলাম লিখিত ভাবে আইনের মাধ্যমে অমুসলিমদের এ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। মদীনা সনদের ২৫ হতে ৩৫ নম্বর ধারাগুলিতে প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে পৃথক পৃথকভাবে নাম উল্লেখ পূর্বক তাদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-

> "বানু আওফ গোত্রের ইয়াহুদীগন মুসলমানদের সাথে এক সম্প্রদায়। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করে এবং মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। এবিধান তাদেরও তাদের মাওয়ালীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে তার ফল কেবলমাত্র সে ও তার পরিবারের উপর বর্তাবে।"

তৎপরবর্তী ধারাগুলিতে আছে বানু আওফ গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্য যা প্রযোজ্য বানু নাজার গোত্রের ইয়াহুদীদের জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে বানু আওফ গোত্রের ইয়াহুদীদের সাথে বানুল হারিছ, বানু সাঈদা, বানু জুশাম, বানু আউস, বানু সালমা, জাফনা, বানু শুত্বনা, বানু বিতানা, বানু সালামার মাওয়ালীদের সমতা বিধান পূর্বক পৃথক পৃথক বর্ণনা দেয়া হয়েছে।[৬৩]

সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেন্টক্যাথরিন গীর্জার সাধু ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে প্রদত্ত মহানবী (স) এর সনদের মূলকথা ছিল-তাদের (অমুসলিমদের) শত্রুদের প্রতিরোধ করা হবে। ধর্ম পরিবর্তনে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। তাদের ধম,প্রাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই নিরাপদ থাকবে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তাদের অধিকারে থাকবে। তাদের পাদ্রি, পূজারী ও পুরোহিত কাউকেও বরখাস্ত করা হবে না এবং তাদের দেবদেবীদের মূর্তি বিনষ্ট করা হবে না।[৬৪]

---

[৬১] আল কুরআন, ২২:৩৯-৪০

[৬২] মাওলানা রূহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৬৩] আহমদ যাকী সাফওয়াত, *জামহারাতু রাসাইলিল আরাবা*, বৈরুত ১৯৭৩, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১-৩৫

[৬৪] সৈয়দ আমীল আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম* (অনুবাদ মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা:১৯৯৩, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র নবী (স)-ই নন এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মপালন ও উপসনালয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। হযরত আবুবকর (রা) হিরাবাসীদের সাথে একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন। আর তার মূলকথা ছিল তাদের খানকাহ, গির্জাগুলোর কোন ক্ষতি করা হবে না, প্রয়োজনের সময় আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা যেসব ইমারতের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলি বহাল রাখা হবে। নকুশ ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। উৎসবের সময় ক্রুশ নিয়ে শোভাযাত্রা বের করার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না।[৬৫]

জেরুযালেম বিজয়ের সময় হযরত ওমর (রা) সেখানে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হলে খ্রিস্টান পাদ্রীরা তাঁকে গীর্জাতেই নামাজ আদায়ের কথা বলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) গীর্জায় নামায আদায় না করে খোলা ময়দানে নামাজ পড়লেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে এ ঘটনাকে প্রামান্য দলীল ধরে যদি পরবর্তীতে মুসলিমগণ গীর্জায় নামাজ পড়া শুরু করে এর দখল নিয়ে নেয়। অতপর খলীফা ওমর (রা) সেখানকার খ্রিস্টানদের একটি নিরাপত্তা নামা প্রদান করেন। তাতে লিখিত ছিল-

> "তাদের বাসগৃহ ও উপসানালয় গুলোতে কোনরূপ পরিবর্তন ধ্বংস, ক্ষতিসাধন কিছুই করা হবে না। তাদের অধিকার হতে সেগুলো কেড়ে নেয়াও হবে না বরং সেগুলি তাদের দখলেই থাকবে। এগুলোকে ক্রুশশুন্য করা হবে না। তাদের ধর্মপালনে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হবে না।"[৬৬]

আনাত শহর বিজয়ী হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ সেখানকার অধিবাসীদের প্রদত্ত নিরাপত্তা নামায় লিখেন- তারা তাদের ঘন্টা ধ্বনি রাত্র দিন যে কোন সময় বাজাতে পারবে, তবে মুসলিমদের নামাযের সময় তা বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া তাদের ক্রুশবহনের অধিকারও বলবৎ থাকবে।[৬৭]

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত কোথাও জোরপূর্বক ধর্মান্তর, উপাসনালয় ধ্বংস, ধর্মপালনে বাধাদান এরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় নি। তবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম, ঘোষণা কিংবা সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এর সংযোজন অনেকের মতেই ইসলাম সম্মত নয়। মহানবী (স) এরূপ করেন নি। বরং মদীনা সনদে সকল জাতিসত্তার সমানাধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি হুদায়বিয়ার সন্ধির শিরোভাগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দদ্বয় লিখার পরেও অমুসলিমদের দাবী মেনে রাসূলুল্লাহ (স) তা কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং শিরোভাগে আরবের প্রথানুযায়ী 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' এবং 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখেন।[৬৮] এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম ও নবী (স) এর প্রধানতম পরিচয় রাসূলুল্লাহুল্লাহ শব্দটিও নবী (স) সম্প্রীতির স্বার্থে কেটে দিয়েছিলেন।

---

[৬৫] মাওলানা রূহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[৬৬] আত তাবাবী, *তারিখ*, খন্ড-৩, মিশর: দারুল মাআরিফ, তারিখ বিহীন, পৃ. ৬০৯
[৬৭] আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, মিশর: দারুল মাআরিফ, ১৯৭৭. পৃ: ১৪৬
[৬৮] ইবনে হিশাম, *সীরাতুন্নবী*, (অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় খন্ড, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

চাকরি ও দায়িত্বপুর্ণ পদলাভের ব্যাপারে ইসলামে অমুসলিমদের কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ করেনি। তবে ইসলামী রাষ্ট্র, যা ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত, নীতি নির্ধারণীর ক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদগুলিতে নিয়োগ লাভের জন্য বিবেচ্য হন না। কেননা অমুসলিমগণ ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিশ্বাসী না হওয়ায় ইসলামী নীতিমালায় পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী নন এবং এর প্রয়োগের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। একারণে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ এরূপ সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারেন না। তবে এছাড়া অন্যান্য পদে অধিকারী হবেন। তারা প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করতে পারবেন।[৬৯]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর বেশ কিছু উদাহরণ লক্ষ্যণীয়। খলীফা হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলের একজন গর্ভনর ছিলেন অমুসলিম, তাছাড়া মদীনাতে রাজস্বখাতের হিসাব রাখার জন্য সিরিয়ার গর্ভনর হযরত ওমরের নিকট একজন গ্রীক খ্রিস্টানকে পাঠিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।[৭০]

এতদ্ব্যতীত সামরিক বাহিনীতে অমুসলিমদের অর্ন্তভুক্তিও ইসলামে বৈধ। রাসূলুল্লাহ (স) এর মদীনা সনদে সামরিক প্রয়োজনে মদীনা রাষ্ট্রের সব জাতি বর্ণ ও গোত্রের সমান অধিকারের কথাই বলা হয়েছে। ড. সোলায়মান বলেন-

> "মহানবী (স) মদীনার আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমনের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মুহাজির আনসার, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক অর্থাৎ মদীনার সমস্ত নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সনদের মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।"[৭১]

এমনকি দেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সম্পদ খরচকেও সমানভাবে ভাগ করা হয়েছে। মদীনা সনদে বলা হয়েছে ইহুদীগণ তাদের খরচ ও মুসলিমগণ তাদের খরচ বহন করবে।[৭২] হযরত ওমর (র) ও সামরিক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৭৩] তাঁর শাসনকালে মিশরের একটি নদীর নকশা একজন অমুসলিম প্রকৌশলী তৈরী করেছিলেন। এ কুফায় শাসনকর্তা সা'দ রুযবান নামক এক অমুসলিম কারিগর দ্বারা কুফার বায়তুলমাল পুন:নির্মান করান এবং তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে হযরত ওমরের নিকট পাঠিয়ে দেন। হযরত ওমর (র) তার জন্য বায়তুল মাল হতে আজীবনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৭৪]

---

[৬৯] মুহাম্মদ সলাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ২৯৫, ৩০২

[৭০] Dr. Muhammad Hamidullah, ***The Status of non Muslim is Islam***, http:// www. islam online.com/non-muslim.htm.

[৭১] ড: মুহাম্মদ সোলায়মান, *সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করণে মদীনা সনদের ভূমিকা*, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, খন্ড-৭, সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৯, পৃ.৫০

[৭২] আহমদ আলী সাফাওয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৫

[৭৩] Dr. Muhammad Hamidullah, ibid, http:// www. islam online.com/non-muslim.htm

[৭৪] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের চাকরি ও দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আইনগত কোন বাধা নেই। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ায় এদেশে একেবারে সর্বোচ্চ পদ লাভের ক্ষেত্রেও তারা অযোগ্য নন। বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা পর্যালোচনায় প্রশাসন তথা দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অমুসলিমদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম লেনদেন ও পারস্পরিক ব্যবসা বাণিজ্য ইসলামে নাজায়েজ নয়। তবে তা ইসলামী সীমারেখার মধ্যে হতে হবে। কোনরূপ হারাম পণ্যের লেনদেন জায়েজ নয়, প্রতারণা করা,ওজনে কম দেয়া, বেশি মূল্যরাখা, মজুদদারী, কালোবাজারী ইত্যাদি বিষয় থেকেও বিরত থাকতে হবে। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে জাতি ধর্মের কোনরূপ বৈষম্য ইসলামে নেই। অমুসলিমদের নিকট হতে ঋণ যেমন গ্রহণ করা যাবে তেমনি তাদেরকে ঋণ প্রদানেও কোন বাধা নেই।

সাহাবী আবু হারদাদ সানামীর নিকট জনৈক ইহুদীর পাওনা ছিল। ইহুদী তাঁকে ধরে রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে হাজির করল। এরপর সিদ্ধান্ত হলো যে, এই মুহূর্তে ইয়াহুদীর পাওনা পরিশোধ করতে হবে। সাহাবী তার অপরগাতার কথা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইয়াহূদী তা যেনে না নিলে তাঁকে পুনরায় ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলো। এমতাবস্থায় সাহাবী আরজ করলেন- খায়বর হতে ফিরে আসার পর তিনি এ কর্জ পরিশোধের সক্ষম হবেন। নবী (স) হারদাদের কোন কথাই শুনলেন না। বরং তিনি হারদাদের পরিধানের কাপড় খুলে ইহুদীকে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলেন। পরবর্তীতে হারদাদ মাথার পাগড়ী খুলে পরিধান করে বাড়ী ফিরে গেলেন।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ (স) এবং নিজ জীবনের একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হলো- যায়দ ইবন সাদ ছিলেন একজন ইহুদী মহাজন। যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন। ইহুদি থাকাবস্থায় অর্থলগ্নীর ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (স) তার নিকট হতে একবার কিছু ঋণ গ্রহণ করেন। পরিশোধের শেষ সময়সীমা আসার পূর্বেই যায়দ তাগাদা দিতে লাগলেন। এমনকি একরা রাসূলের চাদর ধরে টেনে ধরে বলতে লাগলেন-- আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা তোমরা সবসময়ই এরূপ করে থাক। যায়দ এ কথায় হযরত ওমর (র) রাগান্বিত হয়ে বললেন-- হে আল্লাহর শত্রু। তুই রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিস। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হেসে বললেন- উমর! তোমার কাছ থেকে আমি এরূপ ব্যবহার আশা করিনি। তাকে বুঝানো উচিত ছিল যেন নম্রভাবে তাগাদা দেয় এবং ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়। অতঃপর রাসূল (স) হযরত উমরকে বললেন- এখনই তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং বিশ সা' খেজুর ঋণের অতিরিক্ত দিয়ে দাও।[৭৬]

---

[৭৫] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ.৩০৩

[৭৬] শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সুরাকা নামক জনৈক সাহাবী এক বেদুইনের নিকট হতে একটি উট ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করেননি। বেদুইন এজন্য তাঁকে নবী (স) এর সামনে হাজির করে। ঘটনাশুনে নবী (স) বেদুইনের পক্ষে রায় দেন এবং তৎক্ষনাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিতে আদেশ দিলেন। সাহাবী আরজ করলেন যে, মূল্য পরিশোধের মত অর্থ ও সামর্থ্য তাঁর নেই। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (স) বেদুইনকে নির্দেশ দিলেন তোমার বিবাদীকে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তোমার পাওনা উসুল করে নাও। বেদুইন তাকে বাজারে নিয়ে যায় ও সত্যিসত্যিই বিক্রি করে দেয়। বাজারে জনৈক মুসলিম সুরাকাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন।[৭৭]

বস্তুত অর্থসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে পরিস্কার ও স্পষ্ট থাকাকেই রাসূলুল্লাহ (স) পছন্দ করতেন। এক্ষেত্রে ধর্মভেদ কোনরূপ ভূমিকা রাখত না। ফলে অমুসলিমগণও মদীনাতে নির্বিঘ্নে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। ইসলামী বিধান মতে, অমুসলিমগণ নিজেদের পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারবে। যা দ্বারা সে নিজস্ব লোকদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম।[৭৮] এমনকি যে সব দ্রব্য মুসলিমদের জন্য হারাম কিন্তু অমুসলিমদের জন্য হারাম নয়, যেমন মদ শুকরের মাংস ইত্যাদি, এসব জিনিসের ব্যবসাও শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য বৈধ বলে ইসলাম ঘোষণা দেয়।[৭৯]

এছাড়াও আর্থিক বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় প্রসঙ্গেও ইসলামে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো বেকার, এতীম ও শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য অর্থভাতা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে হযরত উমরের একটি উক্তি বিখ্যাত--"ফোরাতের কূলে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা গেলে কাল কিয়ামতের ময়দানে সে জন্য আমাকেই দোষারোপ করা হতে পারে।"[৮০] দামেস্ক সফরের সময় হযরত উমর (রা) অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণের আদেশ জারী করেছিলেন।[৮১]

অমুসলিমদের কর বা জিজিয়া প্রদানের ক্ষেত্রেও শিথিলতা প্রদান করা হয়েছে ইসলামী শারী'আতে। জিজিয়া আদায়ে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ। হযরত উমর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না।[৮২] ইমাম আবু ইউসুফ বলেন--"কোন অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পুরো বা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেল তা তার উত্তরাধিকারের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করা হবে না।"[৮৩]

প্রকৃত পক্ষে অর্থনীতি সামাজিক বৈষম্যের মূল উপাদান। এর সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাব সমাজে সম্প্রীতির বদলে সংঘাতেরই জন্ম দেয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্পর্কের আলোচনায় দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক

---

[৭৭] শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬

[৭৮] মুহাম্মদ সলাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

[৭৯] ইউসুফ কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[৮০] মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪২বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল জুন ২০০৩, পৃ. ৩৬

[৮১] বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বৈরুত: দারু ইহয়াআত তুরাসিল আবাবী, ১৪১১ হি:, পৃ. ১২৯

[৮২] আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮,৮২

[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে এদেশে সব ধর্মের লোকজনই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে পারছে। বিশেষত ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে হিন্দুগণ ঐতিহ্যগতভাবেই বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছেন। মুসলিমদের সাথে আর্থিক সম্পর্কের অবস্থাও তাদের নিকট সন্তোষজনক।

আইনগত দিক বিবেচনায় ইসলামের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক আইনের দৃষ্টিতে জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান। সকলেরই ন্যায় বিচার লাভের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তাআলাও ন্যায় বিচারের জন্য সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৮৪]

বস্তুত মুসলিম অমুসলিম যে হোক না কেন চুরি, ধর্ষণ, মানহানিসহ সবধরনের অপরাধেই সমান সাজা-শাস্তি ভোগ করে। রাসূলুল্লাহ (স) ও পরবর্তী সাহাবাগণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল-

- তাইমা ইবন উবাইর নামক জনৈক মুনাফিক একবার একটি বর্ম চুরি করে এক ইহুদির বাড়ীতে পুঁতে রাখে। পরবর্তীতে বর্মটি পাওয়া গেলে ইহুদীকে চোর হিসাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। ইহুদী বিষয়টি অস্বীকার করে ও তাইমাকে দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করেন। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে মামলাটি নীত হলে তদন্তসাপেক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) ইহুদীকে নির্দোষ ঘোষণা করেন।[৮৫]

- বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরির দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলে রাসূলুল্লাহ (স) তার হাত কেটে ফেলার রায় দেন। কিন্তু কুরাইশগণ নানা মাধ্যমে এ বিব্রতকর রায়কে সহজ শাস্তিতে পরিণত করার সুপারিশ করলে রাসূলুল্লাহ (স) দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ হলো তারা অপরাধের কারণে শাস্তি দান হতে উচ্চবংশীয় অভিজাতদের রেহাই দিত ও দূর্বলকে শাস্তি প্রদান করত। আল্লাহর শপথ আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে আমি তার হাতও কেটে ফেলার নির্দেশ দিতাম।[৮৬]

- আরবের গাসওয়ান রাজা যুবালা ইবন আরহাম ইসলাম গ্রহণপূর্বক কাবা শরীফে হজ্জ করতে আসলেন। এসময় অসর্তক অবস্থায় জনৈক বেদুইন তার পোষাকে ময়লা লাগালে যুবালা বেদুইনকে আঘাত করলেন। বেদুইন হযরত ওমরের নিকট বিচার দাবী করলে হযরত ওমর (রা) যুবালাকে বললেন যদি আপনি বেদুইনের নিকট হতে প্রত্যাঘাত না পেতে চান তাহলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। যুবালা বললেন- আপনি কি রাজা ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য খেয়াল

---

[৮৪] আল কুরআন, ৫৫: ৭-১০, ৪: ১৩৫, ৪: ৫৮, ৫:৪২, ৪:২৫, ৪২,১৫, ৬০;০৮

[৮৫] মজিবুর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম*, শাশ্বত ভাতৃত্ব সংকলন-৯১, সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৪০

[৮৬] মুস্তাফা আস সিবায়ী (অনুবাদ- আকরাম ফারুক), *ইসলামী সভ্যতায় মানবপ্রেম*, মাসিক পৃথিবী, মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

করছেন না? জবাবে হযরত ওমর বলেন না ইসলামের আইনে সবাই সমান। অতপর যুবালা হযরত ওমরের নিকট হতে একদিন সময় নিয়ে পালিয়ে রোমান সম্রাটের আশ্রয়ে চলে যান।[৮৭]

- উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের পুত্র হিশামের বিরুদ্ধে জনৈক খ্রিস্টান অভিযোগ দায়ের করে। ফলে খলীফা ওমর বিন আবদুল আজীজ হিশামের বিরুদ্ধে সমন জারী করেন। অতপর আদালতের কাঠগড়ায় বাদী বিবাদী দুজনকে একই কাতারে দাড় করিয়ে বিচার পরিচালনা করা হল।[৮৮]
- হযরত আলী (রা) মিসরের গর্ভনরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্দ্ধে থেকে নির্ভয়ে ও কারো প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে চলতে হবে। [৮৯]

এরূপই ছিল ইসলামের ন্যায় বিচারের আদর্শ। সকল মানুষ একই সমতায় দাঁড়ানো। এক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাত ও অভিজাততন্ত্রের সুযোগ নেই। অমুসলিমগণ আইনগত ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মের প্রথা ও বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদনের অধিকারেরও দাবী রাখে। তবে তা নির্দিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। যেমন-ব্যক্তিগত বিষয়াবলী বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি বন্টন, ইসলামী আইনে প্রচলিত নেই এরূপ বিষয় ইত্যাদি। হযরত ওমর ইবন আবদুল আজিজ (র) একবার কয়েকটি বিষয়ে অমুসলিমের সমস্যা সমাধানের ফতোয়া জানতে যেয়ে হযরত হাসান আল বসরীকে চিঠি লিখেন। বিষয়গুলি ছিল নিকটাত্মীয়দের বিবাহ, মদ, শুকর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ। হাসান বলেন- এক্ষেত্রে আপনি তাদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মীমাংসা করুন। এটাই ইসলামের বিধান। মনগড়া নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন না।[৯০]

বাংলাদেশের আইনে এরূপ ধারাই প্রচলিত। সাধারণ ফৌজদারী মামলায় মুসলিম-অমুসলিম সমানাধিকার প্রচলিত। আর বিশেষ কিছু বিষয়ে হিন্দু মুসলিমদের প্রচলিত ধর্মীয় আইনে তার মীমাংসা করা হয়। যার সবটুকুই ইসলাম সমর্থিত। অবশ্য গ্রাম্য মজলিস বা পঞ্চায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণত যুক্তি, ধর্ম ও প্রচলিত আইনের নিয়ন্ত্রণে একপ্রকার বিচারকার্য সম্পাদন করা হয়, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। বাংলাদেশ সরকার ইসলামী আইনের এরূপ অপব্যবহারের ফলে ইতোমধ্যেই গ্রাম্য ও স্থানীয় পর্যায়ে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও হীন স্বার্থ চরিতার্থকরার জন্য ধর্ম ব্যবহারকারীদের ফতোয়াবাজি বন্ধকরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামী আদর্শের অপপ্রয়োগ হতে জাতিকে রক্ষা করেছে।

---

[৮৭] **Ahmed Gaimil** Mazzara, ***Islam, democracy and sociolism***, Islamic Review, 1962, working England, p.8

[৮৮] **মাওলানা এ.কে আজাদ** (অনুবাদ প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম), *আদর্শ খেলাফতের নমুনা*, ঢাকা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ৩০২

[৮৯] **হযরত আলী**, ***প্রশাসনিক চিঠি***, (অনুবাদ খুরশীদ আলম) ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১১৮৬, পৃ.৭

[৯০] **Abul A'la Maududi**, ***The Rights of the People of Covenent in the Islamic State***, Lahore, 1968, p. 22

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযাপনের অন্যান্য দিকের ন্যায় অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানও দায়িত্বশীল মুসলিমদের যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। অমুসলিমদের জানমাল সম্পদ সম্প্রদায়ের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না। অন্যায়ভাবে তাদের জানমাল বা ইজ্জতের সামান্যতম ক্ষতি করাও হারাম।[৯১] ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণনার মনীষীগণ বলেন- "মুসলিমদের জন্য রাষ্ট্র যেরূপ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থাকবে।তাদের জন্যও সেরূপ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থাকবে। মুসলিমরা যেরূপ শাস্তি বা দন্ডের সম্মুখীন হবে তারাও অনুরূপ শাস্তি ও দন্ডের সম্মুখীন হবে।"[৯২] বস্তুত অমুসলিমদের প্রতি কোনরূপ হত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, সম্মানহানি ইত্যাদি আচরণ কখনোই করা যাবে না। হযরত আলী (রা) এর শাসনামলে একবার এক মুসলিম জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি মুসলিমের মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। এ ঘটনায় তিনি বলেন- তারা (অমুসলিমগণ) জিযইয়া দিতে সম্মত হয়েছে এ শর্তে যে তাদের ধনসম্পদ ও জীবন আমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের মতোই সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে।[৯৩]

জানমালের মতো অমুসলিমদের সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট করাও হারাম। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে ঠাট্টাবিদ্রুপ, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।[৯৪] এ নিষেধাজ্ঞা শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং মুসলিম-অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-"যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের বেত দ্বারা প্রহার করা হবে।"[৯৫] এ প্রসঙ্গে ইবনু আবিদীন বলেন-

> "তার (অমুসলিমের) গীবতকরা মুসলিমের গীবত করার ন্যায়ই নিষিদ্ধ। কেননা চুক্তির কারণে তারা আমাদের অনুরূপ, সকল অধিকার তার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। অতএব, মুসলিমের গীবত করা হারাম হলে তার গীবত করাও হারাম হবে। উপরন্তু ইমামগণের মতে- অমুসলিমের প্রতি অবিচার করা অধিকতর জঘন্য কাজ।"[৯৬]

অমুসলিমদের প্রতি নির্যাতন, হুমকি ধমকি দেয়া, মানসিক অত্যাচার করা সবই নিষিদ্ধ। বরং তাদের সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা ইসলামী বিধানমতে জরুরী। রাসূলুল্লাহর (স) নিম্নোক্ত বানী আমাদেরকে এ ব্যাপারে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে-

- "যে ব্যক্তি, কোন লোককে নিরাপত্তা দান করার পর হত্যা করল, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত, যদিও নিহত ব্যক্তি অমুসলিম হয়।"[৯৭]

---

[৯১] আবুল হাসান আলী আল মাওয়ারদী, *আল আহকামুল সুলতানিয়াহ*, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, পৃ. ১৮৩
[৯২] আলা উদ্দীন আল কাসানী, *বাদাইয়ুস সানাই*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খন্ড-৭, পৃ. ২৮৮
[৯৩] আল কাসানী, প্রাগুক্ত, খন্ড-৭, পৃ. ১১১
[৯৪] আল কুরআন, ৪৯:১১
[৯৫] তাবরানী, *আল মু'জামুল কাবীর*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন, হাদীস নং ১৭৬০১
[৯৬] মুহম্মদ আমীন ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হিঃ, খন্ড-৪, পৃ. ৩৫১
[৯৭] তাবরানী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৬৪৯৪

Dhaka University Institutional Repository

- "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করল কিংবা তার অধিকার ক্ষুন্ন করল বা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিল, বা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোন কিছু তার নিকট হতে কেড়ে নিল, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হব।"[৯৮]

- "যে কেউ কোন যিম্মীকে (অমুসলিম) জ্বালা যন্ত্রণা দিবে, আমি তার প্রতিবাদকারী। আর আমি যার প্রতিবাদকারী হব, তার বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব।"[৯৯]

বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম-অমুসলিমের সংঘাত তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত যে কারণেই হোক না কেন, ইসলামী বিধান মতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদিও বাংলাদেশে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা খুব একটা দেখা যায় না। তথাপিও সংঘাত ও নির্যাতনের একটি ঘটনাও ইসলামে কাম্য নয়। বরং পারস্পরিক সহনশীলতার আদর্শ অনুসরণ করে মুসলিমদের উচিত, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তো বটেই, সংঘাতযুক্ত পরিস্থিতিতেও অমুসলিমদের আশ্রয় দেয়া, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া।[১০০] এভাবেই সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের পরিবর্তে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দ্বার উন্মুক্ত হবে।

---

[৯৮] আবূ দাউদ সুলায়মান, *আস সুনান*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ২৬৫৪

[৯৯] মুহাম্মদ আবদুল মালেক, *অমুসলমানদের প্রতি মহানবী (স) এর ব্যবহার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১৪৫

[১০০] আল কুরআন, ৯:৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কোন্নয়নের সম্ভাবনা ও সুপারিশ মালা

Dhaka University Institutional Repository

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি তথা মুসলিম অমুসলিমের মিলন ও সমন্বয় সাধনের দাবী আজকের নয়, বরং এ আকাঙ্খা বহুদিনের। পৃথিবীর সর্বত্রই সবাই আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় ও ঐক্যবদ্ধতায় আকাঙ্ক্ষী। এ লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বে নানা সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ডায়ালগ, মহাসম্মেলন বহু কিছুই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশও এর আওতাবহির্ভূত নয়। যদিও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের চেয়ে সম্প্রীতিই এদেশের মূল বৈশিষ্ট্য তথাপিও এদেশের ধর্মীয় দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়, মুসলিম ও হিন্দুর সমন্বয় সাধন ও সম্পর্কোন্নয়ন সকলেরই কাম্য। এ লক্ষ্যে এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ, সচেতন ও বিবেকবান নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ সকলেরই সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

তবে আন্তঃধর্মীয় মিলন বা সমন্বয় বলতে দুটি ধর্মকে একত্র করে একটি ধর্মে পরিণত করা নয়। যেমনটি করেছিলেন মোগল সম্রাট মহামতি আকবর। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃত তার দ্বীন-ইলাহী রাজদরবারের বাইরে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে এরও বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মিলন হলো পারস্পরিক আচার-আচরণ সমাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্প্রীতিভাব স্থাপন। সকল ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করবে । নিজ ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করবে, সম্প্রীতির পরিচায়ক হিসাবে অন্য কোন ধর্মের সমান্যতম ক্ষতিও হয় এরূপ কোন কাজ করবে না; সাম্প্রদায়িক উগ্র চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নির্যাতন, নিপীড়ন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন, হত্যা, ধর্ষণ লুটতরাজ ইত্যাদি হতে বিরত থাকবে। এটাই বর্তমান আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের মূলসূর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এ ধরনের ঐক্যের কথাই বলেছেন "হিন্দু মুসলিম ঐক্য অর্থ সংমিশ্রণ নয় মিলন, ফিউশন নয়, ফেডারেশন; দুটি স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট সম্প্রদায় রাজনৈতিক কারণে ও উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে মাত্র, মিশে এক হয়ে যাবে না।[১]

বস্তুত মুসলিম অমুসলিমদের এরূপ মিলন চিন্তা বা বিদ্যমান সম্পর্কের উন্নয়নে সর্বপ্রথমেই সম্পর্কের ভিত্তি খুঁজে নেয়া দরকার। বিশেষত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ নির্ণয় করতে পারলে তার সমাধান অসম্ভব নয়। বাংলাদেশের গবেষকগণ এ নিয়ে ব্যাপক চিন্তা ভাবনা করেছেন। তাঁদের মতে, সাম্প্রদায়িক সংঘাত যাই ঘটুক না কেন, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক এর মূল কারণ রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, আইন, সমাজকাঠামো, বৈষম্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনটিই নয়। বরং এগুলি উপলক্ষ মাত্র। এদের মাধ্যমেই মূল কারণটি প্রকাশিত হয়। আর এই মূল কারণটি হলো বাঙালি নানা ধর্মাবলম্বীদের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা। অধ্যাপক অনিল চন্দ্র বলেন,

> "দুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করলে ছোটখাট বিষয়ে একে অন্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু তার ফলে কোন সংস্কৃতির রূপান্তর বা উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে না। হিন্দুরা পীর ফকিরকে শ্রদ্ধা করত তাদের তথাকথিক অলৌকিক ক্ষমতার জন্য। কিন্তু তাদের পৃষ্ঠ অন্ন

[১] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

বা পানীয় গ্রহণ করত না। হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দিত মুসলামানরা হোলি খেলত। কারণ আমোদ উৎসবে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি।"[২]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সমস্যার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে--

> "ভারত বর্ষের এমনি কপাল যে এখানে হিন্দু-মুসলিমের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে ধর্মমতে হিন্দুর বাঁধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলিমদের বাঁধা প্রবল নয়; ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা। অন্য পক্ষের যে দিকে দ্বার রুদ্ধ এরা কী করে মিলবে।[৩]

এক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম স্বীয় 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়' গ্রন্থে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলিমদের নানা মানসিকতা তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে তিনি বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রচলিত দৃষ্ঠিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের সাধারণ ভাবনা হলো-১। মুসলিমরা বিধর্মী, ২। মুসলিমরা স্বভাবত সাম্প্রদায়িক ও গোঁড়া, ৩। মুসলিমরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত, ৪। মুসলিমরা পঞ্চম বাহিনী অর্থ্যাৎ দেশের খবর শত্রুর কাছে পাচার করে। ৫। মুসলিমরা ঘেটো মানসিকতাসম্পন্ন অর্থ্যাৎ নির্দিষ্ট মুসলিম এলাকায় থাকতে ভালবাসে, ৬। মুসলিমরা স্বভাবত পরিবর্তন বিমুখ, ৭। মুসলিমরা চারটে বিয়ে করেন, ৮। মুসলিমরা স্বভাবত নিষ্ঠুর, ৯। মুসলিমরা অত্যন্ত নোংরা এবং ১০। মুসলিমরা বেশি সুবিধা ভোগ করেন ইত্যাদি ।

অপরদিকে হিন্দুদের প্রসঙ্গে মুসলিমদের ধারণা প্রসঙ্গে নজরুল বলেন মুসলিমরা মনে করেন-- ১। হিন্দুরা বিধর্মী, ২। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ও শুচিবায়ুগ্রস্ত, ৩। হিন্দুরা সেকুলার শাসনের আড়ালে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ৪। হিন্দুরা মনে করেন মুসলিমরা বিদেশী, ৫। হিন্দুরা সুযোগ পেলেই মুসলিমদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, ৬। হিন্দুরা মুখে মিলনের কথা বললেও মনে শত্রু ভাবাপন্ন, ৭। হিন্দুরা সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিমদের উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেন, ৮। হিন্দুরা সুচতুরভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবহার করেন এবং হিন্দুরা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমদের কলঙ্কিত করেন ইত্যাদি।[৪]

নজরুল ইসলামের এ বিশ্লেষণ মূলত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানসিকতার মূল্যায়ন। তবে ব্যাপকার্থেও এ মানসিকতা বাঙালি সমাজে একেবারে অপাংক্তেয় নয়। আলোচ্য মানসিকতায় সামাজিক নানা উপাদানের প্রভাবও স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ নানা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপাদানসমূহই মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা গঠনের মূল হাতিয়ার। মানসিকতা ও সামাজিক উপাদানগুলো মূলত পরস্পর পরস্পরের প্রভাবক। একটির দ্বারা অপরটি প্রভাবিত হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা ও উন্নয়নে এ উভয়বিধ কারণকেই প্রাধান্য দিতে হবে সমানভাবে।

---

[২] অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,*মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালি*, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৪০

[৩] রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, এয়োদশ খন্ড, পৃ .৩৫৭

[৪] মফিদুল হক, *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৯, পৃ. ১০৫-১০৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় বাঙ্গালিদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা কম হয়নি । বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগ হতেই এ মিলন প্রচেষ্টা দেখা যায়। অসীম রায় যাকে সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫] মফিদুল হক সংক্ষিপ্তভাবে এ সত্যতা বর্ণনা করে বলেন-

> এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সব অর্জন মুসলিম ও হিন্দুর মিলিত সাধনার পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতির দিকে চোখ ফেরালে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু আরো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মোগল সংস্কৃতির যে গৌরব ভারত ভূখন্ডের অধিবাসী মাত্র বহন করেন তা হিন্দু মুসলিমের মিলনের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বাংলার যারা শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল তাদের মধ্যে মিলনের সংস্কৃতির বোধ প্রবলভাবে কার্যকর ছিল। বাংলার লোক শিল্পীদের এই চরিত্র তো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি বাংলার যারা ধর্মনেতা, শাহ জালাল, বায়েজিদ বোস্তামী, শাহপরান থেকে হালের গউসুল আজম মাইজভান্ডারী এদের হৃদয়ে হিন্দু মুসলিমের জন্য সর্বদা উদার আসন পাতা ছিল। উনিশ শতকে ধর্মসংস্কারমূলক ব্রাহ্ম প্রভৃত উপাদান গ্রহণ করেছিল। পক্ষান্তরে হিন্দুর ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস নিষ্ঠাচারের সঙ্গে উদারতার কোন বিরোধাভাস দেখেননি। আর বিবেকানন্দতো ভারত বর্ষে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের যুগল সাধনা কাম্য করেছিলেন। সত্যপীর, বনদেবী, ওলাবিবি ইত্যাদি হিন্দু মুসলিমের আরাধনার ক্ষেত্রে লৌকিক সমাজে নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৬]

বাংলার হিন্দু মুসলিম মিলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয় সুফী-সাধকদের দ্বারা। পরবর্তী সুলতানদের দ্বারাও এ প্রক্রিয়া উন্নত হয়। মধ্যযুগে মুসলিম অমুসলিম ঐক্যের ধারক ও বাহক ছিলেন লেখক সাহিত্যিকরা। লোক গান, বাউলগান, সহজিয়া মতবাদ, ভক্তিবাদ, আধ্যাত্মবাদ ও গোত্রীয় সংস্কৃতির সাহিত্য এদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দান করে ।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য এড়াতে সাংস্কৃতিক মিলনের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন-

> "While I do not condemn any path-up work may be necessary in healing communal sores, I world age the necessity of discovering a deeper remedy for out communal troubles I denture to think that the fundamental basis of political unity between different communities habiting India are too exclusive. In order to facilitate cultural rapprochement, a does of secular and scientific training is necessary".[৭]

---

[৫] Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Princeton: Princeton University Press, 1983

[৬] মফিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৭] বিমল চক্রবর্তী, *নেতাজী সুভাস চন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা*, অরুন কুমার গুপ্ত (সম্পাদিত) দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র (শতবর্ষে স্মরণ ও মূল্যায়ন), প্রথম খন্ড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসানামলে উপমহাদেশে ইংরেজ বিভেদনীতির ফলে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবর্তে যখন ক্রমান্বয়ে সংঘাতের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে সেসময়ও হিন্দু মিলন প্রচেষ্টা দেখা যায়। সেটা যেমন ব্যক্তিগতভাবে সত্য ছিল সামষ্টিকভাবে, এর উদাহরণ বিরল ছিলনা। হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের লোকই এ সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বলেন-

> "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হিন্দু। নিজের ধর্মমতে তাঁর অটুট প্রাণভরা আস্থা ছিল। সে আস্থায় কোন দ্বেষ ছিল না। ছিল শুধু ভালবাসা, তাই স্বদেশবাসী মুসলিমদের ধর্মের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও হিন্দু মুসলিম ঐক্য কেমন করিয়া আন্তঃরিক বিশ্বাস করা যায়, দেশবন্ধু ছিলেন তার আদর্শ নিদর্শন।"[৮]

দেশবন্ধুর ভাবশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও বহুত্ববাদী, প্রেমবাদী, উদারনৈতিক ধর্মনীতিকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া ভারত বর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ সমস্যার মূলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দায়ী ছিল তিনি তা বুঝতেই পেরেছিলেন। সুতরাং সুক্ষ্মমানের অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক সত্ত্বার যথাযথ স্বীকৃতিই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ বলে তিনি চিহ্নিত করেন।[৯] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সপক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তার নিজের বক্তব্য-

> "আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলিম। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিলো। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলিম প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনি তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোন উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ আমার সঙ্গে আমার মুসলিম প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন"।[১০]

কাজী নজরুল ইসলামও হিন্দু-মুসলিমের মিলনের প্রতীক ছিলেন। এ মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে শুধু তার রচিত কবিতা, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি অর্থ্যাৎ সাহিত্য চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় । বরং ব্যক্তিগত জীবন যাপনেও তিনি তার এই বিশ্বাসের বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছেন এবং হিন্দু মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে তিনি তাতে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন।[১১] তার সম্পাদিত পত্রিকা ধুমকেতুর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তিনি বলেন-"ধুমকেতু কোন সাম্প্রাদয়িক কাগজ নয়। হিন্দু-মুসলিমের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১২]

---

[৮] আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮

[৯] সত্যব্রত দত্ত, *সুভাষ চন্দ্র ও মুসলিম প্রশ্ন*, পরিচয় (শতবর্ষে সুভাষ চন্দ্র) কলকাতা, জুন-জুলাই ১৯৯৬, পৃ. ৭৮

[১০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *হিন্দু মুসলিম*, মইনুল হাসান সম্পাদিত, মুসলিম সমাজ এবং এই সময়, প্রথম খন্ড , কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ১৮

[১১] রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কৃষ্টি*, কলিকাতা: কেপি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৯৭, পৃ. ৫২১

[১২] *নজরুল রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পাাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম খন্ড, ১৩৯০, পৃ. ৬৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইকবাল-এর জীবনীতেও একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মাধ্যমে ১৯৩০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যেসব দার্শনিক ও প্রায়োগিক বিষয়ের প্রস্তাব করেন তা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত। [১৩] দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা বলে খ্যাত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও নিজকে প্রথমে ভারতীয় এবং পরে মুসলিম বলে ভাবতেন। হিন্দু মুসলিম মিলনের মাধ্যমে ভারতের মুক্তি নিহিত বলে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এসকল কারণে সরোজিনী নাইডু তাকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের রাজদূত' হিসাবে যথার্থই আখ্যায়িত করেছিলেন।[১৪]

ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি রাজনৈতিক ভাবে সমষ্টিক উদ্যোগও ব্রিটিশ ভারতে লক্ষ্যণীয়। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এরূপই। হিন্দু মুসলিম বিভেদ বৈষম্য দূর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ উম্মুক্ত করা। তবে তাঁর অকাল মৃত্যুতে উদার নেতৃত্বের অভাবে হিন্দু মুসলিমের মিলনের এ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১৫] রাজনৈতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌচুক্তিও মুসলিম অমুসলিম মিলনের পথ সুগম করেছিল। এছাড়া ১৯২৭ সালের কংগ্রেসের পার্টি কনফারেন্সও ছিল উল্লেখযোগ্য। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এর প্রথম অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার পুংখ্যানুপুংখ পর্যালোচনার আলোকে সকল সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করা হয় । পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি সুষ্ঠু গঠনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হয়।[১৬] বাংলার অথনৈতিক সমস্যাদি সমাধানে বেঙ্গল প্যাক্ট-এর চুক্তি স্বাক্ষরও ছিল সাম্প্রদায়িক অথনৈতিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ। যদিও নানা কারণে এটি দু'দফায় পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়। ১৯৪০ সালে কলকাতার অন্ধকূপ হত্যা নামক কল্পিত ঘটনার স্মারক "হলওয়েল মনুমেন্ট" অপসারণও ছিল হিন্দু-মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম ধাপ।[১৭]

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার এক অভূতপূর্ব নজীর ছিল খেলাফত আন্দোলন। এ আন্দোলনকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সমর্থন করেছিল। এর ফলে দেখা যায় ১৯২১ সালে ঈদুল আযহার সময় কলিকাতার মুসলিম কোরবানি থেকে বিরত থেকেছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে বক্তৃতা করার জন্য জুমার নামাযের সময় কলকাতার জামে মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[১৮] বস্তুত বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান যা হিন্দু মুসলিম মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। নানা কারণে সর্বতোভাবে সফল না হলেও এ উদ্যোগগুলি বিফলে গেছে এটাও মনে করা যায়না। বর্তমানে

---

[১৩] Dr. Sachin Sen, ***The Birth of Pakistan***, Calcutta: General Printers and Publisher Ltd, 1955. p. 83

[১৪] শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, *জিন্নাহ পাকিস্তান নতুন ভাবনা*, কলিকাতা: মিত্র ও স্রোত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ৮

[১৫] M. Ali Asgar Khan, ***The Bengal pact, 1923: A study of Hindu Muslim Relations***, JIBS Vol. V11, 1984, p.147

[১৬] Waheed Uz-Zaman, ***Towards Pakistan***, Lahore Publishers United Ltd, 1964, p. 40

[১৭] চিত্তরঞ্জন মিত্র , *সুভাষ চন্দ্র বসুর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা একটি সমীক্ষা*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ২৫-২৬. ১৪০৫-০৮, পৃ.১১-১২

[১৮] Khalid Bin Sayeed , ***Pakistan: The Formative Phase***, London, Oxford University, 1984, p. 40

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান এসব ঘটনা ও ঐতিহাসিক উদ্যোগেরই ফল হিসাবে গবেষকগণ মনে করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের তেমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। তথাপিও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক স্থাপন, রক্ষা ও উন্নয়নে সকলেই কাজ করে চলেছেন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার সুধীমহল, মানবতাবাদী সংস্থা সংগঠন, সুশীলসমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ছাত্র-শিক্ষকসহ শিক্ষিত সমাজ সর্বোপরি সকল স্তরের জনগণের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। বাস্তব জীবনে তাঁদের সম্প্রীতি ও সাম্যের আদর্শ অনুসরণ বাংলাদেশের মানুষের উদারনৈতিক মানসিকতারই প্রতিফলন। ব্রিটিশ শাসনামলের কিছু কলংকজনক ঘটনা বাদ দিলে বাংলার ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা সাম্প্রদায়িক সহনশীলতার অনুপম নজীর হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট গ্রহণীয় হবে। তথাপিও সম্প্রদায় বা ধর্মের ছদ্মাবরণে সংঘটিত ছোট-খাট সংঘাত ও নির্যাতন দূর করে আন্তঃধর্মীয় সম্পক উন্নয়ন ও রক্ষায় এদেশের মানুষের ঐকান্তিকতা প্রমাণে বেশ কিছু কাজ করা দরকার। আলোচ্য গবেষণার আলোকে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষা ও উন্নয়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ নিম্মে উপস্থাপন করা হলো-

১. আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক রক্ষা ও উন্নয়নে সবচাইতে পূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোন দেশের সরকার। কেননা সরকারের কার্যাবলীর মাধ্যমেই একটি দেশ পরিচালিত হয়, বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয় আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সুতরাং আন্তঃঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারকে আন্তঃরিক হতে হবে, উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী আদর্শ সামনে রেখে সকল ধর্মের প্রতি সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে। এমন কোন কাজ করা যাবে না যা দ্বারা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কারো কোনরূপ ক্ষতি মানহানি বা ক্ষতি সাধিত হয়। সরকারের সৎকর্ম পরিকল্পনা মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক রক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার ।

২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আন্তঃঃধর্মীয় সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারে । আইনগত বিবেচনায় সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকারের বর্ণনা শুধুমাত্র সংবিধান কিংবা আইনের বিধানাবলীতে থাকলেই চলবে না। বরং এর যথাযথ ও সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিচারালয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩. রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি বিশ্লেষকদেরকেও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ধর্মীয় ছদ্মাবরণে যেন রাজনৈতিক নির্যাতন না হয় সেদিকে কঠোরভাবে লক্ষ রাখতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার ও ধর্মীয় বৈষম্যেও কারণে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের ঘৃণ্য পন্থা রাজনীতিবিদগণই বন্ধ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দুরীকরণ সম্ভব না হলে সাম্প্রদায়িক শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। এলক্ষ্যে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ধর্মীয় বৈষম্যমূলক কোনরূপ বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করা যাবে না। বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনগ্রসর উপজাতি সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীদের সুযোগ সুবিধা দানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

৫. সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক ও জটিলতর ক্ষেত্র হলো সামজিক জীবনাচরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত অলিখিত সামাজিক নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরী। সমাজপতিগণ ও স্থানীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হলে সামাজিক সম্পর্কের নানা দিক সম্প্রীতির চাদরে আবৃত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষিত সমাজকে এ অসামান্য চেতনা বিকাশের দায়িত্ব নিতে হবে। অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাছন্ন নিয়মনীতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তক বিধানাবলী সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব শিক্ষিত সমাজেরই। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও দাঙ্গার কুফল ও জাতীয় উন্নতিতে এর মারাত্মক প্রভাব প্রসঙ্গে জনগণকে সতর্ক করার দায়িত্বও এঁদের উপরই বর্তায়।

৭. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সাহিত্যের অর্ন্তভূক্তিকরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অন্যতম উপায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বদের জীবনীর উল্লেখ করা যেতে পরে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ইতিবাচক দিকগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

৮. ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা আলোচ্য ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। মসজিদেও ইমাম, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ইসলামের সুমহান আদর্শ ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত প্রদান করে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এমনিভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বী পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, গুরু, পাদ্রী, ফাদার বিশপসহ সব ধর্মীয় নেতাগণ নিজ নিজ ধর্মের সম্প্রীতি ও উদারতার আদর্শ প্রচার করতে পারেন। এতে করে ধর্মপ্রিয় বাংলাদেশের জনগণ নিজ ধর্মের সাথে পরধর্ম সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হবে।

৯. শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো দরকার। নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কে প্রভাবিত করতে পারে। সকল ধর্মের উদারতা নৈতিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ইত্যাদি শিক্ষার জ্ঞান অপর ধর্মের প্রতি মানুষকে সহনশীল করে তুলবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

১০. জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। এ লক্ষ্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

১১. সকল প্রকার দুর্নীতি, অনিয়ম, উৎকোচ ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। এতে করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নৈতিকতার মান উন্নত হবে।

১২. দেশের সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় সকল নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক কারণে যেন দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট না হয় এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ও উন্নয়নে মিডিয়ার ভূমিকাও অপরিসীম। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এক্ষেত্রে ইতিবাচক সম্প্রীতির খবর পেশ করে জনগণকে উৎসাহিত করতে পারে। আর অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের খবরের যথাযথ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পেশ করে জনগণের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করতে পারে।

১৪. সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে দেশের আন্তঃধর্মীয় সামাজিক সম্পর্কের অবস্থান ও সময়োপযোগী কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করাও আবশ্যক।

১৫. আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণকে নানাভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা প্রদান করতে স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ প্রযোজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন ।

১৬. গবেষকগণ আন্তঃধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর সময়োপযোগী ও যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা তুলে ধারে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন । সম্প্রদায়গুলোর পারস্পরিক আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কেন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পৃথক পৃথক গবেষণার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত।

সর্বোপরি আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক রক্ষা ও উন্নয়নে এদেশের আপামর জনগণ সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ব্যতীত এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রকৃত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। তবে আশার কথা এই যে, বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক এককথায় চমৎকার । এদেশের জনগণও এব্যাপারে বেশ সচেতন। সুতরাং পারস্পরিক সম্প্রীতির উন্নয়নে উপরোক্ত সুপারিশমালা পূর্নাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশ উদারনীতি ও সহনশীলতার আদর্শে বিশ্বাসী একটি মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ। এদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক বেশ চমৎকার। ইসলামের আগমন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রায় তের শত বছর যাবৎ চলে আসা মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক এদেশে সর্বদাই একরকম থাকেনি। সম্পর্কের উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি সময়ের পরিক্রিয়ায় নানা রূপ লাভ করেছে। তবুও ঐতিহাসিক ও বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায় যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের চেয়ে সম্প্রীতিই এদেশের বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের চেয়ে সম্প্রীতিই এদেশের স্থানীয় ঐতিহ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। ব্রিটিশ শাসনামলে সমাজের প্রভাবক উপাদানগুলোর ফলে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নির্যাতনের ক'টি ঘটনা বাদ দিলে বাংলার আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ইতিহাস শুধুই সৌহার্দ্যের; সম্প্রীতির। বাংলার স্থানীয় সহনশীল ও পরমতসহিষ্ণু ঐতিহ্য ও মননশীলতা এদেশের মানুষের মধ্যে বিভেদের দেয়াল গড়তে দেয়নি কখনোই। তাইতো দেখা যায় উঠাবসা, চলাফেরা, লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সাদৃশ্য; উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ঢল; পারস্পরিক সুখে দুঃখে, হাসি কান্না, আনন্দ-বেদনায় অংশীদারিত্বের অপূর্ব মহিমা। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর গভীর শোকাহত পরিবেশেও আন্তঃসম্প্রাদায়িক ভারসাম্যের অপূর্ব নজীর। এর কৃতিত্ব কোন একক ধর্মের নয়। বরং সব কটি ধর্মই এর সমান অংশীদার। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ইসলামের আদর্শ ও অনুপম নৈতিকতার ভূমিকার কথা আলাদাভাবে না বললেই নয়। ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করে মুসলিমগণ এদেশে যে স্থানীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তবে রাজনীতি বা পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির ছদ্মাবরণে ধর্মের নামে যেসব সংঘাত নির্যাতন, তা যতই কম হোক না কেন, তা নিতান্তই অনাকাঙ্খিত। স্বার্থবাদী মানুষের এই কর্মকান্ড বাংলার আপামর জনসাধারণের স্বর্গীয় মানসিকতার পরিচায়ক নয় কোনভাবেই। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে চিত্র বর্তমান বাংলাদেশের অহংকার, তা ধরে রাখতে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জরুরী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুসলিম-অমুসলিম সুসম্পর্কের এই সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হবে চিরকালব্যাপী; ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে। এটাই সকলের কাম্য, সকলের আরাধনা।

.....

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- *আল কুর'আনুল করীম*
- *আল কুর'আনুল করীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩
- মুফতি মুহাম্মদ শফী (র:), *তাফসীর মা'আরেফুল কুর আন*, অনু: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান মদিনা খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি
- ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস্ সাহীহ*, বৈরূত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭
- ইমাম মুসলিম, *আস সাহীহ*, বৈরূত: দারু ইহইয়া আত্ তুরাসিল আরাবী, ১৩৭৮ হি:
- আবু দাউদ সুলায়মান, *আস সুনান*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন
- ইমাম নাসাঈ, *নাসাঈ শরীফ*, ঢাকা: কুতুবখানা রাশিদিয়া, ১৯৬৫
- ইমাম বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, মক্কা: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪
- আবু ইউসুফ, *কিতাব আল খারাজ*, মিশর: দারুল মাআরিফ, ১৯৭৭
- সাইয়্যেদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, ঢাকা, ১৯৭৪
- আশরাফ আলী থানবী, *তাফসীরে বয়ানুল কুরআন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬
- ইবন জাবীর আত তাবারী, *তারিখুল উমাম আল মূলক*, দামেশক: দারূল কলম, ১৯৮১
- ইউসুফ কারযাভী, *আল হালাল ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম*, বৈরূত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৮
- আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী (স)*, অনুবাদ মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন, ১৯১০
- বালাজুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, বিরুত: দারু ইহয়াআত তুবাসিল আরাবী, ১৪১১ হি:
- আত তাবাবী, *তারিখ*, খন্ড-৩, মিশর: দারুল মাআরিফ, তারিখ বিহীন
- ইবনে হিশাম, *সীরাতুন্নবী*, (অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪
- আহমদ যাকী সাফওয়াত, বৈরূত: *জামহারাতু রাসাইলিল আরাবা*, ১৯৭৩
- মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী, *সহীহ সুনানুন নাসাঈ*, রিয়াদ: মাকতাবুত তারাবিয়াতুল আরাবী লিদুয়ালিল খালিজ, ১৯৮৮
- আবু উমর মিনহাজউদ্দিন উসমান ইবন সিরাজদ্দীন আল জুজানী, *তবাকাত ই-নাসিরী*, কলকাতা, ১৮৮৪
- গোলাম হুসাইন সলিম, *রিয়াজ উস-সালাতীন*, কলকাতা, ১৮৯৮
- মুস্তাফা হিলমী, *আল ইসলাম ওয়াল আদইয়ান*, মিশর: দারু-ইবন জাওজী, ২০০৫
- তাওফিক সুলতান, *তারীখু আহলিয যিম্মাহ ফিল ইরাক*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪০৩ হি
- ভি ফিন্ডলী, *লা সূকূতা বা'দাল ইয়াওমি*, বৈরূত: শারিকাতুল মাতবুআত, ২০০১
- *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭
- আবুল হাসান আলী আল মাওয়ারদী, *আল আহকামুল সুলতানিয়াহ*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৮২
- তাবারানী, *আল মু'জামুল কাবীর*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন
- মুহাম্মদ আমীন ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হিঃ
- অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭
- নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব, কলিকাতা, ১৯৫৩ বঙ্গাব্দ
- এ কে এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

- ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯
- ড. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (১ম খন্ড), কলিকাতা, ১৯৯৩
- ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর অবদান*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৬৯
- তাঁরাচাঁদ, (এস মুহিবুল্লাহ অনূদিত) *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯১৮
- সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *আরবো কি জাহাজরাণী*, হুমায়ুন খান অনূদিত, আরব নৌবহর, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২
- মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্থানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮
- এ. কে. এম নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৬
- রফিউদ্দিন আহমেদ (সম্পা:), *ইসলাম ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৩
- জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, কলকাতা, ১৮৬২
- আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা, ১৯৭৭
- এম. এ রহিম, *সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিস্টোরি অব বেঙ্গল*, ভল্যুম ১, করাচি, ১৯৬৩
- মিনহাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরী* (আব্দুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৩
- আব্দুল কাশিম হিন্দ শাহ ফিরিশতাহ, *তারিখ-ই-ফিরিশতাহ*, নেওয়াল কিশোর সংস্করণ, প্রথমর্পব, ১৯৭৮
- মুহাম্মদ মোহর আলী, *হিস্টরি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল*, ভলুয়াম ১, রিয়াদ, ১৯৮৫
- এবাদাত হোসেন, *পদাবলী সমীক্ষা*, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
- জে. এন সরকার (সম্পা), হিস্টরী অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪
- সোহরাব উদ্দিন আহমেদ, পৃথিবীর ধর্মগুলি, ঢাকা:উম্মা প্রকাশনী, ১৯৯৮
- ড. পরেশচন্দ্র মন্ডল, ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন অধিকারী, *হিন্দু ধর্ম শিক্ষা*, নবম-দশম শ্রেণী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৮,
- মোজাম্মেল হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা,১৯৯৪
- মানবেন্দ্রনাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*, ঢাকা, প্যপীরাস প্রকাশনী, তা: বি:
- টমাস আর্ণল্ড, *দ্য প্রিচিং অব ইসলাম* (অনু : আদ দাওয়াতু ইলাল ইসলাম, মিসর: মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৭০
- মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা, ১৯৯৪
- সুব্রত বড়ুয়া, *আমাদের বাংলাদেশ*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯০
- আবদুল মমিন চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭
- H.PR. Finbery (ed), ***Approaches to History***, London, 1962
- J. Rennl, ***Memories of a Map of Hindustan***, London, 1783
- K. Sur, ***Pre-History and Beginnings of Civilization in Bengal***, Calcatta, 1969
- RC Majumdar, ***History of Ancient Bengal***, Calcutta, 1974
- J. Legge (ed), ***A Record of Buddhist Kingdoms***, by Fa-hien, Oxford, 1886
- S. Beal, ***Buddhist Record of the Western World II***, London 1884

Dhaka University Institutional Repository

- Trevor Ling, ***Buddhist Bengal and After*** D. Chattopadhayaya (ed) History and Society ,Calcutta 1978
- Barrie M. Morison, ***Political Centes and Cultural Regions in Early Bengal,*** Tucson 1970
- Chimpa Lama, and D. Chattopadhyaya, ***Taranatha's History of Buddhism in India***, Simla,1970
- Minhaj Uddin Abul Umar Usman, ***Tabakat-1-Nasiri, A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hindustan (810-1260)***, trans. H. G Reverty Calcutta: Asiatic Society of Bengal 1881, Reprint- New Delhi: Oriental Books Reprint corp, 1970
- John Deyell, ***Living Without Silver***, The Monetary History of early Medieval North India, Delhi: Oxford University Press, 1990
- Mohammad Enamul Haq, ***A History of Sufism in Bengal***, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1975
- ***Bengal district Gazetteers***, Mymensingh, 1917
- K. N. Dikshit, ***Memories of the Archaeological Survey of India***, No. 55, Relho- 1938
- Richard Symonds, ***The Making of Pakistan***, London, Faber and Faber, Russell square, 1951
- Rafiuddin Ahmed, ***The Bengal Muslim 1817-1906***, A quest for identity, Delhi,1981
- M Bevery, ***Report on the census of Bengal 1872***, Calcutta: Secretarial Press, 1872
- Jahes Wise, ***The Mohammedans of Eastern Bengal***, Journal of Asiatic Society of Bengal, year 63, 1894
- K. A. Nizami, ***Comprehensive History of India***, New Delhi: Peoples Pubs House, 1982
- Sir H. M. Elliot and Prof. John Dawson, ***The History of India***, as told by its own Historians, Vol 1, Allahabad: Kitab Mahal, 1964
- Ibn Battuta, ***The Rehela of Ibn Battuta***, trans. Mahdi Hussain, Baroda: Oriental Institute 1963
- D. Barbosa, ***The Book of Duarte Barbosa***, Eng tr. by U. I. Dares Vol ii, London, 1921
- P. Hardy, ***Modern European and Muslim Explanation of Conversion, to Islam in South Asia if Preliminary Survey of the Literature,*** in conversion to Islam ed, Nehemia Levtzion, New York: Homes & Meier, 1979

Dhaka University Institutional Repository

- Aziz Ahmed, ***Studies in Islamic Culture in India Environment***, Oxford: Clerendon Press, 1964
- K. F. Rubbee, ***Banglar Musulman (in Bangali),*** translated by Abdur Razzaqqe, Dhaka: Bangla Academy, 1986
- Herbert Risely, ***Tribes and Castes of Bengal***, Calcutta, 1981
- W. W. Lenter, ***The Indian Musulmans***, Calcutta, 1945
- Abdul Karim, ***Social History of the Muslims in Bengal Down to A.D 1338,*** Chittagong: Baitus Sharaf Islamic Research Institute, 1985
- I. H. Qureshi, ***The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent,*** The Hague, 1962
- Jagadish Narayan Sarkr, ***Hindus Muslim Relation in Bengal*** (Medieval Period), Idarah-i-Adariyat-i-Delhi, 1985
- Asim Roy, ***The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal***, Princeton: Princeton University Press, 1983
- Richard M. Eaton, ***The Rise of Islam and the Bengal Frontier***, Delhi: Oxford University Press, 1994
- Akbar Ali Khan, ***Discovery of Bangladesh***, An Explanation into Dynamics of a Hidden Nation, Dhaka: University Press Ltd, 1996
- K. N. Dikshit, ***Memories of the Archaeological Survey of India***, No. 55, Relho- 1938
- Herbert Buses, ***Islam, Judaism and Christianity***, Theological and Historical affiliations Princeton, NJ: Mascus weiner, 1988.
- F.E Peters, ***The Monotheists: Jews, Christians, and Muslim in Conflict and Competition***, Vol 1, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2003.
- S.V. Deshika Char, ***Hinduism and Islam in India, Caste, Religion and Society from Antiquity to Early Modern times***, Markus Wiener Publishes, Princeton, 1997
- Peter Clark, ***Zoroastrianism, An Introduction to an ancient faith.*** Sussex Academic Press, 2009
- Keder Nath Tiwari, ***Comparative Religion***, Delhi: Motilal Banarsidass, 1983
- Dan Cohn-Sherbok, ***Judaism: History, belief and practice***, Routledge, 2003
- John Day, ***Yahweh and the Gods and Goddesses of Canoon***, Chippenhem: Sheffield Academic Press, 2000.
- Teffilin, ***The Book of Jewish knowledge***, New York: Crown Publisher, 1964.
- Million Steinberg, ***Basic Judaism***, New York: Harcourt Brace Iovanovich, 1947.
- David Hazong, ***The Ten commandments***, New York: Scribner, 2010

Dhaka University Institutional Repository

- Jeffrey, S. Gurock, ***American Zionism: mission and politics***, New York, 1988
- Michael Ramsey, ***Jesus and the Living Past***, Oxford University Press, 1980
- Methnew Arlen Price & Michael Collins, ***The story of Christianity***, New York: Dorling Kindersley, 1999
- Tinda Woodhead, ***Christianity: a very short Introduction***, Oxford: Oxford University Press, 2004
- W Funk Robert, ***The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus***, Harper San Francisco, 1998
- Helmut Koester, ***Introduction to the New Testament***, Philadelphia: 1982
- B Peter Clarke (ed), ***The Religious of the world: Understanding the liking Faiths,*** USA: Marshall Editions Ltd. 1993
- K.M. Sen, ***Hinduism***, Delhi: Penguin Books
- W. Kenneth Morgan (ed), ***The Religion of the Hindus***, Delhi: Motilal Bararasidas, 1987
- A. Michacls, ***Hinduism: Past and Present***, USA: Princeton University Press, 2004
- A.L. Basham, ***A Cultural History of India***, Oxford Univesity Press, 1999.
- David Forenzen, ***Who Invested Hinduism***?, New Delhi, 2006
- Pratins Bowes, ***The Hindu Religious Tradition & Philosophical approach***, Delhi, Allied Pub. 1976
- Edward Conze, ***Buddhism, Its Essence and development***, London, 1978
- Dr. B.R. Ambedkar, ***The Buddha and this Dhamma***, Nagpur: Buddha Bhoomi Publication, 1997
- Rupert Gethin, ***Foundations of Buddhism***, Oxford University Press, 1988
- Walpola Rahula, ***What the Buddha Taught***, UK: Grove Press, 1974
- Karen Armstrong, ***Buddha***, US: Penguin Books, 2001
- Lovis Iacob, ***Judaism' in Freb Skolnik 'Encyclopaedia Judaica***, II (2nd ed) Farmington Hill: Thomson Gale, 2007,
- মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান* (১৭৫৭-১৮৫৭), পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬
- *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০
- Muhammad Nurul Haq, ***Arab Relation with Bangladesh***, M.phil thesis (Unpublished) D. U., 1980
- ***Census of India, 1901***, Vol-6, The lower provinces of Bengal and their Feudatories ,Calcutta: Bengal Secretarial Press, 1902

Dhaka University Institutional Repository

- Abu A Ghuznavi, ***Notes on the Origin, Social and Religious Divisions and other Matters Touching on the Muhamedans of Bengal and Having Special Reference to the District of Maimensing***. India Office Library, London, N. D, European MSS., E 295, Vol 17
- H Beverly, ***Report on the census of Bengal 1872***, Calcutta: Secretarial Press, 1872
- Mahwah, ***World Almanac and Book of Facts 2000*** NJ, Primidia Reference Inc. 1999
- ***CIA world Fact book***, Central Intelligence Agency: 2007, USA
- ***Statistical Pocket Book of Bangladesh 2008***. Bangladesh Bureau of Statistics, January 2009
- ***Bangladesh Population Census-2001***, National Series, Vol-1, Analytical Report
- ***Bangladesh Economic Review 2007***, Economic Advisers wing, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, March-2008
- ***Statistical Year Book of Bangladesh-2006*** (28th edition), Bangladesh Bureau of statistics
- http://www.adherents.com
- http://en.wikipedia.org
- http://www.bangladesh.2000.com

.....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এম.ফিল গবেষণা কর্ম "বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি" এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে এই প্রশ্নমালাটি তৈরী করা হয়েছে । এক্ষেত্রে আপনি খোলা মনে আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করতে পারেন । তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করা হবে ।

উত্তরদাতার পরিচিতি :

১. নাম :
বয়স :
লিঙ্গ : ☐ পুরুষ ☐ মহিলা
ধর্ম :
স্থায়ী ঠিকানা :

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

প্রশ্নমালা সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন :

মোস্তফা মনজুর
প্রভাষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০
০১৯১১১০২৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ প্রশ্নমালা

০১. নিজ ধর্ম সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?

□ ভাল
□ মোটামুটি
□ অল্প
□ মোটেই না

০২. অন্য ধর্ম সম্পর্কে আপনার জানার মাত্রা কতটুকু ?

□ ভাল
□ মোটামুটি
□ অল্প
□ মোটেই না

০৩. অন্য কোন ধর্ম সম্পর্কে আপনার জানাশোনা আছে ?

□ ইসলাম
□ হিন্দু
□ বৌদ্ধ
□ খ্রিস্টান
□ অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করুন)--

০৪. আপনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কি ?

□ প্রায়ই করি
□ মাঝে মধ্যে
□ অংশগ্রহণ করি না

০৫. আপনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে (বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদিতে) অংশগ্রহণ করেন কি ?

□ প্রায়ই করি
□ মাঝে মধ্যে
□ অংশগ্রহণ করি না

০৬. প্রতিবেশী হিসাবে অন্য ধর্মাবলম্বীরা আপনার নিকট কতটুকু গ্রহণীয়?

□ ভালভাবেই
□ গ্রহণীয় নয়
□ অসুবিধা নেই
□ জানি না

Dhaka University Institutional Repository

০৭. অন্য ধর্মাবলম্বী বন্ধু-প্রতিবেশীদের সাথে আপনার উপহার আদান-প্রদান হয় কি ?

□ প্রায়ই হয় □ মাঝে মধ্যে

□ হয় না

০৮. আপনি বন্ধু নির্বাচনে ধর্মের শর্তারোপ করেন কি?

□ করি □ করি না

□ অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করুন)--

০৯. স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে আপনি ধর্মের শর্তারোপ করেন কি?

□ করি □ করি না

□ অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করুন)--

১০. অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে আপনার আর্থিক লেনদেন / ব্যবসা বাণিজ্যের মাত্রা কেমন?

□ ভাল □ সামান্য

□ নেই

১১. ভোটদানের ক্ষেত্রে আপনি ধর্ম বিবেচনায় আনেন কি ?

□ অবশ্যই □ কখনো কখনো

□ কখনোই না □ জানি না

১২. নিজ ধর্ম পালনে আপনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা কখনো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন কি ?

□ প্রায়ই হই □ হইনি

□ মাঝে মধ্যে □ কখনোই না

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আপনার এলাকায় (গ্রাম / পাড়া / মহল্লা) কখনো সাম্প্রদায়িক নির্যাতন / দাঙ্গা হয়েছে কি?

□ হয়েছে
□ হয়নি
□ কখনোই না
□ জানি না

১৪. আপনার এলাকায় (গ্রাম / পাড়া / মহল্লা) কখনো জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হয়েছে কি?

□ হয়েছে
□ হয়নি
□ কখনোই না
□ জানি না

১৫. আপনার এলাকার (গ্রাম / পাড়া / মহল্লা) স্থানীয় প্রশাসন, মাতব্বর / চেয়ারম্যানগণ বিচারকার্য বা বিবাদ মীমাংসায় কোন ধর্মের লোকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট কি না?

□ হ্যাঁ
□ না

১৬: উত্তর হ্যাঁ হলে- কোন ধর্মের প্রতি?

□ ইসলাম
□ হিন্দু
□ বৌদ্ধ
□ খ্রিস্টান
□ অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করুন)--

১৭. বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থানের অবস্থা কিরূপ ? এ সম্পর্কে আপনার মতামত--

ধর্মীয় সহাবস্থানের অবস্থা কিরূপ

□

১৮. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন / দাঙ্গা এর উৎপত্তির কারণ কি বলে মনে করেন ?

□ রাজনীতি
□ ধর্ম
□ ব্যক্তিগত আক্রোশ
□ অর্থনৈতিক
□ অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করুন)--

১৯. বাংলাদেশে সরকারি চাকুরী ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্য কতটা বলে মনে করেন ?

□ পুরোটাই
□ অনেকটা
□ সামান্য
□ নেই

Dhaka University Institutional Repository

২০. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্মীয় বৈষম্য কতটা বলে মনে করেন ?

□ পুরোটাই
□ অনেকটা
□ সামান্য
□ নেই

২১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা কতটুকু?

□ পুরোটাই
□ অনেকটা
□ সামান্য
□ নেই

২২. বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রভাব কতটুকু ?

□ পুরোটাই
□ অনেকটা
□ সামান্য
□ নেই

২৩. বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের মাত্রা কিরূপ বলে মনে করেন ?

□ পুরোটাই
□ অনেকটা
□ সামান্য
□ নেই

২৪. বাংলাদেশে ধর্মীয় সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন ?

□ সরকার ও রাজনীতিকগণ
□ ধর্মীয় নেতাগণ
□ ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ
□ সমাজপতি ও স্থানীয় প্রশাসন
□ অন্যান্য (সুনির্দিষ্ট করুন)--

২৫. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে আপনার সুপারিশ --

□